কিশোর বিশ্ব-সাহিত্য

[প্রথম খণ্ড]

সম্পাদনা ও ভাষান্তর

অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত



তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশ করেছেন : কৃষ্ণা দত্ত ॥ সুদর্শন প্রকাশন ॥
৭৮/১২, আর. কে. চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা-৪২
ছেপেছেন : শ্যামলকুমার ঘোষ ॥ দি আনন্দম্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী
অলংকরণ : ছত্রপতি দত্ত
দাম : ষোল টাকা



সূচীপত্র

ছত্রপতি, তীর্থপতি ও শুভপতিকে

—জেঠু

KISHORE VISWA-SAHITYA

VOL. I

An Anthology of World Classics
for children

Edited and translated by :
Prof. Manindra Dutt

Price Rupees Sixteen Only.

॥ সম্পাদকের কলম থেকে ॥

বিদেশী ভাষার দুর্গমতা ও মূল গ্রন্থের আয়তনের বিশালতার জন্য বিশ্ব-সাহিত্যের মণি-মন্দিরের সিংহ-দুয়ার বাংলা ভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীদের সামনে প্রায় অবরুদ্ধ। সেই অবরোধকে ভেঙে ফেলে তাদের বিশ্ব-সাহিত্য পরিক্রমাকে সুগম করবার উদ্দেশ্য নিয়েই "কিশোর বিশ্ব-সাহিত্য" প্রকাশের আয়োজন। বিশ্ব-সাহিত্যের অনায়াসপাঠ্য এই সহজ ও সংক্ষেপিত সংস্করণ-গুলি পড়লে কিশোর মনের জানালাগুলি বিশ্বের নানা দিক-দিগন্তের দিকে খুলে যাবে, বিচিত্র রস-কল্পনার আলোক-ধারায় উদ্ভাসিত হবে তাদের মনের জগৎ, প্রসারিত হবে তাদের চিন্তা ও অনুভূতির দিগন্ত—এই ভাবনাই আমাকে এই সম্পাদনা ও ভাষান্তর কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে।

"কিশোর বিশ্ব-সাহিত্য"-এর প্রথম খণ্ডে ভার্জিল-এর মহাকাব্য "ঈনিড", ভিক্টর হুগো-র ঐতিহাসিক উপন্যাস "নাইনটি-থ্রি", লিউ ওয়ালেস-এর যীশু খৃস্টের জীবনীভিত্তিক চাঞ্চল্যকর উপন্যাস "বেন-হুর", সার্ভেন্টিস-এর অমর রস-সাহিত্য "ডন কুইকজোট" ও চার্লস ডিকেন্স-এর অশ্রুসজল বিচিত্র উপন্যাস "ওল্ড কিউরিওসিটি শপ" সংযোজিত হল।

ভার্জিল ঃ ঈনিড

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক কবি পাবলিয়াস ভার্জিলিয়াস মারো উত্তর ইটালির এণ্ডিস নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন খৃঃ পূঃ ৭০ অব্দের ১৫ই অক্টোবর। প্রধানত রোম ও নেপলসে শিক্ষা সমাপ্ত করে খৃঃ পূঃ ৪৪ অব্দে জুলিয়াস সীজারের হত্যার পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং একান্তভাবে কাব্যচর্চায়

মনোনিবেশ করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ঈনিড'। হোমারের 'ওডিসি'-র আঙ্গিকে লেখা এই মহাকাব্য বারো খণ্ডে সম্পূর্ণ। ভার্জিলের ইচ্ছা ছিল, আরো তিন বছর সময় নিয়ে 'ঈনিড'-কে তিনি নিখুঁত করে প্রকাশ করবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে 'ঈনিড'-এর অসংস্কৃত পাণ্ডুলিপি তিনি পুড়িয়ে ফেলতে চাইলেন। বাধা দিলেন বন্ধুরা। বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ 'ঈনিড' রক্ষা পেল। বাহান্ন বৎসর বয়সে ভার্জিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নেপলস্-এ হরেরশ উপকণ্ঠে ভার্জিলের সমাধি আজও সাহিত্যরসিকদের তীর্থ-ভূমি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভিক্টর হুগো ঃ নাইনটি থ্রি ঃ রক্তাক্ত তিরানব্বই

ভিক্টর হুগো-র জীবন ও কর্মধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি একাধারে একটি যুগের দর্পণ ও বাণী। তাই তো ঊনবিংশ শতাব্দীকে কেউ কেউ বলেছেন "ভিক্টর হুগোর শতাব্দী।"

ভিক্টর-মারি হুগোর জন্ম ফ্রান্সের বেসাঁকোঁ-তে ১৮০২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি। মৃত্যু ১৮৮৫ সালের ২২শে মে। সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়বার ফলে একদিকে যেমন জুটেছে রাজকীয় সম্মান ও অতুলনীয় জন-সম্বর্ধনা, অন্যদিকে তেমনই জুটেছে নির্যাতন ও দীর্ঘ নির্বাসন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস Les Miserables (১৮৬২)। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস Quatre-vingt-trieze ফরাসী বিপ্লবের রক্তক্ষরা পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। তারই কিশোর-সংস্করণরূপে প্রকাশিত হল "রক্তাক্ত তিরানব্বই।"

লিউ ওয়ালেস ঃ বেন-হুর

কলেজ-জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে ইংরেজি সিনেমার দৌলতে "বেন-হুর" কাহিনীর চিত্র-রূপ দেখেছিলাম। সেট-সেটিং ও সাজ-পোশাকের অকল্পনীয় জাঁকজমক ছাড়াও প্রাচীন রোমক ও ইহুদী জীবনযাত্রার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, বিশেষ করে তৎকালীন সার্কাস-এরিনার ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ও অশ্ববাহী রথের দৌড়-প্রতিযোগিতার সঙ্গে যীশু খৃস্টের মানবিক জীবনের অশ্রুসজল কাহিনী মিলে-মিশে এমন এক রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় সেদিন সমগ্র সত্তা শিহরিত হয়ে উঠেছিল যার স্মৃতি এই বৃদ্ধ বয়সেও মন থেকে মুছে যায় নি। এই গ্রন্থে উপন্যাসখানির অন্তর্ভুক্তির এইটুকুই কৈফিয়ৎ।

সার্ভেণ্টিস ঃ ডন কুইকজোট

শুধু যে স্পেনীয় সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই তাই নয়; পৃথিবীর যে কোন ভাষায় সবচেয়ে জনপ্রিয় পুস্তক-সমূহের মধ্যে 'ডন কুইকজোট' নিঃসন্দেহে একটি। গত চার শতাব্দী ধরে এই পুস্তক পাঠককে আনন্দ দিয়ে আসছে এবং পৃথিবীতে সাহিত্যের আদর যতদিন থাকবে ততদিন এই পুস্তক সাগ্রহে পঠিত হবে।

অথচ আশ্চর্য কি জান? এই গ্রন্থের লেখক সার্ভেণ্টিস (খৃঃ ১৫৪৮—১৬১৬) আজীবন সৈনিকের কাজে লিপ্ত থেকে অবশেষে অবসর গ্রহণের পর জীবনের শেষ কয়েক বছর মাত্র সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 'ডন কুইকজোট' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অসামান্য সুখ্যাতি লাভ করেন। দুঃখের বিষয়; প্রভূত খ্যাতি সত্ত্বেও সার্ভেণ্টিসকে চরম দৈন্যদশার মধ্যে প্রাণত্যাগ করতে হয়।

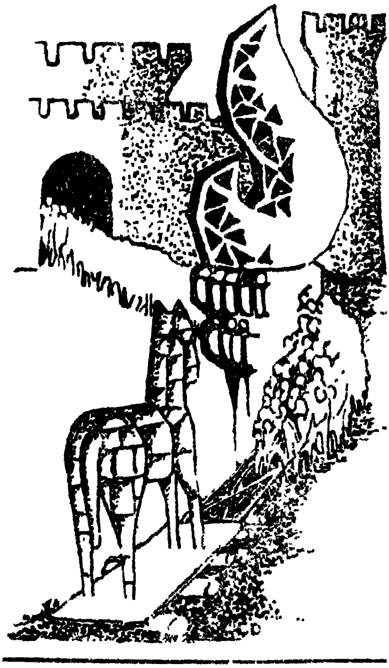
চার্লস্ ডিকেন্স ঃ ওল্ড কিউরিওসিটি শপ ঃ পুরাতত্ত্ব-বিপনি

চার্লস্ ডিকেন্সের সব রচনাই মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। কিন্তু যে গভীর মমতা দিয়ে তিনি 'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ' এর প্রতিটি অধ্যায় রচনা করেছেন তার তুলনা বিরল। শোনা যায়; এই কাহিনী প্রথম যখন ধারাবাহিক ভাবে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিলো, তখন বহু পাঠক-পাঠিকা পত্রযোগে লেখককে ব্যাকুল অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ছোট্ট সুন্দর নেলকে যেন তিনি বাঁচিয়ে তোলেন। সে অনুরোধ কি তিনি রাখতে পেরেছিলেন?

পরিশেষে বলি, বইটিকে ছোটদের উপযোগী করতে গিয়ে সবগুলি উপন্যাসেরই কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। তবু সব ক্ষেত্রেই মূল পরিচ্ছেদ-বিভাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ সংলাপগুলিকে যথাসম্ভব অনুসরণ করতেই চেষ্টা করেছি। মুদ্রণ-কর্মে নানাবিধ সহায়তার জন্য শ্রীসুনীলকুমার ঘোষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

"কিশোর বিশ্ব-সাহিত্য"-এর প্রথম খণ্ড এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকদের সুচিন্তিত অভিমত ও পরামর্শ জানতে পারলে সম্পাদক অনুগৃহীত হবেন।

॥ সুদর্শন ॥ শ্রীম
৭৮/১২, আর. কে. চ্যাটার্জী রোড,
কলকাতা-৪২।



ঈনিড

ভার্জিল

।। কাঠের ঘোড়া ।।

ভোর হয়ে আসছে।

রাজা প্রায়ামের রাজধানী ট্রয় নগরীর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে প্রহরারত শান্ত্রীদের দীর্ঘজাগরণক্লান্ত চোখে নেমেছে তন্দ্রার আবেশ।

গ্রীসের মহাবীর সৈনিকগণ দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ অবরুদ্ধ করে রেখেছে ট্রয় নগরী। দীর্ঘ দশ বৎসরের অবিরাম সংগ্রামে ক্লান্ত শ্রান্ত ট্রয়ের মহাবীর সৈনিকরা রাত্রির ক্ষণিক অবসরে গৃহে গৃহে সুপ্তিতে মগ্ন।

ট্রয়ের আকাশে ঊষার আসন্ন আবির্ভাবের রক্তিম পদচিহ্ন। ভূমধ্যসাগরের নীল জলে আরক্ত আলপনার লেখা। চারিদিকে গভীর শান্তি বিরাজমান। এমন সময়—

ঊষালগ্নের শান্ত স্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করে ভেসে এল কোন্ অশরীরী কণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ বাণী, 'জাগো—ট্রয়বাসীরা জগো। গ্রীক সৈনিকদল পলায়িত। তাদের অবরোধ-শিবির জনশূন্য। ট্রয় এখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত!'

বার-বার বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বর। একে-একে অর্গলমুক্ত হল ট্রয়ের প্রতি গৃহদ্বার। সূর্যের প্রথম রশ্মিপাতের সঙ্গে-সঙ্গে দলে দলে রাজপথে নেমে এল ট্রয়ের অধিবাসীরা। দলে দলে তারা এগিয়ে চলল নগর-দ্বার উন্মুক্ত করে, আইলাসের কবরের পাশ দিয়ে প্রান্তর অতিক্রম করে—সমুদ্রের দিকে।

সত্য বলেছে সেই অশরীরী বাণী। গ্রীক সৈন্যের চিহ্নমাত্র নেই সমুদ্র-তীরে। তাদের ভগ্ন শিবিরশ্রেণী পরিত্যক্ত, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত।

আনন্দে কলমুখর হয়ে উঠল সমবেত জনতা। কেউ বলল, 'দেখ, দেখ, এইখানে ছিল অ্যাকিলিসের শিবির।' কেউ বলল, 'এইখানে ইথাকার বীরদের নিয়ে অবস্থান করতেন ইউলিসিস।' আবার কেউ বা বলল, 'আর ঠিক এইখানে মহাবীর হেক্টর শত্রুপক্ষের ব্যূহ্য ভেদ করে ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিলেন তাদের শিবিরে।'

কিন্তু সে-সব কলরবকে ছাপিয়ে শীঘ্রই সকলের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল আর একটি কথা: 'কাঠের ঘোড়া! কাঠের ঘোড়া!'

ব্যাপার কী? সমুদ্রের একেবারে তটরেখার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক দারুমূর্তি—ঘোড়ার মত আকৃতি, মোটা-মোটা ওক কাঠের পায়ের উপর দণ্ডায়মান।

দেখতে-দেখতে ভিড় জমে উঠল সেই কাঠের ঘোড়ার চারপাশে। নানা রকম তর্ক-বিতর্ক শুরু হল সেই ঘোড়াকে নিয়ে। একদল বলতে লাগল, 'এ ঘোড়া ঈশ্বরের দান। ট্রয় নগরীতে একে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।' আর-একদল সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করল, 'এ নিশ্চয় শত্রুর কোন ষড়যন্ত্র। একে টুকরো-টুকরো করে কেটে ফেল। আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দাও!'

এমন সময় বলিষ্ঠ দুই হাতে জনতাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে হাজির হল উন্নতললাট সৌম্যদর্শন এক বীর পুরুষ। নাম তার তার লাওকুন। ট্রয়ের অন্যতম সেনাপতি।

লাওকুন উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে বলে উঠল, 'তোমরা সবাই কি উন্মাদ হয়েছ? তোমরা কি ভেবেছ যে শত্রুরা সত্যি পালিয়ে গেছে আর তোমাদের জন্য রেখে গেছে এই ভালবাসার দান? এই যে বিরাট কাষ্ঠমূর্তি, জানো এটা কী? কেউ জানো না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জেনো, ট্রয়ের পক্ষে এ এক পরম দুষ্ট গ্রহ!'

বলতে বলতে লাওকুন তার হাতের সুতীক্ষ্ম বর্শাটাকে তীব্র বেগে ছুঁড়ে দিল কাঠের ঘোড়ার পাঁজর লক্ষ্য করে। অব্যর্থ তার সন্ধান। তীক্ষ্ম অগ্রভাগ দারুমূর্তির পাঁজরে আমূল বিদ্ধ হয়ে বর্শাটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বাতাসে ভেসে এল ক্ষীণ আর্তনাদের মত একটা অস্পষ্ট ধ্বনি। সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে ঘটল আর একটি ঘটনা। জনতার অনতিদূরে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পারিষদবর্গের সঙ্গে গুরুতর আলোচনায় রত ছিলেন বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম। একদল মেষপালক একটি রজ্জুবদ্ধ বন্দীকে টানতে-টানতে

উত্তেজিতভাবে সেখানে এসে হাজির হল। লোকটিকে দেখলেই চেনা যায় সে একজন গ্রীক। অসহায়ভাবে মাথায় করাঘাত করতে-করতে সে চেঁচাতে লাগল, 'হায় হায়! আমার সব গেল! আমার একূল ওকূল দুকূলই গেল। কোথাও এতটুকু আশ্রয় আমার নেই। গ্রীস থেকে আমি বিতাড়িত। আবার ট্রয়বাসীদের চোখেও আমি বিদেশী শত্রু।'

বন্দীর অসহায় আর্তনাদে করুণা হল রাজা প্রায়ামের। তাঁর আদেশে তখুনি খুলে দেওয়া হল তার হাতের বাঁধন। তখন রাজা আদেশ দিলেন, 'এইবার বল তোমার বক্তব্য। কেমন করে তুমি এখানে এসেছ? কেনই বা এসেছ?'

দক্ষ অভিনেতার মত বন্দী ধীরে ধীরে বলতে লাগল তার কাহিনী: 'হুজুর, আমার নাম সাইনন। ইউলিসিসের প্রতিহংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই আমি পালিয়েছিলাম গ্রীক শিবির থেকে। ট্রয়ের অবরোধ তুলে দিয়ে গ্রীসে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করেও প্রতিকূল বাতাসের জন্য যখন তাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হল, তখন প্রধান পুরোহিত ক্যালকাস ঘোষণা করলেন, বাতাসের বিমুখ দেবতাকে প্রসন্ন করতে দিতে হবে নরবলি। ইউলিসিসের প্ররোচনায় ক্যালকাস বলি হিসাবে আমারই নাম ঘোষণা করল। আমাকে বন্দী করে রাখা হল সেই চরম দিনের জন্য। কিন্তু প্রাণের মায়া বড় মায়া হুজুর। বলির আগের দিন পালালাম গ্রীক শিবির থেকে। আশ্রয় নিলাম একটা জলাভূমিতে। সেখানেই আমাকে দেখতে পেয়ে বেঁধে এনেছে এই মেষপালকেরা। দোহাই হুজুর, আমাকে বাঁচান!'

রাজা প্রায়ামের মন গলে গেল তার কাতর মিনতিতে। তার হাত চেপে ধরে রাজা বললেন, 'ভুলে যাও তুমি গ্রীক। আজ থেকে তুমি আমাদেরই একজন। এখন বল তো, এই কাঠের ঘোড়া কেন তৈরি করা হয়েছে? এ দেবতার নৈবেদ্য, না যুদ্ধের হাতিয়ার?'

আকাশে দুই হাত তুলে সাইনন বলে উঠল, 'আকাশের ঐ উদয়-সূর্যের নামে, মন্দিরের পবিত্র হোমাগ্নির নামে, আর যে জীবন আপনি আমাকে দান করেছেন তার নামে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, প্রকৃত সত্যই আপনাকে আমি বলব। শুনুন হুজুর, ইউলিসিস ও ডায়োমিড ট্রয় নগরীতে প্রবেশ করে নররক্তে তার দেবমন্দির কলুষিত করায় দেবী মিনার্ভার যে রোষ-বহ্নি প্রদীপ্ত হয়েছে তাকে প্রশমিত করবার জন্যই নির্মিত হয়েছে ঐ দারু-নৈবেদ্য। পূজা-উপচারের দ্বারা দেবতুষ্টি বিধান করবার জন্যই গ্রীকরা মাইসিনিতে ফিরে গেছে। কিন্তু শীঘ্রই তারা ফিরে আসবে। নতুন উদ্যমে আক্রমণ করবে ট্রয়। এই কাঠের ঘোড়া দেবতার নৈবেদ্য। পাছে আপনারা গ্রীকদের অনুপস্থিতির সুযোগে ওকে নগর-প্রাচীরের ভিতরে নিয়ে যান তাই এমন বিরাটকায় করে

ওকে তৈরি করা হয়েছে। যদি একবার এই মূর্তি ট্রয়ের নগর-প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে যে দেবী মিনার্ভা আপনাদেরই পক্ষ অবলম্বন করবেন! তখন যে গ্রীকদের সব আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যাবে!'

অদ্ভুত অভিনয়-দক্ষতা সাইননের। তার এই কল্পিত কাহিনীকে ট্রয়বাসীরা সহজেই বিশ্বাস করে বসল। আর সেইদিন অপরাহ্ণে আবার এমন একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটল যাতে তাদের বিশ্বাস হল দৃঢ়তর। সাইননের কাহিনী সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহও আর তাদের মনে রইল না।

দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে লাওকুন গিয়েছিল সমুদ্রতীরে নেপচুনের উদ্দেশে একটি ষাঁড় বলি দিতে। উদ্যোগ আয়োজন শেষ করে যেমন সে খড়্গ তুলেছে ষাঁড়ের ঘাড় লক্ষ্য করে, অমনি সমুদ্রবক্ষে একটা আশ্চর্য শব্দ শুনে চকিতে সে ফিরে তাকাল। উদ্যতফণা দুই বিরাট ভুজঙ্গ সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে তীরের দিকে। চোখের নিমেষে তারা দৃঢ় আলিঙ্গনে চেপে ধরল লাওকুনের দুই পুত্রের সুকুমার দেহ। মৃত্যু-যন্ত্রণায় তারা চীৎকার করে উঠল। বলির খড়্গ নিয়ে লাওকুন আক্রমণ করল ভুজঙ্গদ্বয়কে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সর্পদুটির মরণ আলিঙ্গনে একে একে স্তিমিত হয়ে এল পিতা-পুত্রের জীবন-প্রদীপ। সাগর-বাতাসে ভেসে গেল তিনটি কাতর কণ্ঠের আর্তস্বর। বিচূর্ণিত-অস্থি তিনটি মৃতদেহ পড়ে রইল সাগর বেলায়।

নির্ভুল দৈব নির্দেশ! ট্রয়বাসীরা একবাক্যে বলতে লাগল, 'নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে লাওকুন। পবিত্র দারুমূর্তিকে সে যে আঘাত করেছিল! এবার পেল তার উপযুক্ত প্রতিফল। এস ভাইসব, অবিলম্বে এই কাঠের ঘোড়াকে নিয়ে যাই নগর-প্রাচীরের ভিতরে। আর প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে, লাওকুনের পাপ যেন আমাদের স্পর্শ না করে!'

এতক্ষণে পূর্ণ হল সাইননের অভিসন্ধি। মহা উৎসাহে সবাই মিলে সেই কাঠের ঘোড়াকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল নগরের কেন্দ্রস্থলে। তারপর সারা নগরে শুরু হল উৎসবের উল্লাস।

উৎসব এক সময় শেষ হল। একে-একে নিভে গেল আলোকমালা। গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ হল। স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল প্রতিটি নাগরিক। ট্রয়ের বুকে নেমে এল মৃত্যু-কালো নিঃশব্দ রাত্রি।

এদিকে গ্রীকদের যে নৌ-বহর ট্রয়ের অনতিদূরবর্তী টেনেডসে নোঙর করে অপেক্ষা করছিল, উপযুক্ত সময় বুঝে রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দ শ্বাপদের মত তারা ফিরে এল ট্রয়ের উপকূলে।

ট্রয়ের ভিতরে রয়েছে সদাজাগ্রত সাইনন। সুযোগ বুঝে সে হাজির হল কাঠের ঘোড়ার কাছে। খুলে দিল ঘোড়ার পেটের গুপ্তদ্বার। একে-একে

বেরিয়ে এল নয়জন মহাবীর গ্রীক। তাদের মধ্যে ছিল মেনেলাস, নিওটলেমাস ও ধূর্ত ইউলিসিস। বিনা বাক্যব্যয়ে তারা ছুটে চলল অন্ধকার, পরিত্যক্ত রাজপথ ধরে। শাণিত অসির আঘাতে দেহচ্যুত করল দ্বাররক্ষীদের মস্তক। খুলে দিল নগর-দ্বার। একটি সতর্ক-বাণীও কেউ উচ্চারণ করবার সুযোগ পেল না। দেখতে-দেখতে সমগ্র গ্রীক বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল অরক্ষিত ট্রয়ের পথে-পথে।

॥ যাত্রা হল শুরু ॥

নগরের নির্জন উপকণ্ঠে কানন-ঘেরা বাড়ি। সেখানে বাস করেন বৃদ্ধ রাজা অন্ধ অ্যাংকাইসিস ও তাঁর বীর পুত্র ঈনিয়াস। মহাবীর হেক্টরের মৃত্যুর পর ঈনিয়াসই হয়েছে গ্রীক সমরে ট্রয়-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী ক্রেউসা ও শিশুপুত্র ইওলাসকে নিয়ে সেই উদ্যান-বাটিতে পরম সুখে বাস করে ঈনিয়াস।

সারা দিনের উত্তেজনা ও রাত্রির উৎসবের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য একটু সকাল-সকালই শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিল ঈনিয়াস। গভীর ঘুমে মুদে এসেছিল ক্লান্ত আঁখি-পল্লব।

কিন্তু শীঘ্রই সে সুখ-নিদ্রা বিঘ্নিত হল এক আশ্চর্য স্বপ্নে। তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল বীর হেক্টর। ধূলিধূসরিত বিকৃত রক্তাক্ত তার দেহ। গভীর বেদনায় বিগলিত হয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল ঈনিয়াস। বাধা দিল হেক্টরের ছায়ামূর্তি। শোকার্ত কণ্ঠে বলল, 'পালাও ঈনিয়াস—পালাও! শত্রু প্রবেশ করেছে নগরে। আগুন জ্বলে উঠেছে ট্রয়ের বুকে। মানুষের পক্ষে যদি তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয় তাহলে সে চেষ্টা আমিই করব। কিন্তু তোমার ভাগ্যলিপি অন্যরূপ। সমুদ্রের ওপারে এক সুদূর দেশে তুমি প্রতিষ্ঠা করবে নতুন ট্রয়। সেই পথে অগ্রসর হও।'

কথা বলতে-বলতে ছায়ামূর্তি বেদী থেকে ভিস্টার পবিত্র মূর্তিকে তুলে এনে ঈনিয়াসের হাতে দিল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাতাসে মিলিয়ে গেল সেই অশরীরী বাণী। সঙ্গে-সঙ্গে ঈনিয়াসের কানে এসে বাজল এক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-গর্জন। মুহূর্তে ভেঙে গেল ঘুম। এক লাফে শয্যা ছেড়ে ছুটে গেল প্রাসাদ-চূড়ায়। সহস্র ঝড়ের উন্মত্ত গর্জন যেন একসঙ্গে এসে বিঁধল তার কানে। নগরের দিকে-দিকে ধ্বনিত হচ্ছে হতাশার আর্তনাদ আর জয়ের উল্লাস। চারিদিকে ক্ষুধিত জিহ্বা বিস্তার করেছে আগুনের লেলিহান শিখা।

মুহূর্তমধ্যে ঈনিয়াস বুঝতে পারল, শত্রুকবলিত হয়েছে ট্রয় নগর। দ্রুত পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম করে সে ঢুকল অস্ত্রাগারে। বর্মে চর্মে দেহ সুরক্ষিত করে হাতে নিল ঢাল ও বর্শা। ছুটে গেল পথে। দেশরক্ষার পবিত্র সংগ্রামে।

পথের দু-পাশ থেকে ছুটে এল কত বীর সৈনিক। ঈনিয়াসের নেতৃত্বে তারা এগিয়ে চলল নগর-কেন্দ্রের দিকে। বুকে তাদের একই চিন্তা—চোখে তাদের একই আশা: মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন!

তারপর শুরু হল ইতিহাসের এক বীভৎসতম নারকীয় সংগ্রাম। কে তার বর্ণনা দেবে? সে-রাত্রির নরক-বর্ণনার শক্তি নেই কোন লেখনীর। ট্রয়ের সে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলবার সামর্থ্য নেই কোন শিল্পীর। হাজার বছরের এক প্রাচীন সাম্রাজ্য মাত্র একটি রাত্রি ও দিনের সংঘর্ষে ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। তার পথে-পথে ছড়িয়ে রইল মৃতের স্তূপ। তার মন্দিরের সোপানে বয়ে গেল রক্তের স্রোত। শুধু ট্রয়বাসী নয়—জয়ী আর বিজেতা পাশাপাশি শুয়ে রইল মৃত্যুর শীতল কোলে। আর তাদের বুকের উপর দিয়ে চলতে লাগল মৃত্যু-দেবতার তাণ্ডব নৃত্য!

সারা রাত আর সারা দিন ধরে চলল অবিরাম নরহত্যার এক নারকীয় লীলা। তার শেষ বলি হলেন বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম। শত্রুর খড়্গাঘাতে ছিন্নমূল দ্রুমের মত তিনি লুটিয়ে পড়লেন একমাত্র পুত্রের প্রাণহীন দেহের পাশে। দুটি মৃতদেহের রক্তের দুটি ধারা এসে এক স্রোতে মিলিত হল। সেই সঙ্গে প্রাচ্য জগতের এক প্রবল-প্রতাপ সাম্রাজ্যের হল অবসান।

বিধ্বস্ত অগ্নিদগ্ধ নগরের উপর নেমে এল রাত্রির কালো ছায়া।

সারাদিনের অবিরাম সংগ্রামে পরিশ্রান্ত মহাবীর ঈনিয়াস অক্ষত দেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্জন প্রান্তরে। এতক্ষণে মনে পড়েছে গৃহপরিজনের কথা। বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ পিতা, অসহায় স্ত্রী আর অক্ষম শিশু। না জানি তাদের কী অবস্থা হয়েছে। শুধু রাজা আর দেশের কথাই এতক্ষণ সে ভেবেছে। কিন্তু তাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থাই তো করা হয় নি! কালবিলম্ব না করে ঈনিয়াস বাড়ির পথে পদক্ষেপ করল।

অতি সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ঈনিয়াস। চারিদিকে শত্রুরা ঘুরছে ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত। তাদের সম্মুখে পড়লে গৃহ-প্রত্যাবর্তনে বিঘ্ন হবে। তাই এত সতর্কতা। তাই প্রকাশ্য রাজপথ ছেড়ে সংকীর্ণ গলিপথ ধরেই সে এগিয়ে চলেছে।

ও কে? ভেস্টা-মন্দিরের অলিন্দে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ও কার ছায়ামূর্তি?

একটু অগ্রসর হতেই ঈনিয়াস চিনতে পারল—ও মূর্তি হেলেনের। রাজা

মেনেলাসের সুন্দরী স্ত্রী হেলেন—এই ধ্বংসযজ্ঞের মূল কারণ হেলেন। একটা দুর্জয় ক্রোধ জ্বলে উঠল ঈনিয়াসের বুকের মধ্যে। তরবারি কোষমুক্ত করে ধেয়ে গেল সে। হত্যা করবে এই ধ্বংসময়ী নারীকে!

অর্ধপথে থেমে গেল ঈনিয়াসের হাতের উদ্যত অসি। সহসা একটা তীব্র আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে। সেই আলোকের ভিতরে রূপ গ্রহণ করল তার মাতা দেবী ভিনাসের মূর্তি। সস্নেহে ভিনাস বললেন, 'বৎস, অন্ধ ক্রোধ প্রকাশের সময় এখন নয়। অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে তোমার পুত্র-পরিজন, তোমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতা। আগে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা কর। তা ছাড়া হেলেনের কী দোষ? ট্রয়ের পতনের কারণ সে নয়। ট্রয়ের পতন বিধির বিধান।'

ভিনাস তাঁর চম্পক-অঙ্গুলি বাড়িয়ে ঈনিয়াসের দুই চোখে বুলিয়ে দিলেন স্নেহস্পর্শ। মুহূর্তমধ্যে সারা ট্রয় নগর ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। কী দেখল সে?

স্বর্গের সম্মিলিত শক্তি একযোগে ধ্বংস করছে ট্রয় নগর। মহাবলী নেপচুন ত্রিশূলের আঘাতে চূর্ণ করছেন নগর-প্রাচীর। নগর-দ্বারে দাঁড়িয়ে জুনো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকছেন গ্রীক সৈন্যদের। নগরের সর্বোচ্চ প্রাসাদ চূড়ায় বসে আছেন মিনার্ভা। আর দেবরাজ জুপিটার স্বয়ং স্বর্গ হতে নির্দেশ দিচ্ছেন: ভাঙো—ভাঙো—

দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গেল সে ধ্বংস-দৃশ্য। তেমনি মিলিয়ে গেছে ভিনাসের মূর্তি। তবে আর বিলম্ব নয়। গৃহাভিমুখে ছুটে চলল ঈনিয়াস।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই গেল পিতার কাছে। বলল, 'পিতা, আপনি অন্ধ, চলৎশক্তিহীন। আমার কাঁধে উঠুন। আগে আপনাকে বাইরে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে আসি।'

চীৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ, 'না না, তোমরা চলে যাও অবিলম্বে! প্রাণ বাঁচাও। আমি এখন একটা অপ্রয়োজন বোঝামাত্র। ট্রয়ের পতনের সঙ্গে আমিও মরতে চাই।'

ঈনিয়াস অনেক অনুরোধ করল। অনেক বোঝালো। কিন্তু সব বৃথা। বৃদ্ধ মৃত্যু-সঙ্কল্পে অবিচলিত। ক্রোধে ক্ষোভে নিরুপায় হয়ে কোষমুক্ত তরবারি উদ্যত করে ঈনিয়াস সখেদে বলল, 'বেশ, তাই যদি আপনার সঙ্কল্প হয় তাহলে আমিও ফিরে চললাম সেই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে। বাঁচি তো সকলে এক-সঙ্গেই বাঁচব। আর যদি মৃত্যুই—'

কথা শেষ করতে দিল না ক্রেউসা। তার দুই পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, 'সে হবে না প্রভু, সে নরককুণ্ডে তোমাকে আর আমি ফিরে যেতে দেব না—কিছুতেই না।'

ঈনিয়াস দেখল, ক্রেউসার দুই চোখে অশ্রুর ধারা। মায়ের পাশে নতজানু হয়ে ভয়ার্ত চোখ মেলে চেয়ে আছে শিশু ইওলাস।

সবিস্ময়ে সে আরো দেখতে পেল এক বিস্ময়কর কাণ্ড। ইওলাসের ব্রহ্মতালু ভেদ করে সহসা উৎসারিত হল একটা উজ্জল অগ্নিশিখা। সেই শিখা ক্রমে সারা মাথায় পরিব্যাপ্ত হয়ে নাচতে লাগল অপূর্ব ছন্দে।

ভয়ে চীৎকার করে উঠল ঈনিয়াস ও ক্রেউসা। নেভাতে চেষ্টা করল সেই পবিত্র অগ্নি। কিন্তু বাধা দিলেন অ্যাংকাইসিস। তিনি জানেন এই অগ্নির অর্থ। আকাশে দুই হাত তুলে তিনি উচ্চারণ করলেন প্রার্থনা-বাণী।

সহসা এক প্রলয়ংকর বজ্র-গর্জনে বিকম্পিত হল সমগ্র প্রাসাদ। একটা জ্বলন্ত উল্কা তীব্রবেগে ছুটে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

অ্যাংকাইসিস বলে উঠলেন, 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু! চল ঈনিয়াস, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে।'

সানন্দে ঈনিয়াস যাত্রার আয়োজন করতে লাগল। ভৃত্য ও অনুচরদের ডেকে তৎক্ষণাৎ ভিন্ন-ভিন্ন পথে পাঠিয়ে দিল নগরের বাইরে সিরিস-এর ভগ্ন মন্দিরে—সেখানেই সকলে মিলিত হবে। স্বয়ং একটা সিংহচর্মে শরীর ঢেকে নতজানু হল পিতার সম্মুখে। অ্যাংকাইসিস গৃহ-দেবতার বিগ্রহ বুকে করে পুত্রের কাঁধে চড়ে শেষবারের মত গৃহ-দ্বার অতিক্রম করলেন। পিতার হাত ধরল শিশু ইওলাস। ক্রেউসা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে থেকে তাদের অনুসরণ করল।

একে একে সকলে সমবেত হল সিরিস-এর ভগ্ন-মন্দিরের পার্শ্বস্থ প্রাচীন সাইপ্রেস বৃক্ষের তলে। সবাই এসেছে। কিন্তু ক্রেউসা কোথায়? সে কি পিছিয়ে পড়েছে? উচ্চকণ্ঠে তার নাম ধরে ডাকল ঈনিয়াস। কোন সাড়া নেই। তবে কি সে পথ হারিয়েছে রাত্রির অন্ধকারে? পথ হারিয়ে কি ফিরে গেছে নিজ গৃহে? অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঈনিয়াস আবার ফিরে গেল নগরের দিকে। যেখানেই থাকুক; ক্রেউসাকে খুঁজে আনতেই হবে।

প্রথমেই গেল নিজের বাড়িতে। নিস্তব্ধ অন্ধকার গৃহ। কেউ কোথাও নেই। ক্রেউসার নাম ধরে বারকয়েক ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল ঈনিয়াস। ছুটতে লাগল পথ হতে পথান্তরে।

কিন্তু বৃথা অন্বেষণ। গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন চারিদিক। নির্জন পরিত্যক্ত পথ। কোথায় ক্রেউসা?

চমকে দাঁড়াল ঈনিয়াস। তার সম্মুখের গাঢ় অন্ধকারে সহসা ফুটে উঠল আলোর রেখা। সেই আলোর রেখা ক্রমে মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিল ক্রেউসা, অপরূপ অপার্থিব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে। শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'তুমি কেন

এত বিচলিত হয়েছ প্রভু ? ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয় যে তোমার আসন্ন নিরুদ্দেশ যাত্রায় আমি তোমার সঙ্গী হই। সুদূর পশ্চিম দেশে হবে তোমাদের যাত্রার শেষ। সেখানে তুমি পাবে নতুন রাজ্য—নতুন মহিষী। আমার জন্য শোক কোরো না। ভেবো না যে দার্দানাসের কন্যা আমি, ঈনিয়াসের পত্নী আমি কোন গ্রীক-পরিবারে দাসীবৃত্তি করব; এইখানেই আমি বাস করব দেবমাতা সিবিলের অন্যতমা অনুচরী হয়ে। বিদায় প্রভু, বিদায় ! ইওলাসকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। তাকে দেখো।'

শুনতে শুনতে ঈনিয়াসের দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কি যেন সে বলতে চাইল। মুখে কথা ফুটল না। দুই হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে গেল প্রিয়তমাকে। মিলিয়ে গেল মূর্তি। দুই ব্যগ্র বাহু জড়িয়ে ধরল অসীম শূন্যতাকে।

ফিরে গেল সে সিরিস-এর ভগ্ন মন্দিরে। শুধু তার পিতা-পুত্র-পরিচারকবৃন্দ নয়, ট্রয়ের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে যত নাগরিক আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে সবাই সমবেত হয়েছে ঈনিয়াসের নেতৃত্বের প্রতীক্ষায়।

পিছনে ফিরে চাইল ঈনিয়াস। ধ্বংসের আগুনে রাঙা হয়ে উঠেছে ট্রয়ের আকাশ। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করল ঈনিয়াস। নতুন আশার বাণী নিয়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে প্রভাতের শুকতারা !

॥ পথে-বিপথে ॥

নতুন দিনের সূর্য দেখা দিল আকাশ-পথে।

ট্রয়ের দগ্ধ বুকে বুঝি মুখ তুলল নবীন তৃণাঙ্কুর।

আর একটি শক্তিমান জাতির বিধ্বস্ত অবশেষকে বুকে নিয়ে দূর সমুদ্রে পাড়ি জমালো একটি ক্ষুদ্র নৌ-বহর। পিছনের উপকূল নিঃশেষে মুছে গেল দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। অশ্রু-ছলছল হল ঈনিয়াস আর তার সঙ্গীদের চোখ। দুঃখময় অতীতকে ফেলে ভেসে চলল তারা রহস্যময় অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে।

যাত্রীদল প্রথম নোঙর করল ট্রয়ের পুরনো বন্ধু থ্রেসের উপকূলে। সেখানে একটি নতুন শহর পত্তন করতে শুরু করল তারা। শহরের নাম দিল ঈনাস।

একদিন ভিনাসের পূজা-বেদী সাজাবার জন্য সবুজ পল্লবের খোঁজ করতে-

করতে ঈনিয়াস অদূরেই একটি স্তূপের উপর মার্টল লতার ঝোপ দেখতে পেয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। মার্টল লতা ভিনাসের খুব প্রিয়। খুবই খুসি হল ঈনিয়াস। কিন্তু লতার সবুজ শিষ ছিঁড়তে গিয়ে সে বিস্মিত হল। মার্টল লতার শিষ তো এত শক্ত হয় না! বেশ জোর দিয়ে একটা শিষ ভাঙতেই তা থেকে ঝরে পড়ল রক্তের ফোঁটা। কী আশ্চর্য! আর-একটি শিষ সে ভাঙল। তা থেকেও রক্ত ঝরল।

নিশ্চয় এ কোন দৈবী মায়া! মার্টল লতাটাকে সমূলে উপড়ে আনবার জন্য সবেগে সেটাকে ধরে সে টান দিল। অমনি স্তূপের নীচ থেকে ভেসে এল গম্ভীর কণ্ঠস্বর: থাম ঈনিয়াস, থাম! আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত কোরো না। আত্মীয়ের রক্তে রঞ্জিত কোরো না তোমার পবিত্র হাত। আমার নাম পলিডোরাস। আশ্রয়দাতার হাতে নিহত হয়ে এইখানে আমি শুয়ে আছি চিরনিদ্রায়। একশত বর্শার আঘাতে সেদিন বিদীর্ণ হয়েছিল আমার বক্ষ। পালাও—এই অভিশপ্ত নিষ্ঠুর দেশ থেকে পালাও।'

বিস্ময়ে ক্রোধে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঈনিয়াস। এই পলিডোরাস রাজা প্রায়ামের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রচুর ধনসম্পত্তি-সহ রাজা তাকে পাঠিয়েছিলেন থ্রেসের রাজা পলিমেস্টরের আশ্রয়ে। আর বিশ্বাসঘাতক পলিমেস্টর প্রায়ামের দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে হত্যা করেছে তার তরুণ অতিথিকে, আত্মসাৎ করেছে তার ধনসম্পত্তি। না, আর নয়, এই বিশ্বাসঘাতকের দেশে আর এক মুহূর্তও নয়! প্রথামত পলিডোরাসের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে আবার তারা জাহাজ ভাসিয়ে দিল অজ্ঞাত সমুদ্রের বুকে।

ঈজিয়ান সাগরের বুকে ক্ষুদ্র দ্বীপ ডেলোস। সেইখানে তারা আশ্রয় নিল। সাদর অভ্যর্থনা জানালো অ্যাঙকাইসিসের পুরনো বন্ধু ডেলোসের রাজা ও অ্যাপোলোর পুরোহিত এনিয়াস।

নগরে ঢুকে ঈনিয়াস প্রথমেই গেল পর্বতশিখরে অ্যাপোলোর মন্দিরে। সকাতরে প্রার্থনা জানাল, 'হে প্রভু, দেখিয়ে দাও কোন্ পথে গেলে পাব আমাদের স্থায়ী বাসস্থানের সন্ধান!'

সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরসমেত সমগ্র পর্বতটি থর্-থর্ করে কেঁপে উঠল। মন্দিরের ভিতরে উঠল গুরু-গুরু ধ্বনি। ভয়ে ও ভক্তিতে নতজানু হয়ে বসল ঈনিয়াস। ভেসে এল দৈব নির্দেশ: 'হে দার্দানাসের বংশধরগণ, যে দেশে জন্মেছিল তোমাদের প্রথম পূর্বপুরুষ, সেই দেশেই পাবে তোমরা স্থায়ী আশ্রয়। তোমাদের বংশের সেই আদি জননীর সন্ধান কর। সেখানেই স্থাপিত হবে ঈনিয়াসের জগৎজোড়া সাম্রাজ্য। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সেই বিশাল সাম্রাজ্য সে ভোগ করবে।'

'তোমাদের বংশের আদি জননী!' কী অর্থ এই নির্দেশের? কোথায় সেই আদি জন্মভুমি? কোন পথে তারা অগ্রসর হবে?

তৎক্ষণাৎ ঈনিয়াস পিতার কাছে উপনীত হল। অ্যাঙ্কাইসিস ছিলেন দৈববাণী-বিশেষজ্ঞ। সব শুনে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকে তিনি বললেন, 'আমাদের আদি পিতা দেবরাজ জুপিটার। তাঁর জন্মভুমি ক্রীট দ্বীপ। দেবতার বাণী আমাদের ক্রীটেই যেতে বলছে।'

হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল অ্যাঙ্কাইসিসের নির্দেশ: 'চল—চল—ক্রীটে চল!'

আবার শুরু হল যাত্রা। ঈজিয়ান সাগরের নীল স্রোতে জাহাজ ভাসিয়ে নাক্সোস ও পারোস দ্বীপ ছাড়িয়ে সাইক্লেডসদের দেশ পার হয়ে অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলল দক্ষিণ পথে।

তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম চলে পৌঁছল তারা ক্রীটের কূলে। শুরু হয়ে গেল নতুন শহর পারগামাস প্রতিষ্ঠার আয়োজন। কাজও কিছুটা অগ্রসর হল। এমন সময় অকস্মাৎ ধেয়ে এল দূষিত হাওয়া। দেখতে-দেখতে শুকিয়ে পড়ে গেল লতা পাতা গাছ। রোগাক্রান্ত হল মানুষ ও পশু। বিমুখ হল ধরিত্রী। ফসলের সম্ভাবনা গেল মিলিয়ে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আসন্ন হয়ে উঠল।

অ্যাঙকাইসিস শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'দেববাণীর নির্দেশ-ব্যাখ্যায় নিশ্চয় ভুল হয়েছে আমার। ফিরে চল ডেলোস-এ। নতুন করে নিতে হবে দৈব নির্দেশ।'

তাই স্থির হল। কিন্তু যাত্রার পূর্বরাত্রে ঈনিয়াস স্বপ্ন দেখল, ট্রয়ের গৃহদেবতারা দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রালোকিত বাতায়নে। শুনতে পেল তাদের কণ্ঠস্বর: 'অ্যাপোলোর ইচ্ছা তোমাকে শোনাতেই আমরা এসেছি। এখানে এই ক্রীট দ্বীপে নয়, তোমাদের নতুন প্রতিষ্ঠা হবে ইটালিতে। সেইখানে তোমরা চলে যাও।'

ট্রয়ের ভাগ্য আবার ভাসল অকূল সমুদ্রে। দূরে দিকচক্ররেখায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ক্রীটের পর্বতমালা।

দেখতে-দেখতে আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে এল কালো মেঘ। দেখা দিল ঝড়ের পূর্বাভাস। ক্ষেপে উঠল বাতাস। মুষলধারে নামল বৃষ্টি। অসহায় ভাবে ভেসে চলল জাহাজ। তিন দিন তিন রাত ধরে চলল ঝড়ের দাপট। আবার আকাশ পরিষ্কার হল। সুবিধা বুঝে নিকটবর্তী একটা দ্বীপে জাহাজ নোঙর করল। যাত্রীরা সবুজ উপকূলে নামল বিশ্রাম করতে। কেউ-কেউ ইতস্তত ঘুরতে লাগল শিকারের সন্ধানে।

এমন সময় একপাল ষাঁড় ও ছাগল ডাকতে-ডাকতে হাজির হল সেখানে।

ক্ষুধার্ত যাত্রীরা তাদের ভিতর থেকে একটাকে বেছে নিয়ে কেটেকুটে ভোজ শুরু করে দিল।

সহসা চমকে উঠল সবাই। বাতাসে ভেসে আসছে অনেক পাখার তীব্র শন্-শন্ শব্দ। মুখ তুলে চাইতেই সভয়ে তারা দেখল, অদ্ভুত-দর্শন তিনটি প্রাণী নেমে আসছে তারস্বরে চীৎকার করতে-করতে। তাদের দেহ পাখির, কিন্তু মুখ স্ত্রীলোকের। বিহঙ্গ-নারী। এদের নাম হার্পি।

কী আশ্চর্য! হার্পিদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই সদ্য-কাটা মাংসের টুকরো-গুলো থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ বেরোতে লাগল ; রেগে গিয়ে তারা তরবারির আঘাত হানল হার্পিদের লক্ষ্য করে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হার্পিদের একটি পালকও তাতে খসে পড়ল না।

তবে একটা সুফল হল। আবার তারা শকুনের মত পাখা মেলে দূর দিগন্তে উধাও হয়ে গেল। শুধু একটি হার্পি নেমে এসে বসল একটা অনুচ্চ পাহাড়চূড়ায়। সেখান থেকেই চীৎকার করে বলল, 'শোন বলছি। ইটালি অভিমুখে তোমরা যাত্রা করেছ। ইটালিতেই তোমাদের যেতে হবে। ভগবান জুপিটারের এই ইচ্ছা।'

'তাই হোক—তাই হোক।' তখুনি জাহাজ ভাসিয়ে দিল ঈনিয়াস।

সিসিলির উপকূলে নোঙর করল জাহাজ। দক্ষিণ দিগন্তে অস্পষ্ট চোখে পড়ছে আগ্নেয়গিরি এটনার অগ্নিময় চূড়া। ও পাশ থেকে ভেসে আসছে সিলা আর চ্যারিবডিসের আর্তনাদ। সেই ভয়ংকর পরিবেশে কোনক্রমে রাত কাটিয়ে ভোরেই যাত্রার আয়োজন শুরু হল।

এমন সময় বনের ভিতর থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল একটি মানুষ। সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত। শতচ্ছিন্ন পরিধেয়। দীর্ঘ কেশ ও গুম্ফে সারা মুখ প্রায় আচ্ছাদিত। চরম দুঃখ ও দুর্দশার প্রতিমূর্তি সেই লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঈনিয়াসের দুই পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাকে রক্ষা করুন। এই ভয়ঙকর স্থান থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। তারপর আমাকে নিয়ে যা খুসি তাই করবেন! আমার কথা শুনেই বুঝতে পারছেন আমি গ্রীক। ট্রয়ের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করেছি। সে অপরাধ আমার যদি ক্ষমার অতীত হয়, তাহলে আমাকে খণ্ড-খণ্ড করে কেটে সাগরের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিন—তবু সান্ত্বনা পাব যে মানুষের হাতে আমার মৃত্যু ঘটেছে!'

করুণায় বিগলিত হয়ে ঈনিয়াস সাদরে তাকে তুলে ধরল। সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'কোনো ভয় নেই। বল তোমার এমন অবস্থা ঘটল কেমন করে।'

লোকটি বলল, ইউলিসিসের দলের লোক সে। একচক্ষু দানব

পলিফিমাসের গুহা থেকে পালাবার সময় ইউলিসিসের দল তাকে ফেলেই চলে যায়। আজ তিন মাস হল এই জনমনুষ্যহীন অরণ্যে সে দিন কাটাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক, কখন পলিফিমাস বা তার সঙ্গীদের হাতে পড়ে। আহার নেই; নিদ্রা নেই। পশুর অধম এ-জীবন সে আর সইতে পারছে না। আজ দূর থেকে এই জাহাজ দেখে ছুটে এসেছে আশ্রয়ের আশায়। সে-আশ্রয় কি সে পাবে না ?

লোকটির কথা শেষ হতে-না হতেই ডাল ভাঙার একটা মড়-মড় শব্দ শোনা গেল। কোন বন্য জন্তু বুঝি আসছে। মুহূর্ত-মধ্যে দেখা দিল অন্ধ দানব পলিফিমাসের বিকৃত বীভৎস কদাকার মূর্তি। সমুদ্রের তীরে গিয়ে আঁজলা ভরে জল তুলে ধুতে লাগল কপালের মধ্যস্থিত একটিমাত্র চোখের ক্ষতস্থান হতে বেরিয়ে-আসা রক্তের দলা। আর্তনাদ করতে লাগল মুহুর্মুহু। সে আর্তনাদে সমুদ্রের জলও বুঝি কেঁপে উঠল।

ভীষণ ভয় পেয়ে ঈনিয়াসের সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ জাহাজে উঠে পড়ল। অনেকগুলো দাঁড়ের ছপ-ছপাৎ শব্দে পলিফিমাস যন্ত্রচালিতের মত তার দীর্ঘ হাত প্রসারিত করে জলে নামল জাহাজখানাকে ধরতে। কিন্তু জাহাজ ততক্ষণে তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

তারপর সিসিলির পশ্চিম অন্তরীপ ঘুরে এসে জাহাজ নোঙর করল ড্রিপেনাম বন্দরে। সেইখানেই ঈনিয়াসের পিতা অ্যাংকাইসিসের মৃত্যু হল। জন্মভূমি হতে বহু দূরে বিদেশের মাটিতেই পাতা হল তাঁর শেষ শয্যা।

॥ দেবতার ক্রোধ ॥

স্বর্গরথে চড়ে অলিম্পাসের দিকে চলেছেন স্বর্গের রানী জুনো। সহসা মর্ত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই তাঁর চোখে পড়ল, সিসিলির উপকূল ছেড়ে ঈনিয়াসের জাহাজ চলেছে ইটালি অভিমুখে।

শ্রাবণের মেঘের মত ম্লান হয়ে গেল জুনোর মুখ। ত্বরিতে বায়ুগতি অশ্বের বেগ সংহত করে তিনি রথের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন বাতাসের দেবতা ঈয়োলাসের রাজ্যের দিকে।

মেঘে-ঢাকা পর্বত-চূড়ায় রাজদণ্ড হাতে বসে আছেন ঈয়োলাস। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জুনো বললেন, 'হে ঝড়ের রাজা, যে ট্রয় জাতিকে আমি ঘৃণা করি, দৈবানুগ্রহে তারাই জাহাজে পাল তুলে চলেছে ইটালিতে বিশ্বজয়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করতে। শৃঙ্খলমুক্ত করে দিন আপনার ঝড় ও

ঝঞ্ঝাকে। ভেঙে চূর্ণ করে দিক তারা ঐ নৌ-বহরকে। জলমগ্ন হয়ে সমুদ্র-তরঙ্গের সঙ্গে মিশে যাক ওদের সব অস্তিত্ব।'

ঈয়োলাস বললেন, 'মহারানী, আপনার হুকুম আমি এই মুহূর্তে তামিল করব।'

সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডাঘাত করলেন তিনি পর্বত-চূড়ায়। মুহূর্তে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল পর্বত-গাত্র। প্রচণ্ড শব্দ করে বাতাসেরা দলে-দলে বেরিয়ে এল সেই পথে। দেখতে-দেখতে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঘনকৃষ্ণ মেঘজালে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎচমক। প্রলয়-ঝড় উঠল সাগর-বুকে। বজ্রের গর্জনে আর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি বুঝি দাঁড়াল ট্রয়ের দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা।

প্রমাদ গুণল ঈনিয়াস। এখানেই কি শেষ হয়ে যাবে সব স্বপ্ন—সব সাধ! মিথ্যা হবে দৈববাণী! নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কি নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে সাগরের অতল তলে!

নতুন করে ধেয়ে এল ঝোড়ো হাওয়ার দল। ঈনিয়াসের জাহাজের হাল ভেঙে গেল। ছিঁড়ে গেল পাল। ঝড়ের তাড়নায় নোঙরহীন জাহাজ ভেসে চলল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। ঈনিয়াস ভগ্ন ছিন্ন জাহাজে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে দেখতে লাগল তার নৌ-বহরের অন্যান্য জাহাজের দুর্গতি। তিনখানি জাহাজ ধাক্কা খেল পাহাড়ের গায়ে। আর তিনখানি আটকে গেল বালুর চরে। একখানি জাহাজ তো সমস্ত লোকজনসহ ডুবে গেল অতল জলে।

জুনোর দুরভিসন্ধি কিন্তু এমন অবাধে বেশীক্ষণ চলতে পারল না। সাগরের তলে বাস করেন জলের দেবতা নেপচুন। শান্তি-শয়নে শুয়ে ছিলেন তিনি পরম আরামে। সহসা তাঁর কানে গেল সমুদ্রের গর্জন-ধ্বনি। ব্যাঘাত ঘটল তাঁর শান্তি-শয়নের। দ্রুতগতিতে নেপচুন উঠে এলেন সাগরের উপরে। নিজের চোখে দেখলেন ক্রুদ্ধ ভগ্নীর ধ্বংস-কাণ্ড। ক্রোধে জ্বলে উঠল নেপচুনের চোখ। সব বাতাসকে তীব্র কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'আমার হুকুম না নিয়ে কোন্ সাহসে তোমরা আমার রাজ্যে প্রবেশ করেছ? এই মুহূর্তে এ-স্থান ত্যাগ কর।'

ভীত ত্রস্ত বাতাসেরা তড়িৎ-গতিতে ফিরে গেল ঈয়োলাসের কাছে। তাঁকে জানাল নেপচুনের আদেশ। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ফিরিয়ে নিলেন বাতাসের দলকে। আকাশ হল নির্মেঘ। সমুদ্রের শান্ত নীল জলে হাসতে লাগল সূর্যের সোনালি আলো। বাতাসের মৃদু গুঞ্জনে যেন ধ্বনিত হতে লাগল—শান্তি, শান্তি, শান্তি!

নেপচুন তখন সদল-বলে রথ চালিয়ে একে-একে উদ্ধার করলেন ঈনিয়াসের বিধ্বস্ত নৌ-বহর। সেগুলিকে রেখে এলেন নিরাপদ স্থানে।

ওদিকে স্বর্গরাজ জুপিটারও নিশ্চিন্তে বসে নেই। সুবর্ণ মেঘের সিংহাসনে বসে তিনিও ভাবছেন অনাগত দিনের কথা।

এমন সময় একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে তাঁর চমক ভাঙল। কখন পাশে এসে বসেছেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ভিনাস। নতজানু হয়ে জোড়-হস্তে সকরুণ চোখ তুলে ভিনাস বললেন, 'হে স্বর্গ-মর্ত্যের অধীশ্বর, ঈনিয়াস আপনার কাছে কী অপরাধ করেছে,—কী অপরাধ করেছে ট্রয়ের অধিবাসীরা, যে এত দুঃখ-ভোগের পরেও তাদের ইটালি-যাত্রার পথ বার-বার রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে? ট্রয়ের পতনের পর আমি যখন শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তখন কি আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন নি যে আমার বীর-পুত্র ঈনিয়াস হবে এক জগৎ-জোড়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর? আজ কি জুনোর ঈর্ষার আগুনে আপনার সে প্রতিশ্রুতি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?'

সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে জুপিটার বললেন, 'কোনো ভয় নেই মা, তোমার প্রিয়জনের সৌভাগ্য অপ্রতিরোধ্য। ক্ষণেকের জন্য মহাকাল-যবনিকা উত্তোলন করছি, অবলোকন কর।' ঐ দেখ, ঈনিয়াস ইটালিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে এক নতুন রাজ্য। তারপর রাজদণ্ড পাবে তার পুত্র ঈওলাস। সে রাজধানী স্থানান্তরিত করবে আলবাতে। সেখানে তিনশত বৎসর রাজত্ব করবে হেক্টরের বংশধরেরা। তারপর ইলিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে যমজ সন্তান। একটি নেকড়ে প্রতিপালন করবে সেই সন্তানদ্বয়কে। জ্যেষ্ঠ রোমুলাস প্রতিষ্ঠা করবে রোম নগরী আর রোমান জাতির। তারপর অনন্তকাল ধরে রোম হবে বিশ্বের অধীশ্বরী। একদা ঈওলাসের বংশ থেকে আবির্ভূত হবে জুলিয়াস। তার দিগ্বিজয়ে পূর্ণ হবে বসুন্ধরা। স্বর্গ পূর্ণ হবে তার যশোরাশিতে। তারপর পৃথিবীতে নেমে আসবে নিরঙ্কুশ শান্তি। মৈত্রী ও করুণায় পূর্ণ হবে মানব সমাজ। আর হিংসার দানব অন্ধকার কারাগারে শৃঙ্খলিত হয়ে বৃথাই দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করবে রক্ত-লালসায়।'

কথা শেষ করে জুপিটার স্বর্গ-দূত মার্কারিকে পাঠিয়ে দিলেন কার্থেজে—ঈনিয়াসের আগমনের পথ প্রশস্ত করতে।

॥ রাণী ডিডোর দেশ ॥

উত্তর আফ্রিকার পাহাড়-ঘেরা নির্জন সমুদ্রোপকূল। দৈবানুগ্রহে সেইখানেই ঘুমিয়ে ছিল সাতখানি জাহাজ-সহ ঈনিয়াস ও তাঁর অনুচরদের একাংশ।

ভোর হতেই একাটিসকে সঙ্গে নিয়ে ঈনিয়াস বেরিয়ে পড়ল নতুন দেশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিছু দূর এগোতেই তারা দেখতে পেল এক অপরূপ সুন্দরী ধনুর্ধারিণীকে।

ধনুর্ধারিণী এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমারই মত বেশধারী আমার বোনদের কি আপনারা দেখেছেন এই বনপথে?'

ঈনিয়াস উত্তর দিল, 'আপনাকে কী নামে ডাকব জানি না। মনে হচ্ছে আপনি কোনো দেবী। আপনার কোন বোনকেই আমরা দেখি নি। আচ্ছা. আপনি কি বলতে পারেন, এ কাদের দেশে আমরা এসে পড়েছি?'

ধনুর্ধারিণী বলল, 'আপনারা এসেছেন রাণী ডিডোর দেশে। এ দেশের নাম কার্থেজ। কিন্তু আপনারা কে? কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?

ঈনিয়াস জবাব দিল, 'আমাদের দুঃখের কাহিনী তো একদিনে বলে শেষ করবার নয়। আমরা ট্রয়ের অধিবাসী। আমার নাম ঈনিয়াস। ট্রয়ের পতনের পর দৈবাদেশে মাত্র কুড়িখানি জাহাজ নিয়ে অজ্ঞাত সমুদ্র-পথে আমরা পাড়ি জমিয়েছিলাম। তারপর—'

একে-একে তার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করল ঈনিয়াস। তখন ধনুর্ধারিণী বলল, 'আপনারা নিরাশ হবেন না, কারণ ভাগ্য আপনাদের সুপ্রসন্ন। ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, দেবতা আপনাদের প্রতি অনুকূল।'

ঈনিয়াস চোখ তুলে দেখল, শ্যেন-কবলমুক্ত চতুর্দশটি হংস শান্তিতে বিশ্রাম করছে সবুজ উপত্যকার শ্যামল ছায়ায়।

ধনুর্ধারিণী বলল, 'এই দৈব নির্দেশ জানিয়ে দিল যে, আপনাদের হারানো জাহাজগুলো নিরাপদে বন্দরে ফিরে আসছে। অতএব মাভৈঃ।'

বলতে-বলতে ধনুর্ধারিণীর দেহ ক্রমাগত বড় হতে লাগল। একটা রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ল তার চারিধারে। স্বর্গীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল তার কেশদাম থেকে। ধনুর্ধারিণী রূপান্তরিত হল এক দেবী মূর্তিতে। দেবী ভিনাস। পুত্রের প্রতি সস্নেহ হাসিতে অভয়-বাণী শুনিয়ে দেবী অন্তর্হিত হলেন। কিন্তু তাঁর কৃপায় দৈব মায়ায় লোকচক্ষুর অগোচর হয়ে ঈনিয়াস ও একাটিস এগিয়ে চলল কার্থেজ নগরীর দিকে।

নগরের মধ্যস্থলে দেবী জুনোর বিরাট মন্দির। মন্দিরের বহিঃ-প্রাচীরে ট্রয়-যুদ্ধের সমগ্র কাহিনী সুনিপুণ হাতে অঙ্কিত রয়েছে। ঈনিয়াস বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়ে বলে উঠল, 'আর কোনো ভয় নেই বন্ধু, আমাদের গৌরব-গাথা এই সুদূর দেশেও পৌঁছেছে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় যাদের অন্তর উদ্বুদ্ধ হয়েছে, মানুষের প্রতি করুণায় তাদের অন্তর নিশ্চয় বিগলিত হবে। এখানে আমরা নিশ্চয় আশ্রয় পাব।'

ঈনিয়াস কৃতসংকল্প। অনুরোধ, কোন ভর্ৎসনাই তাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারল না। ধীর পদক্ষেপে সে ফিরে গেল নিজ শিবিরে।

রাত্রি নেমে এল কার্থেজের বুকে।

সশস্ত্র সাজে সজ্জিত হয়ে রানী ডিডো উপনীত হল সাগর-কূলে। নতজানু হয়ে বসে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'বিদায় কার্থেজ, বিদায়। আমার কর্তব্য আমি করেছি। প্রতিষ্ঠা করেছি এই গৌরবময় নগর। এবার যাত্রা লোকান্তরের পথে। সুখে—হ্যাঁ সুখেই আমি মরতে পারতাম, যদি ট্রয়বাসীদের পদাঙ্ক না অঙ্কিত হত এ দেশের মাটিতে। তবু কোন প্রতিশোধ আমি নেব না। শুধু এমনি করে—ঠিক এমনি করে ছিন্ন করব সেই বন্ধন যার দ্বারা বাঁধা হয়েছিল তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়। আমার চিতার আগুনে উজ্জ্বল হোক তাঁর যাত্রার পথ।'

কথা শেষ করবার আগেই ডিডো তার কটিবন্ধ হতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বের করে আমূল বসিয়ে দিল নিজের বুকে। বুক থেকে ছুরিকা তুলে নিয়ে আবার হানল আঘাত।

ঠিক সেই মুহূর্তে যাত্রার প্রত্যুষ-লগ্নের প্রতীক্ষায় নিজের জাহাজে ঘুমন্ত ঈনিয়াস স্বপ্ন দেখল, দেবদূত মার্কারি তার কানে কানে বলছেন : 'ঈনিয়াস, বিপদ-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়েও তুমি এখনো ঘুমিয়ে আছ? পালাও—পালাও! অচিরে তোমার যাত্রাপথ রুদ্ধ হবে অসি ও বর্শার চক্রব্যূহে!'

শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ঈনিয়াস। ত্রস্ত কণ্ঠে হাঁক দিল, 'জাগো! শক্ত হাতে দাঁড় ধর! যাত্রা শুরু কর! দ্বিতীয়বার আমি শুনতে পেয়েছি দেবতার কণ্ঠস্বর। সে কণ্ঠে একই বাণী—পালাও!'

দেখতে-দেখতে সমগ্র নৌ-বহরটি ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে। অনুকূল বাতাসে তীরবেগে চলল এগিয়ে। পিছনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কার্থেজের সৌধ-চূড়া।

॥ অনেক বিপদ পেরিয়ে ॥

ভেসে চলেছে নৌ-বহর। মাথার উপরে নীল আকাশ। নীচে নীল সমুদ্রের সীমাহীন জলধারা। আর কিছুই যেন নেই কোনখানে।

হঠাৎ একদিন বাতাসের গতি গেল উল্টে। আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে। কালো জলে পড়ল আতঙ্কের ছায়া।

প্রধান নাবিক পলিনুরাস বাতাসের গতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করে ঈনিয়াসের কাছে এসে বলল, 'প্রভু, স্বয়ং জুপিটার সহায় হলেও এই বাতাসে

ভর করে ইটালিতে পেঁছবার আশা আমি করি না। আমি যতদূর বুঝতে পারছি, ঝড় আসন্ন। এ অবস্থায় আমাদের কোন বন্দরে আশ্রয় নেওয়াই উচিত। আমাদের মিত্র রাজ্য সিসিলির উত্তর-উপকূলবর্তী এরিক্স এখান থেকে খুবই কাছে। আমার মতে, সেখানেই আমাদের আপাতত আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

ঈনিয়াস এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিল। প্রথমত, এরিক্স ট্রয়ের উপনিবেশ ও মিত্ররাজ্য, এই বিপদসংকুল অভিযানের পথে এর আগেও সেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই এরিক্স রাজ্যেই চিরবিশ্রাম নিয়েছেন তাঁর বৃদ্ধ পিতা অ্যাংকাইসিস।

এরিক্সের রাজা এসিস্টিস ঈনিয়াসের পুরোনো বন্ধু। পরম সমাদরে রাজকীয় অভ্যর্থনায় সে সকলকে রাজধানীতে আশ্রয় দিল।

পরদিন খুব জাঁকজমক সহকারে অ্যাংকাইসিসের মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল। রক্ত, সুরা ও দুগ্ধ নৈবেদ্য দেওয়া হল তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। অনুষ্ঠান-শেষে ঈনিয়াস ঘোষণা করল, 'আজ থেকে নবম দিবসে নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। এরিক্সের প্রজাবৃন্দ যেন ট্রয়ের অধিবাসীদের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতায় সানন্দে যোগদান করে।'

নির্দিষ্ট দিনে প্রথমে হল নৌ-বাহন প্রতিযোগিতা। চারখানি জাহাজ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। বিজয়ীদের দেওয়া হল নানাবিধ পুরস্কার। তারপর হল দৌড় প্রতিযোগিতা। তারপর শুরু হল বক্সিং। প্রতিযোগিতাটি বড়ই বিপজ্জনক, কারণ প্রতি-যোগীদের হাতের কড়া চামড়ার দস্তানায় জড়ানো থাকত লোহা ও সীসের ভারী পাত। ট্রয়ের বিখ্যাত লড়িয়ে ডারেস মঞ্চে উঠে দাঁড়াল। বক্সিং-এ তার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। প্রথমে তাই কেউ সাহস করে উঠে দাঁড়াল না তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। ডারেস ভাবল, এ প্রতিযোগিতায় সে ই বিজয়ী হবে। মনের সুখে সে নিজের মাংসপেশীগুলি ফুলিয়ে ফুলিয়ে সবাইকে দেখাতে লাগল।

দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল এক দীর্ঘদেহ প্রৌঢ়। রাজা [illegible] তার কানে কানে বলল, 'এণ্টেলাস, তুমি থাকতে বক্সিং-এর প[illegible] পুঁচকে লোকটা? এতই কি তোমার প্রাণের মায়া [illegible]

এণ্টেলাস উত্তর দিল, 'প্রাণের মায়া আমি কি[illegible] আমি শুধু ভাবছি, এই বৃদ্ধ বয়সে ঐ যুবকের সঙ্গে লড়া কি ঠিক হবে?'

রাজা বলল, 'নিশ্চয় হবে। তুমি অগ্রসর হও।'

বক্সিং-এর মঞ্চে লাফিয়ে উঠল এণ্টেলাস। [illegible] হল প্রতিযোগিতা। ডারেসের বয়স অল্প, দেহের ওজন লঘু, চলাফেরার [illegible]।

এণ্টেলাস বয়সের ভারে শ্লথগতি, তার দাম অল্প; কিন্তু দৈহিক শক্তি অসাধারণ। দুই অসম যোদ্ধার মধ্যে চলল প্রতিযোগিতা।

হঠাৎ এক সময় সুযোগ পেয়ে এণ্টেলাস ডান হাত তুলে ডারেসকে লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল বিরাশি সিক্কা ওজনের এক মোক্ষম ঘুষি। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে দাঁড়াল ডারেস। আর এণ্টেলাস নিজের ঘুষির বেগ সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। ট্রয়ের লোকেরা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়াল এণ্টেলাস। দুই দৃঢ় মুষ্ঠি পাকিয়ে এগিয়ে গেল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। তারপর ডাইনে বামে শুরু হল অবিরাম মুষ্ট্যাঘাত—প্রবল শিলাবৃষ্টির মত।

বেচারি ডারেসকে উদ্ধার করতে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল ঈনিয়াস স্বয়ং। মুর্ছিতপ্রায় ডারেসকে নিয়ে আসা হল মঞ্চের বাইরে। এণ্টেলাসকে দেওয়া হল বিজয়ীর সম্মান-পুরস্কার—একটি সুসজ্জিত ষণ্ড। সেটার সম্মুখে মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হাত তুলে দাঁড়িয়ে এণ্টেলাস বলল, 'চেয়ে দেখুন রাজা ঈনিয়াস, আর ট্রয়ের অধিবাসীরাও দেখুন, যৌবনে এই বাহুতে কত শক্তি ছিল, আর কোন্ মৃত্যুর হাত থেকে ডারেস আজ ভাগ্যগুণে অব্যাহতি পেয়ে গেল।'

বলতে-বলতে এণ্টেলাস তার উদ্যত মুষ্টি দিয়ে তীব্র বেগে আঘাত করল সেই ষাঁড়টির দুই শিংয়ের একেবারে মাঝখানে। ষাঁড়টির মাথার খুলি ভেঙে দুই ভাগ হয়ে পড়ল। থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে তার প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল এণ্টেলাসের পায়ের নিচে। সেই দিকে চেয়ে সে বলে উঠল, 'এই আঘাতই আমি তুলেছিলাম ডারেসের জন্য। কিন্তু তার চেয়ে এই ষাঁড়ই প্রভু এরিক্সের উপযুক্ততর বলি।'

তারপর শুরু হল তীরের খেলা। ময়দানের মাঝখানে একটা সুউচ্চ দণ্ড পুঁতে দিয়ে তার মাথায় সরু সুতো দিয়ে পা বেঁধে একটা পায়রাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই উড়ন্ত পায়রাই হল নিক্ষিপ্ত তীরের লক্ষ্য। একে-একে ধনুর্ধারীরা এসে দাঁড়াল সারি বেঁধে।

এমন সময়—

সমুদ্রতীরে ট্রয়বাসীদের নৌ-বহরে ঘটল এক নিদারুণ দুর্ঘটনা। প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল তাদের অধিকাংশ নৌ-বহর।

সারাদিন ধরে নানা রকম খেলাধুলায় মত্ত ছিল ট্রয় ও এরিক্সের আবাল-বৃদ্ধ পুরুষ অধিবাসীরা। কিন্তু তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাদের মা ও বোনেরা অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোকই সেই খেলাধুলায় যোগ দিতে পারে নি। তারা সবাই ছিল যার যার শিবিরে। মনও তাদের ভাল ছিল না। অনির্দিষ্ট কাল ধরে এই নিরুদ্দেশ যাত্রার ক্লেশ আর তারা সইতে পারছিল না।

তাদের মন একান্ত আগ্রহে চাইছিল স্থায়ী বাসস্থান—এই নিরুদ্দেশ যাত্রার অবসান।

তাদের এই মনোবাসনার আগুনে ইন্ধন জোগালেন দেবী জুনো। ট্রয়-বাসীদের উপর তাঁর ক্রোধ তখনো প্রশমিত হয় নি। সুযোগ বুঝে এক বৃদ্ধার বেশ ধরে তিনি হাজির হলেন সমুদ্রকূলে।

ট্রয়ের বর্ষীয়সী মহিলারা অনেকেই তখন সমবেত হয়েছে সাগরতীরে। জলধির অসীম বিস্তারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকতে-থাকতে সহসা তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল তাদেরই মর্মবাণী : 'আমাদের গৃহ দাও, স্থায়ী রাজ্য দাও! এমন করে আর আমরা ঘুরে মরতে পারি না!'

এমন সময় ছদ্মবেশী জুনো সেখানে হাজির হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, আর তোমাদের ঘুরে বেড়াতে হবে না। তোমরা আমার কথা মন দিয়ে শোন। বছরের পর বছর ধরে এই ভাগ্যহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায় ঘুরে মরার চেয়ে ট্রয়ে থেকে গ্রীকদের হাতে মৃত্যুবরণ কি শ্রেয়তর ছিল না? কিন্তু কেন আমরা ঘুরে মরব? এই তো এখানে আমরা পেয়েছি স্বাগত আশ্রয়। এখানকার মানুষরা তো আমাদেরই স্বগোত্র। তাহলে কেন আমরা এখানেই প্রতিষ্ঠা করব না আমাদের স্থায়ী গৃহ? এস, সকলে মিলে সেই ব্যবস্থাই করি যাতে এখান থেকে কোনদিন আমাদের চলে যেতে না হয়।'

বলতে-বলতে জুনো পার্শ্ববর্তী দেবতার পূতাগ্নিকুণ্ড থেকে একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন একখানি জাহাজ লক্ষ্য করে। তার স্পর্শে জাহাজের গুটানো পাল দাও-দাউ করে জ্বলে উঠল।

বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে ট্রয়বাসিনীরা দেখছিল এই দুঃসাহসিক কাণ্ড। মুহূর্ত মধ্যে তাদের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই আগন্তুক বৃদ্ধার মূর্তি। তার স্থানে দেখা দিল জুনোর দূত আইরিসের মূর্তি। সাত-রঙা পাখা ছড়িয়ে দেখতে-দেখতে তিনিও অদৃশ্য হয়ে গেলেন মেঘের আড়ালে। আকাশে শুধু আঁকা রইল একটা আদিগন্তবিস্তৃত রামধনু।

এই দৃশ্য দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠল ট্রয়বাসিনীদের মন। এককণ্ঠে তারা গর্জন করে উঠল, 'পোড়াও—পোড়াও এইসব জাহাজ! এ জুনোর আদেশ—এ আমাদের অন্তরের নির্দেশ!'

বলতে বলতে যে যেমন পারল দেবতার অগ্নিকুণ্ড হতে জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়তে লাগল জাহাজ লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠল সারা নৌ-বহর। কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আকাশ।

বাতাসের আগে এ দুর্ঘটনার খবর পৌঁছল ক্রীড়াস্থলে। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল খেলা। সবাই ছুটল সমুদ্রতীরে। প্রাণপণ চেষ্টা করল আগুন নেভাতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সে আগুন নেভানো মানুষের সাধ্যাতীত।

নিরুপায় হয়ে ঈনিয়াস আকাশে দুই হাত তুলে বলল কাতর কণ্ঠে, 'হে প্রভু, রক্ষা কর—রক্ষা কর!'

প্রার্থনায় সাড়া দিলেন জুপিটার। সহস্রধারায় নেমে এল প্রবল বর্ষণ। চারখানি ভস্মীভূত জাহাজ ছাড়া বাকিগুলো কোনক্রমে রক্ষা পেল।

একে-একে সবাই চলে গেল যার যার শিবিরে। সেই ধ্বংসকাণ্ডের মাঝখানে চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঈনিয়াস একা। মনে তার অনেক চিন্তার ঝোড়ো হাওয়া। তার চোখে নতুন দেশের নতুন রাজ্যের স্বপ্ন। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পথে যে অনিবার্য দুঃখ ও দুর্দশা, তার মধ্যে এতগুলি ক্লান্ত মানুষকে সে টেনে নিয়ে যাবে কোন্ সাহসে?

সহসা কাঁধে কার মৃদু স্পর্শ পেয়ে ফিরে তাকাল ঈনিয়াস। মিনার্ভার প্রিয়পাত্র প্রবীণ ভবিষ্যদ্বক্তা নটেস্ স্মিতহাস্যে বলল, 'আপনার দুশ্চিন্তার কারণ আমি জানি রাজা। কিন্তু আপনি বিচলিত হবেন না। আমার কথা শুনুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার সম্মুখে বিপদসংকুল কঠোর যাত্রাপথ। সে পথে আর্ত, পীড়িত, দুর্বল ও বৃদ্ধদের আপনি কদাচ সংগী করবেন না। এইখানে তাদের রেখে বাছা-বাছা নওজোয়ানদের নিয়ে যাত্রা করুন আপনার অভীষ্ট পথে। তবেই সফল হবে আপনার অভিযান।

নটেসের কথাগুলি ভাবতে ভাবতেই শিবিরে ফিরে গেল ঈনিয়াস। রাত গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল। ভাবনার তবু বিরাম নেই। এমন সময় রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভংগ করে ভেসে এল অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। সম্মুখে দেখা দিল অ্যাংকাইসসের মূর্তি। মূর্তি কথা বলল সান্ত্বনার স্বরে, 'প্রাণাধিক পুত্র আমার, দৈবাদেশে নটেসের উপদেশ সমর্থন করতেই আমি এসেছি। সেইমত কাজই তুমি কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তারপর মাটিতে পদার্পণ করেই চলে যাবে মৃত্যু-পারের দেশে। সেখানেই তোমাতে আমাতে আবার দেখা হবে। কিন্তু এবার বিদায়। রাত্রির তুরংগমের পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। ঊষার শীতল স্পর্শ লেগেছে আমার দেহে। আর নয়। বিদায়!'

সব সন্দেহ দূর হল। নতুন করে শুরু হল যাত্রার আয়োজন। পিছনে পড়ে রইল আর্ত ও পীড়িত দুর্বল ও অসহায় নারী ও বৃদ্ধ। সম্মুখের পথে এগিয়ে চলল দুঃসাহসী নওজোয়ানের দল।

তারপর একদিন ভোরের আলোর সংগে সংগে দেখা দিল ইটালির পশ্চিম উপকূল। অনেক দুঃখ ও দুর্দিন পার হয়ে, পার হয়ে অনেক সাগর, ঈনিয়াস সদলে নোঙর ফেলল কিউমির পর্বতের ছায়ায় ঢাকা শান্ত সমুদ্রতীরে। অভিযান এবারের মত শেষ হল।

॥ নরকে ॥

একেটিসকে সঙ্গে নিয়ে ঈনিয়াস চলল সন্ন্যাসিনী সিবিলের গুহার সন্ধানে। নির্জন বনপথ ধরে খানিকটা অগ্রসর হতেই তারা দেখতে পেল একটি মন্দির। মন্দিরের পাশে অতীতের নানা কাহিনী খোদাই করে রাখা হয়েছে।

মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মহীয়সী এক নারীমূর্তি।

একেটিস ঈনিয়াসের কানে কানে বলল, 'ইনিই সিবিল।'

ঈনিয়াস সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদ জানাল। সিবিল হাতের ইশারায় তাদের অনুসরণ করতে বলে নিঃশব্দে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

মন্দিরের ভিতরে একটা বিরাট গুহা। সেই গুহ-পথে একাগ্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সিবিল। বুঝি সে আহ্বান করছে কোন অদৃশ্য দেবতাকে। বিরাট কালো গুহার পটভূমিকায় আশ্চর্য দেখাচ্ছে তার সাদা চুলের রাশি। তার বুক উঠছে আর নামছে গভীর উত্তেজনায়। তার শরীরটা ক্রমেই বড় হতে লাগল। থর থর করে কাঁপতে লাগল তার দেহ। দেবতার ভর হল তার উপরে।

সেই অবস্থায় সিবিলির মুখ হতে বেরিয়ে এল দেবতার বাণী, ঈনিয়াস, জানাও তোমার প্রার্থনা। আবির্ভূত হয়েছেন দেবতা।'

ঈনিয়াস কথা বলল, 'দেবী ফিবাস, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ঘোষণা করুন আপনার ভবিষ্যদ্বাণী।'

গম্ভীর স্বর ভেসে এল সিবিলির কণ্ঠ থেকে, 'হে বীর, তোমার লক্ষ্যস্থলে তুমি পৌঁছেছ। পার হয়ে এসেছ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। কিন্তু তোমার সম্মুখে রয়েছে তীব্রতর সংগ্রাম। চেয়ে দেখ, টাইবার নদীর জল কেমন পীত বর্ণ। দেখতে দেখতে সে জল হয়ে উঠল রক্তের মত লাল। ওই শোন অস্ত্রের ঝনঝনা। ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ রয়েছে তোমার সম্মুখে। কিন্তু সাহস হারিও না। শক্ত মুঠিতে ধর তোমার অস্ত্র। এই পথেই রয়েছে তোমার মুক্তি।'

ধীরে ধীরে কথা বলল ঈনিয়াস, 'হে দেবী ভয়ঙ্করী, আপনার কৃপায় ভাগ্যের ভ্রূকুটিকে আমি ভয় করি না। কিন্তু আপনার কাছে এসেছি আমি অন্য এক গুরুতর প্রয়োজনে। শুনেছি, এই মন্দিরের অনতিদূরেই আছে নরকের উন্মুক্ত দ্বার। সেই নরকে আমি যেতে চাই আমার স্বর্গত পিতৃদেব অ্যাঙ্কাইসিসের সঙ্গে দেখা করতে। অর্ফিউস, থেসিউস এবং হারকিউলিস ইতিপূর্বেই সশরীরে গেছে সেই মৃত্যুপারের দেশে। তবে আমিই বা কেন পারব না যেতে?

সিবিল বলল, 'মৃত্যুপুরী এভার্নাসে নেমে যাওয়া খুবই সহজ। সেখানকার দরজা দিনরাত খোলা আছে। কিন্তু আসল কথা হল, সেখান থেকে আবার আলোর দেশে ফিরে আসা। তবে নরকলোকের সব কিছু জেনেও যদি সেখানে যেতে তুমি বদ্ধপরিকর হও, তাহলে কী কী তোমার কর্তব্য সেটা ভাল করে জেনে নাও। এই অরণ্যের ভিতরে একটি গাছ আছে যার একটি ডাল সোনা দিয়ে গড়া। নরকের রানী প্রসের্পিনের প্রিয় সেই বৃক্ষশাখার ফুলপাতা সবই সোনার। সেই শাখাটি সঙ্গে নিয়ে যাবে দেবী জুনোর অর্ঘ্য হিসাবে। তোমার নরক-যাত্রা যদি দেবতার অভিপ্রেত হয় তাহলে তুমি হাত বাড়ালেই সেই ডালটি খসে পড়বে তোমার হাতে। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে শত চেষ্টা করেও সে ডাল তুমি ভেঙে নিতে পারবে না।'

একেটিসকে সঙ্গে নিয়ে মন্দির ছেড়ে তীরের দিকে ফিরে গেল ঈনিয়াস।

পরদিন ঊষাকাল।

এভার্নাসের কৃষ্ণনদীর তীরে সমবেত হয়েছে ঈনিয়াস ও সিবিল। ছায়াকায়ার মায়াপুরে যাবার আগে শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবার আয়োজন করেছে তারা। তাদের সামনে হাঁ করে আছে পুরোনো গাছপালায় অর্ধেক ঢাকা এক বিরাট গহ্বর! সেই গহ্বরের ভিতরেই তাদের নামতে হবে।

নরকের তৃষিত আত্মাদের তৃপ্তির জন্য অনেক রকম বলিদান হল। চারদিকে একটা অদ্ভুত আবহাওয়া। বাতাস যেন কাঁপছে থর-থর করে। পায়ের নিচে কাঁপছে পাহাড় অরণ্য আর পৃথিবীর মাটি। প্রেতাত্মার দল বুঝি পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছে নরকের দ্বার পার হয়ে।

সিবিল ফিস-ফিস করে বলল, 'ঈনিয়াস, সাহসে ভর করে আমাকে অনুসরণ কর।' বলেই সে হন্ হন্ করে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকার গহ্বরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটানা নৈঃশব্দের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে।

সব কিছু ফাঁকা-ফাঁকা। ছায়া আছে, কায়া নেই। সীমাহীন শূন্যতা যেন। প্রাণ নেই, আলো নেই, শুধু একটা ভৌতিক আবছায়া।

এমনি করে তারা পৌঁছল এভার্নাসের সীমান্তে। দুই জগতের এই সীমান্তে ছাউনি ফেলে রয়েছে যমরাজের শক্তিমান সহকারীরা। যমরাজার আদেশে এরাই ধ্বংস করে ফেরে সারা পৃথিবীময়। প্রথমে আছে দুঃখ; তারপর দুশ্চিন্তা; আরো পরে আছে পীত-চক্ষু ব্যাধি, আর ভয়, বন্যা, অভাব, পরিশ্রম ও অপরাধ। আরো আছে রক্তবস্ত্র পরিহিত যুদ্ধ ও দুর্ধর্ষ বিসম্বাদ।

আতঙ্কে থমকে দাঁড়াল ঈনিয়াস। আত্মরক্ষার জন্য কোষমুক্ত করল তরবারি।

সিবিল বলল, 'কোন ভয় নেই। এরা সব ছায়ামূর্তি। তোমার কোন ক্ষতি এরা করতে পারবে না, এগিয়ে এস।'

সেখান থেকে তারা উপনীত হল দুঃখ-নদীর তীরে। আকাশে বাতাসে কেমন একটা অস্পষ্ট আর্তনাদের ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছে।

তীরে খেয়া পারাপার করছে চারণ। তার বুক পর্যন্ত সাদা লম্বা দাড়ি। কোমরে জড়ানো মোটা কাপড়। সারা শরীর খোলা। চোখদুটি যেন আগুনের ভাঁটা।

চারণ তার আসন থেকে নেমে এসে খেয়া নৌকোয় পা দিতে-না-দিতেই হাজার হাজার যাত্রী এসে ভিড় করে দাঁড়াল ওপারে যাবার আশায়। সবাই হাত বাড়িয়ে চীৎকার করে বলছে—'আমাকে নাও—আমাকে নাও।'

চারণ কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকজনকে তুলে নিল নৌকোয়। অন্য সবাইকে সরিয়ে দিল দূরে।

সিবিল ফিসফিসিয়ে বলল, 'যাদের মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় নি তাদেরই ফিরিয়ে দিল মাঝি। একশো বছর ধরে তাদের এমনি করে নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। কিন্তু আর দেরি নয়, এইবার আমাদের নৌকোয় উঠতে হবে এই নদী পার হতে।'

ঈনিয়াসের হাত ধরে সিবিল এগিয়ে গেল খেয়া নৌকোর দিকে। খেয়ার মাঝি ততক্ষণে তীর থেকে ঠেলে দিয়েছে নৌকো। হঠাৎ তাদের দুজনকে ছুটে আসতে দেখে সে বলে উঠল, 'থাম! কে তোমরা? জীবন্ত দেহধারী কেউ কখনো এই নৌকোয় চড়ে যেতে পারে না মৃত্যুপারের দেশে।'

সিবিল তার দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। এই দেখ সোনালী শাখা।'

সিবিল তার বুকের ভিতর থেকে বের করে দেখাল সেই সোনালী শাখা। ব্যস। চারণের মুখ প্রশান্ত হয়ে উঠল। সানন্দে সে নৌকোয় তুলে নিল ঈনিয়াস ও সিবিলকে।

নিরাপদে তারা পৌঁছল অপর তীরে। সেখান থেকে কিছুটা এগিয়েই তারা দুটো খাড়া পাহাড়ের নীচে পৌঁছল। কালো মেঘ ফুঁড়ে উপরে উঠে গেছে তাদের চূড়ো। সেই পাহাড় পথের মুখে থাবা মেলে বসে ছিল নরকের তিনমুখো কুকুর সেবেরাস। তার উৎকট চীৎকারে আকাশ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সিবিল তার দিকে ছুঁড়ে দিল আফিং-রসে ভেজানো একখানা কেক। সেটাকে খপ করে গিলে খেতেই সেবেরাসের দুই চোখ ভেঙে নেমে এল গভীর ঘুম। চার-পা ছড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল।

এইবার তারা ঢুকল মৃত্যুপুরীতে।

বিরাট এক দ্বীপ। তার চারিদিকে চুলের বিনুনির মত পাকিয়ে পাকিয়ে বয়ে চলেছে তিনটি ভীষণ নদী—একেরন, কোসিটাস ও স্টিক্স। একটু অগ্রসর হতেই তাদের কানে এল করুণ আর্তনাদ। অসংখ্য শিশুর প্রেতাত্মা। অকালে যারা ঢলে পড়েছিল মৃত্যুর কোলে, এ তাদেরই আর্ত কণ্ঠস্বর।

আরো কিছু দূরে ভিড় করে আছে সেইসব হতভাগ্য প্রেতরা অকালে যারা নিজের হাতে ছিঁড়েছে জীবনের রশি।

সেখান থেকে মৃত মহাবীরদের প্রেতাত্মাদের দেখতে দেখতে তারা উপনীত হল প্লুটোর প্রাসাদ-মন্দিরের দ্বারদেশে। সেখানে সযত্নে রাখা একটি পাত্র থেকে পবিত্র জল দিয়ে নিজের মাথায় ছিটিয়ে, সোনালী শাখাটি সেই দরজার সংগে ঝুলিয়ে রেখে ঈনিয়াস সিবিলের সংগে সম্মুখে এগিয়ে চলল। পিছনে পড়ে রইল যত বীভৎস দৃশ্য আর উৎপীড়িত আর্তনাদ। এক নতুন আনন্দের দেশে তারা পেঁছে গেল। বাতাসে সেখানে মধুর গন্ধ। মাথার উপর মেঘহীন নির্মল নীলাকাশ। যত পবিত্র আত্মারা পরম শান্তিতে বাস করে সেই দেশে। সেখানে কেউ মল্লযুদ্ধ করছে। কেউ বা মুষ্টিযুদ্ধ। কেউ বা আবার সশব্দে চালাচ্ছে রথ। অনেকে মনের সুখে নাচছে অর্ফিউসের বেহালার তালে তালে।

একে একে সবাই এগিয়ে এসে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। সিবিল তাদের জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা বলতে পারেন, কোথায় বাস করেন অ্যাংকাইসিস? তাঁর সংগে দেখা করতেই আমরা এসেছি এরেবাসের কালো জল পার হয়ে।'

একজন জবাব দিল, 'আমাদের তো কোন স্থায়ী বাসস্থান নেই। ছায়া-শীতল কুঞ্জে আর সবুজ নদীতীরে আমরা দিন কাটাই। তবে আমার সংগে এস। প্রার্থিত জনের দর্শন পাবে।'

তাঁর পিছনে পিছনে এগিয়ে একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে তারা দেখতে পেল, অনেক নিচে একটা নির্জন প্রান্তরে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন অ্যাংকাইসিস।

তারা নেমে এল দ্রুত পদক্ষেপে।

দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাত হল পিতাপুত্রে। অনেক কথা হল দুজনে। অ্যাংকাইসিস অনেক সদুপদেশ দিলেন পুত্রকে। তার সম্মুখে তুলে ধরলেন ভবিষ্যং বংশধরদের বিচিত্র চিত্রাবলী। ঈনিয়াস একে একে দেখতে পেল তার পুত্রকে, রোমের প্রতিষ্ঠাতা রেমুলাসকে, দেখতে পেল সীজার ও অগাস্টাসকে, নুমা ও ব্রুটাসকে।

এক সময় অ্যাংকাইসিসের কাহিনী শেষ হল। ঈনিয়াসের চোখের সামনে থেকে মুছে গেল রাজ-কাহিনীর দৃশ্যপট।

ক্রমে রাত শেষ হয়ে গেল। দূরে বুঝি শোনা যায় দিনের পদধ্বনি। আর তো থাকা চলবে না প্রেতাত্মাদের দেশে। অ্যাংকাইসিস তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন প্লুটোর প্রাসাদ-মন্দিরের মর্মর-দ্বার পর্যন্ত। সেখানে অনেক সতর্কবাণী ও উপদেশ উচ্চারণ করে তাদের বিদায় দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন।

॥ ল্যাটিয়ামে পদার্পণ ॥

টাইবার নদীর তীরে ল্যাটিয়াম নগরী। স্যাটার্ণের বংশধর ল্যাটিনাস তখন ল্যাটিয়ামের রাজা। তার রানীর নাম আমাতা। তাদের একমাত্র মেয়ে ল্যাভিনিয়ার সঙ্গে টারনাসের বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে আছে।

এর মধ্যে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে ছিল একটা পুরনো লরেল গাছ। সেদিন সকাল বেলা একঝাঁক মৌমাছি গুনগুন করতে করতে এসে সেই লরেল গাছটাকে একেবারে আগাগোড়া ছেয়ে ফেলল।

ভবিষ্যদ্বক্তা বলল, 'এই আগন্তুক আসছে এই দেশে। সেই হবে এই রাজপুরীর একচ্ছত্রাধিপতি।'

আর একদিন। বিয়ের আগের অনুষ্ঠান হিসাবে ল্যাভিনিয়া যখন অগ্নি-কুণ্ডে আহুতি দিচ্ছিল, তখন হঠাৎ তার চুলে আগুন লেগে গেল। সেই আগুনে ছেয়ে গেল তার সারা শরীর। অথচ কী আশ্চর্য! রাজকন্যার তাতে কোন ক্ষতি হল না।

ভবিষ্যদ্বক্তা আবার বলল, 'মহারাজ, এই রাজকন্যা হবে বংশের গৌরব। কিন্তু এর জন্য শুরু হবে এক ভয়াবহ সংগ্রাম।'

এই সব অশুভ চিহ্ন দেখে ভয় পেয়ে রাজা ল্যাটিনাস গেল আলবুনিয়ার উষ্ণ প্রস্রবণের পার্শ্ববর্তী পবিত্র কুঞ্জে। তার পিতা ফনাসের দৈববাণী শুনতে।

একটি ভেড়া বলি দিয়ে তার চামড়ায় শরীর ঢেকে ল্যাটিনাস সারারাত শুয়ে রইল সেই গহ্বরের মুখে। মধ্যরাত্রে ভেসে এল আশ্চর্য কণ্ঠস্বর: 'ল্যাটি-য়ামের কোন মানুষের সঙ্গে বিবাহ দিও না রাজকন্যার। বহুদূরে থেকে যে মানুষ আসবে তার সঙ্গে হবে রাজকন্যার বিবাহ। আর তাদের বংশধররা একদিন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবে।'

সারা ল্যাটিয়ামে ছড়িয়ে পড়ল এই দৈববাণীর কথা। অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করতে লাগল সেই নবাগত মানুষের জন্য।

এপেনাইন পর্বতমালার সুউচ্চ চূড়ায় পড়েছে সূর্যের প্রথম আলো। বাতাস বইছে নিঃশব্দে। সাগর যেন নিশ্চুপ হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

ওকি !

হাজার দাঁড়ের ঐক্যতানে বিঘ্নিত হল প্রভাতের শান্ত নৈঃশব্দ্য। একে একে টাইবারের মোহনায় এসে নোঙর ফেলল ট্রয়ের নৌবহর। ল্যাটিয়ামের সাগরকূলে প্রথম পদক্ষেপ করল ঈনিয়াস। তারপর পুত্র ইউলাস। ক্রমে ক্রমে সব মানুষ।

দেখতে দেখতে শুরু হল ভোজের আয়োজন। বন থেকে পেড়ে আনা হল ফল-পাকুড়। আটা, ডিম আর পনীর মিশিয়ে তৈরি হল কেক। ক্ষুধার্ত নরনারী গোগ্রাসে খেয়ে সে সব শেষ করে ফেলল। তাদের হাব-ভাব দেখে ইউলাস হেসে উঠল। বলল, 'দেখ দেখ, এরা যেন খাবার টেবিলগুলোও খেয়ে শেষ করবে বলে মনে হচ্ছে।'

তার কথা শুনেই চমকে উঠে ঈনিয়াস ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে তাকে থামতে বলল।

কী ব্যাপার ?

ঈনিয়াস বলল, 'ইউলাস, তোমার ঐ কথাগুলো গভীর অর্থপূর্ণ। দীর্ঘকাল আগে আমার পিতা এক দৈববাণীতে বলেছিলেন, যে জায়গায় এসে ক্ষুধার তাড়নায় আমরা টেবিল পর্যন্ত খেতে বাধ্য হব সেই জায়গাই হবে আমাদের স্থায়ী বাসস্থান। অতএব এখানেই হবে আমাদের দীর্ঘ পথভ্রমণের অবসান।'

পরদিন ঈনিয়াস একশো জন বাছা-বাছা লোকের একটা দলকে দূত হিসাবে পাঠাল রাজা ল্যাটিনাসের রাজসভায়। শান্তির প্রতীক অলিভ পাতার মালা নিয়ে তারা হাজির হল রাজবাড়ির দরজায়।

একজন প্রহরী এসে তাদের নিয়ে গেল রাজার কাছে।

রাজা গভীর মনোযোগের সংগে শুনল তাদের সব কথা। মনে মনে ভাবল, নিশ্চয় এ-ই সেই আগন্তুক যার সংগে ল্যাভিনিয়ার বিয়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল দৈববাণীতে। প্রধান দূতকে সম্বোধন করে ল্যাটিনাস বলল, 'ট্রয়বাসীরা, পরম শুভক্ষণেই তোমরা এদেশে এসেছ। আমার একটি কন্যা আছে। দৈব নির্দেশে তাকে বিয়ে দিতে হবে কোন দূরদেশাগত আগন্তুকের সংগে। আমার স্থির বিশ্বাস, তোমাদের রাজাই সেই দৈবপ্রেরিত আগন্তুক। তার সংগেই আমি রাজকুমারীর বিয়ে দিতে চাই। তুমি সত্বর যাও। তাকে সদলে আমার প্রাসাদে আসতে বল।'

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল ট্রয়বাসীদের মধ্যে। ল্যাটিনাসের দেওয়া সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা রথে চড়ে চলল প্রাসাদের দিকে। স্বয়ং ঈনিয়াস চলল রক্তবস্ত্রে সজ্জিত দুই-ঘোড়ার এক রথে চড়ে।

ঠিক সেই সময়ে—

দেবী জুনো যাচ্ছিলেন আকাশ-পথে আর্গস থেকে কার্থেজের দিকে। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল নিচে টাইবার নদীর তীরে সেই অপরূপ শোভাযাত্রার দিকে।

ক্ষোভে রোষে জ্বলতে জ্বলতে তিনি বলে উঠলেন, 'উঃ, এই হতভাগাদের সঙ্গে কি আমি কিছুতেই পেরে উঠব না? কী আগুন, কী অস্ত্র, কী ঝড়, কী সমুদ্র—কিছুতেই কি এদের ধ্বংস নেই? এমনি করেই কি ব্যর্থ হবে আমার সব চেষ্টা? হেরে যাব আমি ঈনিয়াসের কাছে? না। তা কিছুতেই হবে না। ঈনিয়াস হবে দ্বিতীয় প্যারিস। ল্যাভিনিয়া হবে দ্বিতীয় হেলেন। ট্রয়বাসী ও ইটালিবাসীদের রক্ত হবে তাদের বিয়ের যৌতুক। অগ্নিশিখার আলোয় তাকে পা ফেলতে হবে বিবাহ বাসরে।'

এই কথা বলতে বলতে বিদ্যুৎবেগে জুনো নেমে এলেন পৃথিবীর মাটিতে। হাজির হলেন প্লুটোর কন্যা ইলেক্ট্রার অন্ধকার গুহায়। তাকে ডাকতে ডাকতে বললেন, 'ওঠ, জাগো! এই মুহূর্তে চলে যাও ইটালিতে। ইটালি ও ট্রয়ের মানুষদের মনে জেলে দাও হিংসার আগুন। তাদের বুকে এনে দাও ঝড়ের হাহাকার। আর হাতে দাও মৃত্যুর হাতিয়ার। তোমার কালো ডানা মেলে ছুটে যাও। আর দিকে-দিকে ছেড়ে দাও যুদ্ধ-কুক্কুরদের।'

মাথা পেতে সে আদেশ মেনে নিল ইলেক্ট্রো। তখনই হাজির হল ল্যাটিয়ামে।'

এদিকে রানী আমাতা তখন রাগে ফুঁসছিল তার নিজের ঘরে। ঈনিয়াসের সঙ্গে ল্যাভেনিয়ার বিয়ে কিছুতেই তার মনঃপূত হচ্ছিল না।

সকলের অলক্ষ্যে সেখানেই হাজির হল ইলেক্টো। তার চুলের ভিতর থেকে একটা সাপকে ধরে ছুঁড়ে দিল রানী আমাতার দিকে। সাপটা অনায়াসে আশ্রয় নিল তার বুকের ভিতরে। পাকে পাকে জড়াল তার সারা দেহকে। তার রক্তে ঢেলে দিল তীব্র বিষ।

সেই বিষের তাড়নায় আমাতা প্রথম গেল তার স্বামীর কাছে। তাকে বলল, 'এ তুমি কী করছ? তোমার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ ট্রয়ের এক নির্বাসিত দস্যুর সঙ্গে? তুমি কি জান না যে অনুকূল বাতাস পেলেই সে তোমার মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে এদেশ থেকে? প্যারিসের কাণ্ড-কারখানা দেখেও কি তোমার শিক্ষা হয় নি?'

ল্যাটিনাস কিন্তু এ বিয়েতে দৃঢ়সংকল্প। আমাতার কোন কথাকেই সে আমল দিল না।

আমাতা তখন অন্য পথ ধরল। ল্যাটিয়ামের প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার জন্য সকলকে উত্তেজিত করতে লাগল।

এমনকি ব্যাকাসের পূজোর ছূতো করে নিজের মেয়ে ল্যাভিনিয়া ও ল্যাটিয়ামের একদল মায়েদের নিয়ে সে গেল বনের মধ্যে। সেখানে সবাইকে উত্তেজিত করে ঈনিয়াসের সঙ্গে ল্যাভিনিয়ার বিবাহের বিরূদ্ধে রূখে দাঁড়াতে।

এদিকে ইলেক্টোও চুপ করে বসে নেই। রূটিলিয়ানদের যুবরাজ টারনাস ঘুমিয়ে ছিল তার প্রাসাদে। সেখানে গিয়ে ইলেক্টো ঘুমন্ত টারনাসকে বলতে লাগল, 'টারনাস, একজন আগন্তুক এসে তোমার বিয়ের কনেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আর তুমি তাই সহ্য করবে? কিছুতেই না! ধ্বংস কর এই বিদেশী জলদস্যুদের! জোর করে প্রতিষ্ঠিত কর তোমার অধিকার!'

টারনাস কিন্তু ঘুমের ঘোরেই হেসে উড়িয়ে দিল তার কথা।

তখন ঝড়ের গর্জনের মত চীৎকার করে উঠল ইলেক্টো, 'কী! তুই আমাকে চিনিস না? যমপুরী থেকে আমি এসেছি যুদ্ধ ও হত্যাকে দুই হাতে নিয়ে।'

বলেই একটা জ্বলন্ত মশাল টারনাসের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ইলেক্টো অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘুম ভেঙে গেল টারনাসের। জেগে উঠে সে দেখল, যমপুরীর সেই ভয়াল মশাল জ্বলছে দাউ দাউ করে।

সেই মশাল বুঝি জ্বলছে তার বুকের ভিতরেও। রক্তের হাহাকার যেন জেগেছে তার শিরায় শিরায়।

টারনাস ছুটে বেরিয়ে গেল প্রাসাদ থেকে।

দেখতে দেখতে তার বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তার আদেশঃ 'আক্রমণ কর ল্যাটিয়াম। অস্ত্রমুখে জয় করে আন ল্যাভিনিয়াকে। আক্রমণকারী ট্রয়বাসীদের নিক্ষেপ কর সাগরজলে।'

যুদ্ধের উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল সারা ল্যাটিয়াম ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি। শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের অভাব। তাহলেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে যুদ্ধের আগুন।

স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক দিতেও দেরি হল না।

ইউলিয়াস একদিন শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছিল বনে বনে। তার শিকারী কুকুরগুলোও তাড়া করে নিয়ে এল একটি সুন্দর হরিণ। ক্ষিপ্র হাতে তীর ছুঁড়ল ইউলাস। হরিণের শরীরে আমূল বসে গেল সে তীর। হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে।

সেটি ছিল ল্যাটিনাসের প্রধান বন-রক্ষক টিরিয়াসের পোষা হরিণ। তার

ছেলেমেয়েরা রাতদিন সেটাকে আদর করত, খেতে দিত। হরিণটা সারাদিন বনে বনে ঘুরে বেড়াত। আবার সন্ধ্যা হলেই বাড়ি ফিরে যেত।

আহত হরিণের চীৎকার শুনে ছুটে এল বন-রক্ষকের ছেলেমেয়েরা। হাতের কাছে যে অস্ত্র পেল তাই নিয়ে ছুটল প্রতিশোধ নিতে। টিরিয়াস কুড়ুল দিয়ে একটা গাছ কাটছিল বনের মধ্যে। সেই কুড়ুল নিয়ে সেও ছুটল।

দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ঘরে ঘরে উঠল শিঙাধ্বনি। যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে দলে দলে বেরিয়ে এল চাষীর দল গ্রামান্তর হতে।

যুদ্ধ শুরু হল। একদিকে সুশিক্ষিত ট্রয়-বাহিনী, অন্যদিকে সাধারণ গৃহস্থদল। তবু দুই পক্ষেই অনেকে হতাহত হল।

সন্ধ্যা হতেই সেদনের মত যুদ্ধ থেমে গেল। সবাই তখন ছুটল ল্যাটিনাসের কাছে। জানাল তাদের ক্ষয়-ক্ষতির কথা। দাবি জানাল প্রতিশোধ গ্রহণের।

টারনাসও তার দলবল নিয়ে যুদ্ধের হুঙ্কার দিতে লাগল।

তাদের সঙ্গে সুর মেলালো রানী আমাতা ও তার নারী-বাহিনী। সকলের মুখেই এক দাবি : 'যুদ্ধ! যুদ্ধ! ট্রয়বাসীদের ধ্বংস কর।'

ল্যাটিনাস সব হুঙ্কারকে অগ্রাহ্য করে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। কিন্তু ক্রমাগত একই কথা শুনতে শুনতে তারও মন টলল। হাতের রাজদণ্ড সে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

যুদ্ধের ইঙ্গিত পেয়ে মহা উল্লাসে রাজার জয়ধ্বনি করে উঠল সমবেত সকলে।

এদিকে টাইবার নদীর তীরে নিজের ছোট শিবিরে বসে গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে ঈনিয়াস। ল্যাটিয়ামবাসীদের যুদ্ধায়োজন দেখে সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কী এখন তার কর্তব্য? অনেক আশা নিয়ে সে এসেছে এখানে, সব কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

ঘুমের ঘোরে দেখল সে এক আশ্চর্য স্বপ্ন। শেওলার টুপি মাথায় পরে টাইবার-দেব স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'হে বীর, ভয় পেয়ো না। এ ঝড় কেটে যাবে। দেখা দেবে শান্ত দিন। এইখানে তুমি প্রতিষ্ঠা করবে দ্বিতীয় ট্রয়। কিন্তু তার আগে অবিলম্বে তুমি চলে যাও প্যালেণ্টিয়ামে। খুব বেশী দূরে নয় সে দেশ। সুদূর আর্কেডিয়া হতে সদলে নির্বাসিত হয়ে এসে ইভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছে সেই নগর। ল্যাটিয়ামের সঙ্গে তার অনেক দিনের সংঘর্ষ। অতএব তোমার এই আসন্ন বিপদে তুমি ইভাণ্ডারের সাহায্য প্রার্থনা কর। তবেই টারনাসের এই যুদ্ধায়োজনকে তুমি ব্যর্থ করে

দিতে পারবে। কিন্তু বীর, যুদ্ধে জয়লাভের পরে পিতা টাইবারের উদ্দেশ্যে একটা বলিদান করতে যেন ভুলো না।'

ভোরের প্রথম আলোয় ঘুম ভেঙে গেল ঈনিয়াসের।

নদী থেকে এক আঁজলা জল হাতে নিয়ে টাইবারের উদ্দেশ্যে সে নিবেদন করল। প্রার্থনা করল তাঁর আশীর্বাদ। তারপর দুইটি জাহাজ নিয়ে রওনা হল প্যালেণ্টিয়ামের দিকে।

টাইবার সস্নেহে রুদ্ধ করল তার তীব্র স্রোতধারা। শান্ত হ্রদের মত হল টাইবার নদ। তর-তর করে এগিয়ে চলল জাহাজ।

ঘটনাক্রমে—

ঠিক সেইদিনই পুত্র প্যালাস ও শহরের প্রধান লোকদের সঙ্গে নিয়ে ইভাণ্ডার এসেছিল নদীতীরে হারকিউলিসের উদ্দেশ্যে পূজা দিতে।

দূর থেকে ভেসে এল বৈঠার ছপ্-ছপ্ শব্দ। ভাল করে তাকাতেই চোখে পড়ল জাহাজের মাস্তুল।

বুঝি কোন শত্রু-সৈন্য আসছে নগর আক্রমণ করতে! ক্ষিপ্র হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে প্যালাস উঠল নদীর উঁচু তীরে। সেখান থেকে চীৎকার করে বলল, 'কে তোমরা অন্যায়ভাবে প্রবেশ করছ আমাদের নদীতে? কে তোমরা? শত্রু না মিত্র?'

ঈনিয়াস জবাব দিল, 'আমরা মিত্র। সুদূর ট্রয় থেকে এসেছি, ল্যাটিয়ামের বিরুদ্ধে তোমাদের বন্ধুত্ব কামনা করে।'

প্যালাস বলল, 'বেশ তবে এস। আমার পিতা ইভাণ্ডারের সঙ্গে কথা বল।'

ইভাণ্ডারের সম্মুখে এসে দাঁড়াল ঈনিয়াস। তার মুখের দিকে চেয়ে পুরোনো দিনের ছবি ভেসে উঠল ইভাণ্ডারের মনে। সস্নেহে সে বলল, 'তুমি তো আমার অপরিচিত নও। অ্যাংকাইসিসের পুত্র তুমি—ঠিক সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক। জানো, অনেক দিন আগে একদল ট্রয়বাসী অতিথি হয়েছিল আমার স্বর্গত পিতৃদেবের। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ ছিলেন অ্যাংকাইসিস। যাবার সময় তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন বাণ-ভর্তি একটি তূণ, সোনালী কাজ করা অঙ্গবাস আর দুটি স্বর্ণমুদ্রা। আমার ছেলে প্যালাসের কাছে সেগুলি আজও আছে। তাই তুমি তো আমার প্রাসাদে স্বাগত অতিথি। তোমার কোন ভয় নেই। আমার যথাশক্তি সাহায্য তুমি পাবে।'

॥ দুই বন্ধু ॥

ঈনিয়াসের অনুপস্থিতিতেও ট্রয়বাসীরা কিন্তু চুপ করে বসে ছিল না। দিনরাত পরিশ্রম করে তারা গড়ে তুলেছিল এক সুদৃঢ় রক্ষাব্যবস্থা। বন থেকে কাঠ কেটে এনে তারা গড়ে তুলল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকার।

প্রাকার নির্মাণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন তারা দেখতে পেল, সমগ্র দক্ষিণ পথ ধুলোয় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

নিশ্চয় আক্রমণ করতে আসছে শত্রুসৈন্য!

প্রধান নেতাদের নির্দেশে মুহূর্তে মধ্যে সকলে ঢুকে পড়ল দুর্গপ্রাকারের ভিতরে। প্রাকার-দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হল। সবাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

এগিয়ে এল একদল অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য। সকলের আগে টারনাস স্বয়ং। বিরাট এক ধূসর অশ্বে আরূঢ় হয়েছে সে। তার শিরস্ত্রাণে লাল পালক গোঁজা।

ধীরে ধীরে দুর্গ-প্রাকারের তিনদিকে ঘুরে সে দেখতে লাগল—কোথায় প্রথম আঘাত হানা যায়।

ঘুরতে ঘুরতে সে উপনীত হল টাইবারের তীরে। সেখানে ভিড় করে ছিল ট্রয়বাসীদের নৌ-বহর।

চীৎকার করে বলে উঠল টারনাস, 'আগুন চাই! আগুন! সকলের আগে পুড়িয়ে শেষ কর এই নৌ-বহর! পুড়িয়ে মার তার মাঝিমাল্লাদের!'

জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে ছুটে চলল ল্যাটিয়াম সৈন্যরা।

হাহাকার উঠল ট্রয়ের নৌ-বহরে।

কিন্তু দৈব সহায় হলে কে তাকে মারতে পারে?

দেবী সিবিলের প্রিয় স্থান ইডার পবিত্র অরণ্য থেকে সংগৃহীত মেপল ও পাইন কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ঈনিয়াসের সব জাহাজ। তাছাড়া স্বয়ং জুপিটারের আদেশ ছিল, যে সব জাহাজ নোঙর করবে টাইবারের তীরে তারা হবে অক্ষয় অমর, কোনমতেই তাদের ধ্বংস হবে না।

তাই—

ট্রয়বাসীরা যখন আত্মরক্ষার চিন্তায় আকুল হয়ে উঠেছে তখন সহসা আকাশের সোনালী মেঘের বুক থেকে ভেসে এল দৈববাণী: 'ট্রয়ের অধিবাসীগণ, জাহাজ রক্ষার কোন চেষ্টাই তোমরা কোরো না। নিজের জিনিস সিবিল নিজেই রক্ষা করতে জানে। ইডা অরণ্যের হে পবিত্র নৌ-বহর! মুক্ত তোমরা। তোমাদের মায়ের আদেশে তোমরা জলদেবী হয়ে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজগুলো যেন প্রাণ ফিরে পেল। ছিঁড়ে গেল নোঙর।

একে একে ডুবে গেল টাইবারের জলে। তাদের জায়গায় মাথা তুলল একদল জলকন্যা। জল ঝরছে চুল বেয়ে। সাদা সাদা হাত বাড়িয়ে জল কেটে কেটে ঢেউয়ের তালে তালে তারা ভাসতে লাগল।

রুটুলিয়ানরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখল এই বিস্ময়কর ঘটনা। তারা ভয় পেল। কিন্তু নির্ভীক টারনাস হুংকার দিয়ে বলল, 'কেন তোমরা ভয়ে কাঁপছ? নিজেদের তৈরি দুর্গ-প্রাকারে বন্দী হয়ে আছে ট্রয়বাসীরা। ওখানেই ওদের আমরা ধ্বংস করব।'

দিন গেল। রাত হল।

দুর্গ-প্রাকারের দুই পাশে সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছে দুইদল সৈন্য। একদল অবরোধ করেছে, আর একদল অবরুদ্ধ হয়েছে।

রাত গভীর হল।

ট্রয়ের দ্বাররক্ষী শক্তিমান শিকারী নাইসাস জেগে আছে অতন্দ্র চোখে। তার পাশে সুদর্শন কিশোর ইউরিয়ালাস। নাইসাস তাকে ভালবাসে ছোট ভাইয়ের মত।

নাইসাস কথা বলল চাপা গলায়, 'দেখ ইউরিয়ালাস, ওই পাহাড়ের ওপাশে আছে ইভাণ্ডারের রাজ্যে যাবার একটা পথ। সেই পথ ধরে গিয়ে ঈনিয়াসকে আমাদের এই সংকটের কথা আমি জানাতে চাই। এর ফলে হয়ত আমার মৃত্যু হবে। তবে এত বড় সৎকার্যের জন্য যে পুরস্কার আমার প্রাপ্য হবে তুমিই সেটা নিও। আর আমি? এর জন্য প্রাপ্য যশটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

ইউরিয়ালাস বলল, 'সে কি? সেই যশোগৌরব থেকে তুমি আমাকে কেন বঞ্চিত করতে চাও? চল, আমরা দুজনেই যাই ঈনিয়াসকে খবর দিতে।'

অনেক কথা কাটাকাটির পর স্থির হল, তারা দুজনই যাবে।

যাত্রার আগে ইউলাস বলল, 'তোমাদের এই মহৎ কর্মের পুরস্কার তোমরা অবশ্যই পাবে। এ যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হই, তাহলে নাইসাস, তুমি পাবে টারনাসের ঘোড়া আর ল্যাটিনাসের সবচেয়ে ভাল জমি। আর ইউরিয়ালাস, তুমি আমার সমবয়সী, তুমি হবে আমার প্রিয়তম বন্ধু।'

ইউরিয়ালাস বলল, 'তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে বন্ধু। আমার বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা না করেই আমি চলে যাচ্ছি, কারণ তাঁর চোখের জল আমি দেখতে পারি না। এ যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে তুমি তাঁকে দেখো।'

ইউলাস অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল, 'মায়ের জন্য তুমি ভেবো না বন্ধু। আজ হতে আমিও তাঁর ছেলে হলাম।'

নগর-দ্বার পার হয়ে দুজনে এগিয়ে চলল।

বিপদ-সংকুল পথ। প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে তাদের যেতে হবে। তবে সুখের বিষয়, প্রতিপক্ষের সৈন্যরা মদ খেয়ে প্রচুর হৈ-হুল্লোড় করে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। ছড়ানো মদের বোতলের পাশে তারাও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

নাইসাস শত্রুপক্ষের ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করে ফিস-ফিস করে বলল, 'কিছুটা দূরে থেকে তুমি আমাকে অনুসরণ করো। খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখো, কেউ যেন পিছন হতে আমাদের আক্রমণ করতে না পারে।'

যেতে যেতে নাইসাস ও ইউরিয়ালাস বেশ কয়েকজন শত্রুসৈন্যকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করল। ইউরিয়ালাস তো সুন্দর একটা শিরস্ত্রাণ পেয়ে সেটাকে মাথায় চড়িয়ে নিল। তারপর দ্রুত পায়ে দুজনে নামল জঙ্গলাকীর্ণ পথে।

কিছুদূরে যেতেই তাদের কানে এল অশ্বখুরের শব্দ। তাড়াতাড়ি দুই বন্ধু লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে।

লরেন্টাম থেকে একশো অশ্বারোহী সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল টারনাসের সঙ্গে যোগ দিতে। হয়ত তারা দুই বন্ধুকে না দেখতে পেয়ে সোজা চলে যেত। কিন্তু ইউরিয়ালাসের মাথার সেই শিরস্ত্রাণের ঝিকিমিকি তাদের চোখে পড়ে গেল। দলের সেনাপতি হুকুম করল, 'দাঁড়াও!'

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল অশ্বারোহী দল।

আর সেই সঙ্গে অন্ধকারের আড়ালে আরো গভীর ঝোপের আড়াল দিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল নাইসাস ও ইউরিয়ালাস। কিন্তু কিছুদূর একসঙ্গে যাবার পর এই সময়ে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। দুজনে ছিটকে পড়ল দুই দিকে।

এদিকে শিরস্ত্রাণধারীর কোন হদিস করতে না পেরে সেনাপতির আদেশে অশ্বারোহীরা সমগ্র ঝোপটাই ঘিরে ফেলল। তারপর তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল।

তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নাইসাস নিরাপদ দূরত্বে এসে হাঁপ ছাড়ল। কিন্তু একি? ইউরিয়ালাস তো নেই তার পাশে! কোথায় গেল সে? তবে কি সে ধরা পড়ল শত্রুর হাতে? পাগলের মত আবার ছুটে চলল নাইসাস সেই ঝোপের দিকে কোলাহল লক্ষ্য করে।

যা সে ভয় করেছিল ঠিক তাই। শত্রুসৈন্যরা ঘিরে ধরেছে ইউরিয়ালাসকে। বেচারা বৃথাই চেষ্টা করছে মুক্ত হতে। সেই দৃশ্য দেখে মাথায় খুন চেপে গেল নাইসাসের। একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে দিল একটা বর্শা। শত্রুপক্ষের একটি সৈনিক বর্শাবিদ্ধ হয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

শত্রুপক্ষের বিস্ময় কাটবার আগেই নাইসাসের দ্বিতীয় বর্শা আমূল বিদ্ধ হল দ্বিতীয় অশ্বারোহীর বুকে।

নিকটে-দূরে কাউকে না দেখতে পেয়ে হুংকার দিয়ে উঠল সেনাপতি। ইউরিয়ালাসকে লক্ষ্য করে তরবারি তুলে বলল, 'এদের দুজনের প্রাণের দাম তোকেই দিতে হবে।'

চীৎকার করে উঠল নাইসাস। এক লাফে শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হয়ে সে বলে উঠল, 'ওকে মেরো না, মেরো না!'

কিন্তু সেনাপতির ক্ষুরধার তরবারির আঘাতে ইউরিয়ালাসের ছিন্নশির দেহ ততক্ষণে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎগতিতে নাইসাসও তরবারি হানল সেনাপতির মুণ্ড লক্ষ্য করে। অব্যর্থ তার আঘাত। সেনাপতির মাথা দেহচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

আর সেই সংগে একশো হাতের উদ্যত অস্ত্রের আঘাত পড়ল নাইসাসের মাথায়। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে নাইসাস শেষবারের মত ইউরিয়ালাসের মৃতদেহকে গভীর আলিংগনে জড়িয়ে ধরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

জীবনে তারা ছিল প্রিয়তম বন্ধু। মৃত্যুতেও তারা রইল অভিন্ন।

॥ মহারণ ॥

পরদিন ভোরের আলোর সংগে-সংগেই নতুন করে আক্রমণ করল রুটুলিয়ানরা। অস্ত্রের ঝনঝনায় আর রণহুংকারে প্রকম্পিত হল দিগ্বিদিক। অগণিত সৈন্য ধেয়ে এল। তাদের সম্মুখে ঊর্ধ্বে উত্থিত বর্শার মুখে এগিয়ে চলল নাইসাস ও ইউরিয়ালাসের বিকৃত খণ্ডিত শির।

সে দৃশ্য দেখে আতংকে শিউরে উঠল ট্রয়বাসীরা। সহসা তাদের কানে এল একটি আর্তকণ্ঠের চীৎকার। শিবির-প্রাকারে দাঁড়িয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে আর্তনাদ করছে ইউরিয়ালাসের বৃদ্ধা মা: 'হা পুত্র ইউরিয়ালাস, এমনি ভাবেই কি তুমি আমার কাছে ফিরে এলে? নিষ্ঠুর! একটি কথাও না বলে এমনিভাবেই কি মাকে ছেড়ে যেতে হয়?'

ইউলাসের লোকজন এসে বৃদ্ধাকে নিয়ে গেল শিবিরের ভিতরে।

এদিকে দলে দলে এগিয়ে এল শত্রুসৈন্যের দল।

ট্রয়বাসীরাও বীরবিক্রমে তাদের বাধা দিল।

টারনাসের ভগ্নিপতি রেমুলাস ছিল শত্রুপক্ষের একজন বড় যোদ্ধা। পরিখার তীরে দাঁড়িয়ে ব্যংগের সুরে সে বলতে লাগল, 'ওহে ফ্রিজিয়ার মানুষরা

(অথবা কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোক বলাই বোধহয় ঠিক), গ্রীকদের বাঁশির সুরে একবার তো ভাল নাচই তোমরা দেখিয়েছ, আবার কি আমাদের বাঁশির সুরে নাচবার জন্যই তোমরা এতদূরে এসেছ? তাই যদি এসে থাকো, তাহলে হাতের ঢাল আর বর্শা ফেলে দিয়ে এস। তোমাদের কোমল হাতে ওগুলো মোটেই মানায় না।'

পরিখার এপারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল ইউলাস অসহ্য ক্রোধে, 'হে জুপিটার! আমাকে এমন শক্তি দাও যাতে ওর ওই বিষ-জিহ্বাকে আমি চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিতে পারি!'

সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের হুঙ্কারের ভিতর দিয়ে বুঝি এল দেবতার উত্তর। ইউলাসের হাতের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত হল বাণ। আমূল বিদ্ধ হল রেমুলাসের বুকে। চিরতরে স্তব্ধ হল তার কণ্ঠ।

জয়ধ্বনি করে উঠল ট্রয়বাসীরা।

অ্যাংকাইসিসের একদা পার্শ্বচর বৃদ্ধ বুটেস এগিয়ে এসে বলল, 'সাবাস বাবাজি, সাবাস! কিন্তু এই বিপদের মধ্যে আর নয়। এবার চল নিরাপদ স্থানে।'

বুটেসের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইউলাস শিবিরের ভিতর চলে গেল।

এদিকে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

ট্রয়ের পক্ষের দুই বীর ভ্রাতা বিটিয়াস ও প্যাণ্ডারাসের উপর ভার ছিল প্রধান দ্বার রক্ষার। দ্বার খুলে দিয়ে প্রাকারের ভিতরে দুই পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল দুই ভাই।

রুটুলিয়ানরা ভাবল, নিশ্চয় ভিতর থেকে বন্ধুরা দ্বার খুলে দিয়েছে. দলে দলে তারা ঢুকতে গেল প্রাকারের ভিতরে।

যেমন ঢোকা, অমনি অব্যর্থ হাতে আঘাত হানতে লাগল দুই বীর ভ্রাতা বিটিয়াস ও প্যাণ্ডারাস। দেখতে দেখতে শবের স্তূপ জমে উঠল দ্বারপথে।

টারনাস যুদ্ধ করছিল রণক্ষেত্রে অপর এক অংশে। তার কাছেও পৌঁছল দুঃসংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যত বর্শা হাতে সে ছুটল প্রধান দ্বার-পথের দিকে।

টারনাসের তখন সংহার-মূর্তি। কার সাধ্য দাঁড়ায় তার সামনে। তার হাতের বর্শার আঘাতে ঝড়ের মুখে পাতার মত লুটিয়ে পড়তে লাগল ট্রয়বাসীরা।

সবাই তখন একযোগে আক্রমণ করল টারনাসকে।

অকুতোভয় মহাবীর টারনাস। বিটিয়াসকে লক্ষ্য করে মহাবেগে ছুঁড়ল বর্শা। বর্ম চর্ম ভেদ করে সে বর্শা ঢুকল বিটিয়াসের বুকের ভিতরে।

হায় হায় করে উঠল ট্রয়বাসীরা। বিটিয়াসের মৃত্যুতে প্রমাদ গণল তারা। রণে ভংগ দিয়ে সবাই ছুটল খোলা দরজার দিকে।

সকলের শেষে এল প্যাণ্ডারাস। মস্ত দেহটাকে ঝাঁকানি দিয়ে প্রকাণ্ড দরজাটাকে সে একাই বন্ধ করে দিল। কয়েকজন সহকর্মী যে দরজার বাইরেই রয়ে গেল সে দিকে লক্ষ্যও রইল না।

দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে ভিতরে চোখ ফেলেই বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেল। ট্রয়বাসীদের সংগে সংগে বিটিয়াসের হত্যাকারী টারনাসও ঢুকে পড়েছে প্রাকারের ভিতরে।

প্যাণ্ডরাস চীৎকার করে উঠল, 'ভালই হয়েছে যে তোকে এবার হাতের মুঠোয় পেয়েছি। আমার ভাইয়ের রক্ত-ঋণ এবার শোধ হবে।'

বলেই একটা বল্লম সে ছুঁড়ে দিল টারনাসকে লক্ষ্য করে।

বিদ্যুৎগতিতে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করল টারনাস। তারপর দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে হাতের খোলা তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিল প্যাণ্ডারাসের মাথায়।

আধ-কাটা আপেলের মত প্যাণ্ডারাসের দ্বিখণ্ডিত মাথাটা বীভৎসভাবে ঘাড়ের দুই পাশে ঝুলে পড়ল। সেই দৃশ্য দেখে দারুণ আতংকে সবেগে পিছু হঠতে লাগল ট্রয়বাসীরা।

টারনাস যদি তখন বুদ্ধি করে শিবির-প্রাকারের প্রধান দ্বারটি খুলে দিত আর সেই দ্বারপথে ভিতরে যদি ঢুকে পড়ত রুটুলিয়ানরা, তাহলে ট্রয়বাসীদের সব আশার সেদিন সমাধি হয়ে যেত। কিন্তু হত্যার নেশায় পেয়ে বসেছে টারনাসকে। রুদ্ধ দ্বার পথ পিছনে ফেলে রক্তাক্ত তরবারি হাতে সে তাড়া করল পলায়মান ট্রয়বাসীদের।

হাহাকার পড়ে গেল ট্রয়-শিবিরে। মৃত্যুর তাণ্ডব শুরু হল সেখানে।

অবশেষে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ট্রয়বাসী মৃত্যুপণ করে রুখে দাঁড়াল। তাদের মিলিত আক্রমণে রুদ্ধ হল টারনাসের অগ্রগতি। অবস্থা বেগতিক বুঝে রণক্লান্ত টারনাস এবার ক্রমে ক্রমে পিছু হটতে লাগল টাইবার নদের দিকে। যেতে যেতেও বার-দুই সে ফিরে দাঁড়াল। নির্ভীক হস্তে অস্ত্র চালাল শত্রুকে লক্ষ্য করে। তারপর এক সময়ে টাইবারের একেবারে তীরে এসে সহসা মুখ ফিরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

আবার যখন সে মাথা তুলল জলের উপরে তখন সে শত্রুর আক্রমণের পাল্লার বাইরে। ক্ষিপ্র হাতে সাঁতার কেটে কেটে টারনাস এগিয়ে চলল তীরের দিকে। সেখানে তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে তার সংগীরা।

মর্ত্যের মাটিতে যখন চলেছে এমনি মহারণ, স্বর্গের দরবার কক্ষে তখন বসেছে দেবতাদের এক বিশেষ সভা।

সকলে আসন গ্রহণ করবার পর দেবরাজ জুপিটার বললেন, 'ইটালিবাসী ও ট্রয়বাসীদের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামের অর্থ কী? বল, তোমাদের মধ্যে কে বা কারা এই যুদ্ধের জন্য দায়ী?'

উঠে দাঁড়ালেন দেবী ভিনাস। মুখে তাঁর উদ্বেগ ও আতঙ্কের ছায়া। ভিনাস বললেন, 'আমার উপর এবং আমার প্রিয় ট্রয়বাসীদের উপর এই নির্যাতন আর কতকাল চলবে বলতে পারেন? ট্রয়ের বিয়োগান্ত ইতিহাস কি আবার লিখিত হবে? মিথ্যা হবে দৈববাণী? তাই যদি হয়, ইটালির মাটিতে প্রতিষ্ঠালাভ যদি ট্রয়বাসীদের ভাগ্যে না থাকে, তাহলে সে কথা আপনি স্পষ্ট বলে দিন। বালক ইউলাসকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই। সাইপ্রাসে বা সাইথেরাতে আমার কোন মন্দিরে সেবা-দাস হয়েই না-হয় সে জীবন কাটাবে। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন পিতা। কেন তাহলে তাদের রক্ষা করেছিলেন ট্রয়ের ধ্বংস-বহ্নি থেকে? কেন তাদের রক্ষা করেছিলেন জলে স্থলে সহস্র বিপদের হাত থেকে? আপনি জিজ্ঞাসা করছেন, এই মহা-যুদ্ধের জন্য কে দায়ী? ঐ দেখুন আপনার পাশেই তিনি বসে আছেন—আপনার রানী জুনো। তিনিই ঝড় তুলে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন ওদের নৌ-বহর। তাঁরই প্ররোচনায় সিসিলিতে মেয়েরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল জাহাজে। আর এখানেও তাঁর দ্বারা প্রেরিত হয়েই ইলেক্টো ইটালিতে জ্বালিয়েছে এই মহাযুদ্ধের আগুন।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন জুনো। প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'বৃথাই তুমি আমার উপর দোষারোপ করছ। এর জন্য কে দায়ী—আমি না ঈনিয়াস? তুমি কি বলতে চাও টারনাসের কোন দাবি নেই? ল্যাভিনিয়া কি তার কাছে বাগদত্তা নয়? আজ তার ভাবী বধুকে অন্যে নিয়ে যাবে, তার দেশ যাবে অন্যের হাতে, আর চুপ করে বসে সে তাই দেখবে?'

অনেকক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলল দুজনে। অন্যরাও কখনো এ পক্ষ, কখনো ও পক্ষের হয়ে নানা মন্তব্য করল। অবশেষে উঠে দাঁড়ালেন দেবরাজ জুপিটার। হাত তুলে বললেন, 'স্বর্গবাসীরা, আমার কথা এবার শোন। সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ কর। ওদের ভাগ্যের ফল ওরা ভোগ করুক। তোমরা কেউ তাতে হস্তক্ষেপ কোরো না। শক্তি থাকে, ওরা নিজেরাই এ মহাসমস্যার সমাধান করুক। নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না।'

॥ সসৈন্য ঈনিয়াস ॥

সফল হয়েছে ঈনিয়াসের প্যালেণ্টিয়াম যাত্রা।

ত্রিশখানি জাহাজ পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে টাইবারের মোহনার দিকে। অশ্বারোহী বাহিনী এগিয়ে গেছে স্থলপথে।

মধ্যরাত্রি। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র।

বিনিদ্র চোখে হাল ধরে বসে আছে ঈনিয়াস। হঠাৎ তার মনে হল, কারা যেন সাঁতার কেটে আসছে জাহাজের দিকে। ভাল করে চেয়ে দেখল, চুল এলিয়ে দুধ-ধবধবে শরীর নেড়ে এগিয়ে আসছে একদল জলপরী। একে একে এসে তারা অর্ধচন্দ্রাকারে জড়ো হল জাহাজের পাশে। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'আমরা সবাই একদিন তোমার জাহাজে ছিলাম। মায়ের আশীর্বাদে আজ জলপরী হয়েছি। শোন, চতুর্দিক থেকে শত্রুরা আক্রমণ করেছে তোমার ছেলেকে। কিন্তু ভয় পেয়ো না। আর্কেডীয় অশ্বারোহী বাহিনী এতক্ষণ প্রায় পেঁছে গেল তার সাহায্যে। আর তুমিও কালই সসৈন্যে তার পাশে দাঁড়িয়ে টারনাসের বাহিনীতে হাহাকার তুলতে পারবে।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই জলপরীরা আবার সাঁতার কেটে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তাদের অভয়-বাণীতে যেন নতুন বল পেল সবাই। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল নৌ-বহর।

ভোর হতে-না-হতেই তারা টাইবারের মোহনায় পেঁছে গেল। প্রাচীরের ভিতর থেকে আনন্দে চীৎকার করে উঠল রক্ষী-বাহিনী। ট্রয়বাসীদের মধ্যে নতুন আশার সাড়া পড়ে গেল।

কিন্তু প্রমাদ গুণল রুটুলিয়ানরা। ত্রিশখানি জাহাজ ভর্তি সশস্ত্র সৈন্য এসে হাজির হয়েছে টাইবার কূলে। এরা যদি বিনা বাধায় যোগ দিতে পারে ট্রয়বাসীদের সঙ্গে, তাহলে তো সমূহ বিপদ। অতএব ঐ সাগরকূলেই বাধা দিতে হবে নবাগত সৈন্যদের! এই কথা ভেবে রুটুলিয়ানরা দলে দলে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সাগর তীরে সমবেত হল।

নৌ-বহরের একেবারে প্রথম জাহাজের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল স্বয়ং ঈনিয়াস। ঈশ্বরদত্ত বর্মচর্মে আপাদমস্তক সুসজ্জিত। মাথায় অগ্নিবর্ণ শিরস্ত্রাণ। রক্ত-লাল বর্ণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার হাতের সুদৃঢ় বর্ম থেকে।

রুটুলিয়ানদেরও একেবারে সম্মুখে অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে ছিল টারনাস। এবার সে চীৎকার করে বলল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিশ্রম আমাদের অনেক লাঘব হয়েছে। শত্রুরা দল বেঁধে একেবারে আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে! আক্রমণ কর। কেউ যেন জাহাজ থেকে নেমে প্রাচীরের ভিতরে ঢুকতে না পারে।'

এদিকে ঈনিয়াস এবং টাস্কান নেতা টারচোর পরিচালনায় সৈন্যরা তীরে নামতে শুরু করে দিয়েছে। অনেকে তো অধৈর্য হয়ে জাহাজ তীরে ভিড়বার আগেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাঁতার কেটে এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে, অন্যরা সব ভিড় করেছে জাহাজের মুখের কাছে।

শত্রুর হঠাৎ আক্রমণে তারা যেন মুহূর্তের জন্য দিশাহারা হয়ে পড়ল। তখুনি ভীমবেগে এগিয়ে এল ঈনিয়াস। তরবারির এক আঘাতে ধরাশায়ী করল একজন দীর্ঘদেহী বীরকে। তারপর সে হত্যা করল গদাধারী দুই মহাবীর ভাইকে। সাইডন নামে এক তরুণ বীর এগিয়ে এল ঈনিয়াসের সম্মুখে। ঈনিয়াসের অস্ত্রের আঘাতে তারও জীবনের শেষ মুহূর্ত অচিরাৎ ঘনিয়ে আসত। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার সাত ভাই একযোগে সাতটি বর্শা ছুঁড়ল ঈনিয়াসকে লক্ষ্য করে। কঠিন বর্মে লেগে ছিটকে পড়ল সাতটি বর্শা। ঈনিয়াসের কোন ক্ষতিই হল না। পাল্টা আক্রমণে সে-ই বরং তাদের তিনজনকে হত্যা করল। সাগর তীর রক্তে রাঙা হয়ে উঠল।

ওদিকে প্যালেসের নেতৃত্বে অশ্বারোহী বাহিনী এল এগিয়ে। পার্বত্য পথে অশ্বচালনায় অসুবিধা হওয়ায় তারা ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটেই এগিয়ে এসেছে। শত্রু-সৈন্য এগিয়ে এসে তাদেরও বাধা দিল।

আর্কেডীয় বাহিনী প্রথমে পিছু হটতে লাগল। কিন্তু তাদের তরুণ সেনাপতি প্যালাস বর্শা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুসৈন্যের মধ্যে। তার আক্রমণে একে-একে নিহত হল শত্রুপক্ষের অনেক বীর। কারো দেহ দ্বিখণ্ডিত হল। কারো হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হল। কারো বা শির হল দেহচ্যুত। সেনাপতির এই অপূর্ব বীরত্ব দেখে সাহস ফিরে পেল তার সৈন্যদল। নতুন উৎসাহে তারা আক্রমণ করল শত্রুপক্ষকে। দলের পর দল এসে যোগ দিতে লাগল উভয় পক্ষে। যুদ্ধক্ষেত্র নরককুণ্ডে পরিণত হল।

এমন সময় সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হতে লাগল একটিমাত্র নাম 'টারনাস! টারনাস।'

দ্রুত বেগে রথ চালিয়ে টারনাস হাজির হল প্যালাসের সম্মুখে। চীৎকার করে বলল, 'তোমরা সব সরে দাঁড়াও! আমাকে পথ দাও! প্যালাসের উচিত শাস্তির বিধান আমিই করছি।'

দুই পক্ষের সৈন্যরা সরে দাঁড়াল। টারনাস রথ থেকে নামল মাটিতে। মুখোমুখি হল দুই বীর টারনাস ও প্যালাস—প্রবীণ ও নবীন। দৃঢ় হাতে বর্শা উদ্যত করে প্যালাস হারকিউলিসকে উদ্দেশ করে বলল, 'হে মহাবীর, আমার পিতার ভোজসভায় একবার তুমি অতিথি হয়ে এসেছিলে। আজ তুমি আশীর্বাদ কর, আমার বর্শার আঘাতে যেন টারনাসের পতন হয়।'

প্যালাসের হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা টারনাসের ঢালে লেগে ছিটকে পড়ল।

টারনাস বলে উঠল, 'এইবার পরীক্ষা হোক আমার অস্ত্রের শক্তি।'

টারনাসের বর্শা বর্ম-চর্ম ভেদ করে তরুণ প্যালাসের বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল। এক টানে সে বর্শা সে বুক থেকে খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে

ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্তের ধারা। মুখ থুবড়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। মৃত্যু-যন্ত্রণায় মুখ ঘসতে লাগল মাটিতে।

দুঃসংবাদ পৌঁছুল ঈনিয়াসের কানে। ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে জ্বলে উঠল ঈনিয়াস। তখুনি সে ছুটল রণক্ষেত্রের সেই অঞ্চলে টারনাসের আক্রমণ যেখানে ধ্বংস ডেকে এনেছে আর্কেডীয় বাহিনীতে। কাস্তের মুখে যেমন মাটিতে গড়িয়ে পড়ে পাকা ঘাসের শিষ, তেমনিভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল অগণিত মানুষের প্রাণহীন দেহ ঈনিয়াসের পথের দুধারে।

একজন শত্রুসৈন্যকে লক্ষ্য করে বর্শা তুলতেই দ্রুত এগিয়ে এসে সে ঈনিয়াসের দুই পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'দোহাই আপনার, আমার বাবা আছে, ছোট ছেলে আছে, ওদের জন্য আমাকে বাঁচতে দিন! ঘরে আমার সোনা রুপো বোঝাই করা আছে। আমার জীবনের বিনিময়ে অনেক সোনা আপনাকে দেব।'

ঈনিয়াস জবাব দিল, 'সে সোনা ঘরে থাকলে তোমার মৃত্যুতে তোমার ছেলে আরও বড়লোক হতে পারবে। না না, প্যালাসের মৃত্যুর পরে মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই আমার কাছে!'

বলতে বলতে শিরস্ত্রাণ ধরে লোকটার মুণ্ডুটাকে ঘুরিয়ে দিল ঈনিয়াস। অর্ধ পথেই চিরতরে নিভে গেল তার কণ্ঠস্বর।

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল ঈনিয়াস। তার অপূর্ব বীরত্ব দেখে প্রাচীরের ভিতরকার ট্রয়বাসীরা মহা আনন্দে জয়ধ্বনি করতে করতে খুলে দিল প্রাচীর-দ্বার। সবলে এবং সঙ্গে বেরিয়ে এল নবাগত মিত্র-সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে। একা ঈনিয়াসের বাহুবলে যুদ্ধের গতি ফিরে গেল।

॥ জুনোর কারসাজি ॥

দেবলোকের সিংহাসনে বসে দেবরাজ জুপিটার দেখছিলেন মর্ত্য-লোকের এই নারকীয় খেলা। এবার তিনি হেসে বললেন জুনোর দিকে চেয়ে, 'কী গো, ট্রয়বাসীদের মধ্যে নাকি মানুষ নেই? সবই নাকি ভিনাসের কাজ?'

মুখ তুলে ক্ষোভের সঙ্গে জুনো বললেন, 'আমার দুঃখ নিয়ে এ-ভাবে ঠাট্টা করা আপনার উচিত নয়। আপনি যদি আমাকে আগের মত ভালবাসতেন, তাহলে ভক্ত টারনাসের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিতে কিছুতেই আপনি অস্বীকার করতেন না। তবু একটি সামান্য অনুরোধ আমার রাখুন দেবরাজ। আমি জানি, টারনাসের জীবন ভাগ্যের হাতের পুতুল। তবু

এবারকার মত ঈনিয়াসের হাত থেকে তার জীবন রক্ষা করবার অনুমতি আমাকে দিন। তারপর যা ভাগ্যে আছে তাই হবে।'

দেবরাজ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত তীরবেগে নেমে গিয়ে জুনো অদৃশ্য-ভাবে যুদ্ধরত ট্রয়বাসী ও ইটালিবাসীদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তারপর মায়াবলে সৃষ্টি করলেন এক নকল ঈনিয়াস—হুবহু আসল ঈনিয়াসের মত—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চেহারা। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অস্ত্রশস্ত্রও এক।

হাতের বর্শা আস্ফালন করতে করতে সেই ভৌতিক যোদ্ধা সোজা হাজির হল টারনাসের সামনে।

মহা শত্রুকে সম্মুখে দেখে টারনাসও কালবিলম্ব না করে স্থির লক্ষ্যে বর্শা নিক্ষেপ করল। সঙ্গে-সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করল ভৌতিক যোদ্ধা।

যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে মহাবীর ঈনিয়াস! টারনাস তো বিস্ময়ে হতবাক। পরমুহূর্তেই সে চীৎকার করে বলে উঠল, 'রে ভীরু! দাঁড়া! এখানেই তোকে সমাধি দেব।'

বলতে বলতে টারনাস তাকে অনুসরণ করল। ভৌতিক যোদ্ধা ছুটতে ছুটতে সাগরতীরে নোঙর-বাঁধা একটি জাহাজে উঠে পড়ল। টারনাসও উঠল সেই জাহাজে। ঈনিয়াসকে সে কোন মতেই রেহাই দেবে না আজ।

ঠিক সেই মুহূর্তে দেবী জুনো জাহাজের নোঙর খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ারের টানে জাহাজ সমুদ্রের বুকে চলতে লাগল।

ভৌতিক যোদ্ধা এবার বেরিয়ে এল টারনাসের সামনে। তারপর দেখতে দেখতে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে টারনাস বুঝতে পারল যে তাকে ফাঁকি দিয়ে রণক্ষেত্র হতে সরিয়ে আনা হয়েছে। অসহায় ক্রোধে সে ছুটে গেল জাহাজের কিনারে। দূরে তীরভূমিতে চলেছে প্রচণ্ড যুদ্ধ। ঈনিয়াসের আক্রমণে ঝড়ের পাতার মত ঝরে পড়ছে তার সৈন্যদল।

তিনবার সে চেষ্টা করল জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে তীরে পৌঁছতে। তিনবারই কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে বাধা দিল। তিনবার সে চেষ্টা করল নিজের অস্ত্র বুকে বসিয়ে এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে। তিনবারই কোন্ অদৃশ্য শক্তি চেপে ধরল তার হাত।

আর এক রহস্যময় শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে জাহাজখানা দ্রুত গতিতে ভেসে চলল তার স্বদেশের দিকে।

এ যাত্রায় টারনাসের প্রাণরক্ষা হল।

॥ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ॥

টারনাস রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় তার জায়গায় সেনাপতি হল দুরাচারী মেজেণ্টিয়াস। টারনাসের পরে সে-ই ছিল ইটালির সবচেয়ে বড় বীর। যেমন বীভৎস চেহারা তেমনি নৃশংস তার আচরণ। তার আক্রমণে একে একে মারা পড়ল মিমাস্, একেরন প্রভৃতি ট্রয়ের বীররা।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এল ঈনিয়াস।

দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে মেজেণ্টিয়াস গর্বোদ্ধত কণ্ঠে বলল, 'হে আমার প্রিয় বর্শা, এবার যেন লক্ষ্য তোমার অব্যর্থ হয়। আর হে আমার দক্ষিণ হাত, তুমি হও আমার বিধাতা। এ যুদ্ধের জয়-গৌরব পাবে আমার পুত্র। নিহত জলদস্যুটার অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে দেব তার বীরদেহ।'

প্রবল শক্তিতে সে নিক্ষেপ করল বর্শা। ঈনিয়াসের ঢালে লেগে ছিটকে গিয়ে সে বর্শা বিদ্ধ করল ট্রয়ের বন্ধু আর্গসবাসী এণ্টোরেসের দেহ। মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করে সে ধরাশায়ী হল।

এবার ঈনিয়াস নিক্ষেপ করল তার বর্শা। মেজেণ্টিয়াসের ঢাল ভেদ করে সে বর্শা আহত করল তাকে। টাস্কান-বীরের রক্ত দেখে আনন্দে উৎফুল্ল চিত্তে ঈনিয়াস তার তরবারি কোষমুক্ত করল। এবার সে হানবে শেষ আঘাত।

বাধা দিল মেজেণ্টিয়াসের বীরপুত্র তরুণ লসাস্। বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এসে নিজের ঢাল দিয়ে ঈনিয়াসের তরবারির আঘাতকে সে প্রতিহত করল।

ঈনিয়াস বলল, 'দুঃসাহসী যুবক, সাবধান! খুব সাবধান! ঈনিয়াসের আক্রমণ প্রতিরোধ করা তোমার সাধ্যাতীত।'

লসাস্ ঘৃণাভরে উপেক্ষা করল সে সতর্ক-বাণী। তার হাতে উদ্যত হল ক্ষুরধার অস্ত্র। অগত্যা ঈনিয়াসও করল প্রতি-আঘাত। লসাসের মায়ের হাতে বোনা সোনালী সুতোর পাড়-বসানো জামা রক্তে লাল হয়ে গেল। তরুণ বীরের মৃত্যু-ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বড়ই মায়া হল ঈনিয়াসের। হাত ধরে তাকে তুলে সে বলল, 'ভাগ্যহীন সাহসী বালক, তুমি যে আমার ইউলাসের সমবয়সী। পবিত্রভাবে যাতে তোমার শেষযাত্রা সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। কেউ তোমার রণ-সাজ খুলে নেবে না। তোমার মৃতদেহ আমি পাঠিয়ে দেব তোমার আত্মীয়-জনের কাছে।'

ঈনিয়াস দুজন সৈনিককে ডেকে বলে দিল লসাসের মৃতদেহ বয়ে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দিতে।

এদিকে মেজেণ্টিয়াসের সৈন্যরা তার আহত দুর্বল দেহকে বয়ে নিয়ে গেল নির্জন নদীতীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য। তার বর্ম-চর্ম অধিকাংশই খুলে নেওয়া হয়েছে। একটা গাছে হেলান দিয়ে সে বসে আছে। মাথাটা কাত হয়ে আছে একদিকে। রক্তে ভিজে জট পাকিয়ে গিয়েছে তার দাড়ি। চোখ তুলে ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'লসাস্ কোথায়? তোমরা যাও, তাকে এখানে নিয়ে এস।'

কাউকে যেতে হল না। লসাসের প্রাণহীন দেহকে একটি ঢালের উপর শুইয়ে সেখানে হাজির হল দুজন সৈনিক। সে দৃশ্য দেখে নিষ্ঠুর মেজেণ্টিয়াসের পাষাণ প্রাণও গলে গেল। সে আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'লসাস, প্রিয় পুত্র আমার, আমার জন্যই তুমি জীবন দিয়েছ! অন্যায় করেছিলাম আমি, তুমি শোধ করলে তার ঋণ। তবে আর কেন? আমার এই ব্যর্থ জীবন মৃত্যুর অন্ধকারেই চির-আবৃত হোক।'

স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল মেজেণ্টিয়াস। প্রিয় অশ্ব হ্রবাসকে আনতে বলল। তারপর সেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হ্রবাসের পিঠ চাপড়ে বলল, 'হ্রবাস, তোর আর আমার আজ একই লক্ষ্য, হয় জয় নয় মৃত্যু। আমি জানি, আমার মৃত্যুর পরে অন্য কোন বীরকেই তুই আর বহন করবি না।'

মেজেণ্টিয়াস ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রণক্ষেত্রের দিকে। চীৎকার করে বলতে লাগল, 'কোথায় ঈনিয়াস? কোথায় পুত্রঘাতী পিশাচ? আমার অর্ধেক জীবন তুমি নিয়েছ। যদি শক্তি থাকে তবে বাকি অর্ধেকও নাও। কিন্তু তার আগে নাও আমার এই উপাদেয় উপহার।'

ভীমবেগে বর্শা ছুঁড়ল মেজেণ্টিয়াস। আবার। আবার। ঈনিয়াসের ঢালে বিঁধে বর্শাগুলো থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

মেজেণ্টিয়াসের হাতের সব বর্শা নিঃশেষ হয়ে গেল। এইবার বর্শা ছুঁড়ল ঈনিয়াস। আমূলে বিদ্ধ হল হ্রবাসের কপালে। তীব্র হ্রেষারব করে সামনের দুই পা ঊর্ধ্বে তুলে হ্রবাস মাটিতে আছড়ে পড়ল। তার দেহের নিচে পিষ্ট হল আরোহী প্রভুর রণক্লান্ত আহত দেহ। কোনক্রমে নিজেকে বাইরে টেনে এনে চোখ তুলেই দেখল, উদ্যত তরবারি হাতে ভয়াল ভ্রূকুটি মুখে নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে ঈনিয়াস। অসহায় কণ্ঠে সে বলল, 'আমার একটি শেষ অনুরোধ তুমি রেখো। আমার মৃতদেহ যেন অশুদ্ধ না হয়। আমার পুত্রের পাশেই যেন আমাকে সমাধি দেওয়া হয়।'

নেমে এল উদ্যত তরবারি।

যে পাপাত্মা জীবনে মানুষ দেবতা কি পিশাচ কাউকে ভয় করে নি এবার সে প্রস্থান করল নিজধামে।

॥ দ্বৈত-যুদ্ধ ॥

মেজেণ্টিয়াসের মৃত্যুতে মহাযুদ্ধের সাময়িক বিরতি হল। সেই অবকাশে উভয় পক্ষই যুদ্ধে নিহত বীরদের সৎকারের কাজে আত্মনিয়োগ করল।

ঈনিয়াসের প্রথম কাজ হল, প্যালাসের মৃতদেহকে প্যালাণ্টিয়ামে তার বাবার কাছে পাঠানো। লাল জমিনের উপর সোনালী কাজ করা দামি কাপড়ে ঢেকে তরুণ বীরের দেহকে শুইয়ে দেওয়া হল কোমল শয্যায়। কচি কিশলয়ের আচ্ছাদন দেওয়া হল শয্যার উপরে ছায়া-শীতল চন্দ্রাতপের মত। আর এক হাজার যোদ্ধা হাতের বর্শার মুখ মাটির দিকে ফিরিয়ে বিরাট শোভাযাত্রাসহকারে সেই শবদেহের অনুগমন করল।

শোভাযাত্রা ইভাণ্ডারের রাজ্যে পেঁছিবার আগেই যুবরাজের মৃত্যু-সংবাদ সেখানে প্রচারিত হয়েছিল। তাই শোভাযাত্রা নগর-প্রাচীরের উপকণ্ঠে পেঁছানো মাত্রই প্যালাণ্টিয়ামের প্রজাবৃন্দ পথের দুই পাশে ভিড় করে দাঁড়াল। বেদনায় রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ রাজা ইভাণ্ডার এল সকলের শেষে।

মৃতদেহ যথারীতি সৎকার করা হল। শোভাযাত্রীরা ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত। তাদের সম্বোধন করে বৃদ্ধ রাজা ইভাণ্ডার বলল, 'আমার কোন ক্ষোভ আছে এ কথা ভেবো না। তরুণরা চলে যাবে, আর প্রবীণরা পড়ে থাকবে, এই হয়ত বিধাতার বিধান। তাছাড়া সম্মানের সঙ্গে যে মৃত্যু, তা কখনো অকাল-মৃত্যু নয়। কিন্তু মৃতের প্রতি সম্মান হিসাবে একটি দাবি আমার আছে। তোমাদের নেতাকে তোমরা বোলো, আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু যাবার আগে যদি শুনে যেতে পারি যে আমার পুত্রহন্তার পতন হয়েছে তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব।'

এদিকে শত্রুপক্ষ থেকে দূত এসে ঈনিয়াসের কাছে যুদ্ধের সাময়িক বিরতির প্রস্তাব জ্ঞাপন করল।

ঈনিয়াস তাদের বলল, 'টারনাসের যদি এই অভিযোগ হয়ে থাকে যে তার ভাবী বধূকে আমি জোর করে ছিনিয়ে নিচ্ছি, বেশ তো, সে স্বয়ং এসে দ্বৈত যুদ্ধে আমার সঙ্গে তার ফয়সালা করুক। আমাদের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জন্য উভয় পক্ষের হাজার হাজার নিরীহ লোক প্রাণ দেবে কেন? তোমরা তাকে বল, তার যবে ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা তার সঙ্গে একক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আমি প্রস্তুত।'

টারনাসও এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হল। বন্ধু ল্যাটিনাস এবং রানী আমাতা তাকে এ সংকল্প ত্যাগ করবার জন্য অনেক অনুরোধ করল। কিন্তু সব বৃথা। টারনাসের মুখে এক কথা: 'আমাকে আর অনুরোধ কোরো না। পাশার দান পড়ে গেছে। আমি কথা দিয়েছি। তার আর নড়চড় হবে না।'

তখুনি সে একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিল ট্রয়ের শিবিরে। সে জানিয়ে দিতে গেল, আগামী কাল হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে মীমাংসা হবে, সুন্দরী ল্যাভিনিয়ার পাণি ও ল্যাটিয়ামের রাজসিংহাসন কার প্রাপ্য।

চরম পরীক্ষার দিন।

উষার প্রথম আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল টারনাস। শুরু হল তার রণসাজ। উত্তেজনায় অধীর তার দেহ-মন। কঠিন মুঠিতে একটা জীর্ণ বর্শাকে চেপে ধরেই সে বলে উঠল, 'এস আমার প্রিয় বর্শা, জীবনে কখনো তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও নি। আজ তুমি আকণ্ঠ পান করবে ভিনাসের প্রিয়পুত্র এক ভীরুর বক্ষরক্ত।'

ওদিকে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধীর স্থির ভাবে ঈনিয়াস তার যুদ্ধ-সজ্জা সম্পূর্ণ করল।

রণক্ষেত্রে দুই দিকে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াল উভয় পক্ষ।

রাজা ল্যাটিনাস এল চার-ঘোড়ার রথে চড়ে। তার পিছনে দুটি সাদা ঘোড়ার রথে এল টারনাস।

ঈনিয়াস আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। দুই হাত উর্ধ্বে তুলে সে প্রার্থনা জানাল জুপিটার, জুনো, মার্স এবং জল স্থল অন্তরীক্ষের সকল দেবতাদের উদ্দেশে: 'হে অমর দেবতাবৃন্দ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আপনারা আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন: আজ যদি টারনাস জয়লাভ করেন তাহলে ট্রয়বাসীরা ফিরে যাবে রাজা ইভাণ্ডারের রাজ্যে; এ রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা আর কখনো অস্ত্র ধারণ করবে না। কিন্তু আমি আশা করি, আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের করুণা আছে আমার অস্ত্রের উপর। যদি তাই হয়, তাহলেও আমি দাবি করব না ল্যাটিয়ামের সিংহাসন। আমি শুধু চাই, আমার লোকজনেরা এখানকার আদি অধিবাসীদের বন্ধু হিসাবে পরম শান্তিতে এদেশে বসবাস করবার অধিকার লাভ করুক।'

ঈনিয়াসের এই প্রতিজ্ঞাকে সানন্দে সমর্থন করল ল্যাটিনাস। দ্বৈত যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল।

॥ দেবতার হস্তক্ষেপ ॥

বহুদূরে একটি পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ঈর্ষাকণ্টকিত দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখছিলেন রানী জুনো। টারনাসের বিষণ্ণ মুখচ্ছবি দেখে তাঁর অন্তর করুণায় ভরে উঠল। তখনই তিনি ছুটে গেলেন টারনাসের বোন জুটুর্নার কাছে।

জুপিটারের বিশেষ অনুগ্রহে জুটুর্না মানবী হয়েও দেবীর মর্যাদা লাভ করেছে—ল্যাটিয়ামের সমস্ত নদী ও ঝর্নার সে অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

জুটুর্নাকে ডেকে জুনো বললেন, 'জাগো জুটুর্না। শীঘ্র যাও, এই চরম মুহূর্তে তোমার ভাইকে সাহায্য কর। আমি আর কিছু করতে পারব না।'

জুনোর কথা মত জুটুর্না অদৃশ্যভাবে হাজির হল রণক্ষেত্রে রুটুলিয়ানদের মাঝে। টারনাসের বন্ধু ক্যামার্সের রূপ ধরে সে রুটুলিয়ানদের উত্তেজিত করতে লাগল, 'রুটুলিয়ানগণ, তোমাদের সকলের জন্য একটি লোক তার জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছে, এ দেখেও তোমাদের কি লজ্জা হচ্ছে না? সংখ্যায় আমরা শত্রুর চেয়ে দ্বিগুণ, তবু কি আমরা অলস হয়ে বসে থাকব? চোখের সামনে আমাদের প্রিয় নেতা নিহত হবেন, আর আমরা গলায় পরব দাসত্বের শৃঙ্খল?'

ছদ্মবেশী ক্যামার্সের কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠল রুটুলিয়ানরা। আর ঠিক সেই সময় আকাশপথে ঘটল একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা। এক-দল বুনো হাঁস উড়ে যাচ্ছিল আকাশ-পথে। হঠাৎ একটা ঈগল পাখি এসে তাদের তাড়া করে একটি হাঁসকে ধরে নিয়ে গেল। মুহূর্তে মধ্যে সবগুলো হাঁস একযোগে আক্রমণ করল ঈগলকে। বাধ্য হয়ে ঈগল হাঁসটাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা টোলাম্নিয়াস বলে উঠল, 'তোমরা শোন, ওই দৃশ্যের ব্যাখ্যা আমি করছি। ঐ ঈগলটি হল ঈনিয়াস, আর যে হাঁসের দল তাকে হাটিয়ে দিল তারা হলাম আমরা—ইটালির অধিবাসীরা। এস, আমরাও এই আক্রমণকারীকে তাড়িয়ে দিই সাগরপারে।'

বলতে বলতেই নিজের হাতের বর্শা তুলে সে ছুঁড়ে দিল প্রচণ্ড বেগে। সেই বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হল আর্কেডিয়ার এক দীর্ঘদেহ সৈনিক। সক্রোধে গর্জে উঠল তার আর আট ভাই। দুই পক্ষেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

গোলযোগ থামাবার জন্য শূন্যশির নিরস্ত্র ঈনিয়াস ছুটে গেল নিজের সৈন্যের সামনে। চীৎকার করে বলতে লাগল, 'তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে? অস্ত্র সংবরণ কর সকলে। টারনাসের রক্তে এ যুদ্ধ আমাকে শেষ করতে দাও। তার জীবন তো এখন আমার হাতে।'

কথা আর তার শেষ হল না। কোন্ অদৃশ্য হাতের একটা তীর এসে বিঁধল তার উরুতে। ভয়ানক আহত অবস্থায় সৈন্যরা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

সুবর্ণ সুযোগ এল টারনাসের হাতে। ঈনিয়াসের অপসারণের ফলে ভগ্নোদ্যম হয়ে গেল তার সৈন্যদল। আর রথারূঢ় টারনাসের প্রবল ত

ট্রয়বাসীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। তার রথবাহী অশ্বের খুর লাল হয়ে গেল শত্রুর রক্তে।

এদিকে ঈনিয়াস যখন রণক্ষেত্রের বাইরে অনুচরবেষ্টিত হয়ে ক্ষতের যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন দেবী ভিনাস সকলের অলক্ষ্যে এসে ওষধির পাতা রেখে গেলেন ক্ষত ধুইয়ে দেবার জলের পাত্রে। আর সেই জল ক্ষতে লাগানো-মাত্র ঈনিয়াস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। আর কালবিলম্ব না করে সে নতুন করে চর্ম-বর্ম পরে ইউলাসের মুখচুম্বন করে বর্শা হাতে নিয়ে ছুটল রণক্ষেত্রের দিকে।

প্রমাদ গুণল জুটুর্না। এবার কেমন করে রক্ষা করবে তার ভাইয়ের প্রাণ? বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল টারনাসের রথের কাছে। রথের সারথি মেটিস্কাসকে ধুলোয় ফেলে দিয়ে স্বয়ং তার মত চেহারা ধারণ করে রথে চেপে বসল। ঝড়ের বেগে ছুটল রথ রণক্ষেত্রের বাইরে।

ঈনিয়াস ছুটতে লাগল তার পিছনে পিছনে। কিন্তু দেবচালিত রথের সংগে সে ছুটে পারবে কেন? পরিশ্রান্ত হয়ে টারনাসের অনুসরণে ক্ষান্তি দিয়ে সে নব উদ্যমে আক্রমণ চালাল নিকটবর্তী শত্রুসৈন্যের উপর।

যুদ্ধ চালাতে চালাতে হঠাৎ তার নজর পড়ল, নগর-প্রাচীর প্রায় অরক্ষিত পড়ে আছে। সামান্য কিছু সৈন্যমাত্র পাহারা দিচ্ছে প্রাচীর-শীর্ষে দাঁড়িয়ে। সে আরো দেখল, নগরের প্রবেশ-পথ খোলা পড়ে আছে।

এ সুযোগ কোন মতেই হারানো চলবে না। তার পাশে দাঁড়িয়ে যে-সব সৈন্য যুদ্ধ করছিল তাদের ডেকে বলল, 'এই মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করতে হবে অরক্ষিত নগর। ধূলিসাৎ করতে হবে সব।'

ইটালিবাসীরা যখন নিজ-নিজ অস্ত্রচালনায় ব্যস্ত, মহাবীর টারনাস যখন দৈবী মায়াবলে বহুদূরে অপসৃত—সেই সুযোগে আক্রমণকারীরা এগিয়ে চলল অরক্ষিত নগরের দিকে।

তাদের অগ্রসর হতে দেখে ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়ল নগরের অবশিষ্ট অধিবাসীরা। কেউ ছুটে গেল প্রাচীরের উপরে শত্রুর আক্রমণকে বাধা দিতে। একদল চেঁচিয়ে বলল, 'নগরের দ্বার খুলে দাও!' আরেক দল রেগে বলল, 'রাজা ল্যাটিনাসই এই দুর্বিপাকের জন্য দায়ী। তাঁকেই ধরিয়ে দাও ঈনিয়াসের হাতে।'

সবাই যখন এমনি গোলযোগে ব্যতিব্যস্ত, তখন রানী আমাতা টারনাসের মৃত্যু হয়েছে আশঙ্কা করে ভগ্নহৃদয়ে শয়নকক্ষের কড়ি-কাঠের সংগে ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করল।

সকলে হাহাকার করে উঠল রানীর দশা দেখে।

সেই হাহাকার বুঝি পেঁছিল দ্রুত-ধাবমান টারনাসের কানে। রথরশ্মি চেপে ধরে সে রথ থামিয়ে দিল।

ছদ্মবেশী মেটিস্কাস প্রশ্ন করল, ‘রথ থামালেন কেন ?’

টারনাস ম্লান হেসে জবাব দিল, ‘বোন, প্রথম থেকেই তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা তোমার। আমি জানি, নিয়তি আমার বিরুদ্ধে। তার নির্দেশ আমাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। আমারই চোখের সামনে একে-একে নিহত হয়েছে আমার বীর সৈনিকরা। আর এখন নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য কি শত্রুর হাতে ছেড়ে দেব রাজপ্রাসাদ ? এত বড় কাপুরুষ হব আমি ?’

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই একজন আহত রুটুলিয়ান অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে হাজির হল। রুদ্ধনিশ্বাসে সে বলল, ‘টারনাস, এখানে আপনি কী করছেন ? আপনি আমাদের শেষ আশা, শেষ আশ্রয়। রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত। আমাতা আত্মহত্যা করেছেন। আপনার বন্ধুরা এখনো শত্রুকে বাধা দিচ্ছে অসীম সাহসে। আপনি শীঘ্র চলুন। সেখানে আপনার উপস্থিতি এখন বড় প্রয়োজন।’

অশ্বারোহীর কথা শেষ হতে-না-হতেই দূরে দেখা গেল আলোর রেখা। সভয়ে চেয়ে দেখল টারনাস, আগুন জ্বলে উঠেছে রাজপ্রাসাদে। আগুন লেগেছে নগর-প্রাচীরের উপর নির্মিত সুউচ্চ দারু-মিনারে।

সে দৃশ্য দেখে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেল টারনাস। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। তারপরেই সে চীৎকার করে বলে উঠল, ‘যথেষ্ট হয়েছে। আর বিলম্ব নয়। নিয়তি আমাকে ডাকছে। সে ডাক আমাকে শুনতে হবেই। আমাদের ঘরে যারা আগুন জ্বালিয়েছে তাদের আঘাত আমি করবই। তারপর যদি মৃত্যু আসে তো আসুক।’

একলাফে রথ থেকে নেমে টারনাস প্রাণপণে ছুটতে লাগল রণক্ষেত্রের গভীরে আর বলতে লাগল, ‘আমাকে পথ ছেড়ে দাও। অস্ত্র সংবরণ কর তোমরা। এ যুদ্ধ তোমাদের নয়, আমার—আমার একার।’

দুইপক্ষের সৈন্যরা আবার সরে দাঁড়াল দুই মহাবীরের সম্মুখে যুদ্ধের জন্য অনেকখানি জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল।

—‘এইবার তোমাকে পেয়েছি !’ বলতে বলতে ঈনিয়াস এসে দাঁড়াল রণস্থলে।

প্রথমে শুরু হল বর্শার যুদ্ধ। তারপর অসিযুদ্ধ। ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজতে লাগল অসির ঝঞ্ঝনা। আঘাতের পর আঘাত। দুই বীরের মাথার উপর যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎচমক।

এক সময় টারনাস দেহের সমস্ত শক্তি এক করে ভীমবেগে আঘাত করল ঈনিয়াসের শির লক্ষ্য করে। ভুলক্রমে তখন তার হাতে ছিল মেটিস্কাসের তরবারি। আঘাতের তীব্র বেগে ঠুনকো কাচের মত দুই ভাগে ভেঙে গেল তরবারি।

এখন উপায় ? মুখ ফিরিয়ে ছুটে পালাতে লাগল টারনাস। ঈনিয়াস উদ্যত তরবারি হাতে তাকে অনুসরণ করল।

টারনাস ছুটছে আর তার সৈনিকদের বলছে তার নিজের তরবারিখানা এনে দিতে। কিন্তু ঈনিয়াসের কুটিল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে কেউ সাহস করল না অস্ত্র এনে দিতে।

ছুটছে টারনাস। আঘাতের জন্য দুর্বল-দেহ ঈনিয়াস কিছুতেই তাকে হাতের কাছে পাচ্ছে না। এমনি করেই দুজনে ছুটতে লাগল ইতস্তত।

দ্বৈত যুদ্ধের একেবারে শুরুতেই ঈনিয়াস নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা বিঁধেছিল একটা অলিভ গাছে। গাছটা ছিল ফনাসের প্রিয়।

টারনাসকে কোনমতেই ধরতে না পেরে ঈনিয়াস ভাবল, তরবারি দিয়ে হবে না। ওই বর্শা দিয়েই ওকে ঘায়েল করতে হবে।

ঈনিয়াস অলিভ গাছে বিদ্ধ বর্শাটাকে ধরে টান দিল।

টারনাস ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে চীৎকার করে উঠল, 'ফনাস, তুমি আমার পিতৃপুরুষের দেবতা, ও অস্ত্র তুমি আটকে রাখ! তোমার ভক্তকে বাঁচাও।'

টারনাসের প্রার্থনা শুনলেন ফনাস। ঈনিয়াস অনেক টানাটানি করেও বর্শা-ফলক গাছ থেকে খুলতে পারল না।

সেই সুযোগে মেটিস্কাসবেশী জুটুর্না তার হাতে তুলে দিল তার নিজের তরবারি।

তা দেখে ভিনাসও বর্শাটাকে এক টানে অলিভ গাছ থেকে খুলে নিয়ে প্রিয় পুত্র ঈনিয়াসের হাতে তুলে দিলেন।

দুই বীর সশস্ত্র হয়ে আবার মুখোমুখি দাঁড়াল আঘাত করবার অপেক্ষায়।

॥ টারনাসের পতন ॥

স্বর্গ-সিংহাসনে বসে দেবরাজ জুপিটার সবই লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু এবারে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। রানী জুনোর দিকে চেয়ে তিনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'জুনো, আমার উদ্দেশ্যকে তুমি কতদিন আর এমন করে ব্যাহত করবে? তুমি ভালই জান যে শেষরক্ষা তুমি করতে পারবে না। তাই বলছি, এবার তুমি থাম। আর তুমি অগ্রসর হয়ো না।'

জুনো মাথা নীচু করে বললেন, 'তবে তাই হোক। এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা আমারও আর ভাল লাগছে না। এখানেই এ খেলার অবসান হোক। তবু

আমার একটি মিনতি তোমাকে রাখতে হবে: এই দুই যুধ্যমান জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ হবে তখন যেন ইটালির ভাষা, ইটালির পোশাক আর ইটালির আচার-আচরণই অক্ষুন্ন থাকে। ঐক্যবদ্ধ নতুন জাতি যেন লাটিন নামেই জগতে প্রচারিত হয়। ট্রয়ের ধ্বংস হয়েছে, তার নামও বিলুপ্ত হোক।'

জুপিটার সহাস্যে বললেন, 'তথাস্তু। তাতে যদি তোমার ক্রোধ প্রশমিত হয় তবে তাই হোক। লাটিন জাতি হিসাবেই এদের পরিচয় হবে, এরা তোমারই অনুগত হবে, চিরকাল তোমাকে পূজা করবে।'

মানুষকে কেন্দ্র করে স্বর্গবাসী দেবতার বিসম্বাদ মিটে গেল। মর্তবাসী ঈনিয়াস ও টারনাসের সংগ্রামেরও যাতে অবসান হয় জুপিটার এবার তারই ব্যবস্থায় মন দিলেন। তাঁর সিংহাসনের দুই পাশে যে দুটি বীভৎস প্রহরী দিনরাত অপেক্ষা করে থাকে তাদের একজনকে তিনি তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন জুটুর্নাকে সতর্ক করে দিতে—সে যেন অবিলম্বে তার ভাইয়ের পক্ষ ত্যাগ করে।

তখুনি সংবাদ পেঁছে গেল জুটুর্নার কাছে। তীব্র হতাশায় নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে কেঁদে উঠল, 'টারনাস, আর কিছুই আমি করতে পারব না। ওঃ, আমিও যদি তোমার সঙ্গে মরতে পারতাম! কিন্তু জুপিটারের বরে আমি যে অমর—আমি যে অনন্ত দুঃখের ভাগী!'

নীল বস্ত্রে মুখ ঢেকে জুটুর্না সেখান থেকে ধীর পায়ে চলে গেল সাগর-তীরে। সেখানে বসে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল।

ভীষণদর্শন বর্শা আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে এল ঈনিয়াস। বলল, 'এবার কোথায় পালাবে ভীরু?'

টারনাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বলল, 'তোমাকে আমি ভয় করি না—না তোমার কথাকে, না তোমার অস্ত্রকে। আমার একমাত্র ভয়, নিয়তি আমার বিরুদ্ধে।'

বলতে বলতে মাটি থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর তুলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সে ছুঁড়ে মারল ঈনিয়াসকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সে পাথর ঈনিয়াস পর্যন্ত পেঁছল না। তাই দেখে তীব্র হতাশায় টারনাসের মাথা ঘুরতে লাগল। তার চোখের সামনে অর্থহীন ভাবে ভাসতে লাগল বন, পাহাড় নগর, লোকজন—সব।

এবার ঈনিয়াসের পালা। প্রচণ্ড বেগে সে ছুঁড়ল বর্শা। সে বর্শা আমূল বিদ্ধ হল টারনাসের উরুতে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে টারনাস মাটিতে পড়ে গেল। রক্তে ভেসে যেতে লাগল বালুকা-বেলা। আর্তনাদ করে উঠল রুটুলিয়ান সৈন্যদল।

দুই হাত তুলে টারনাস অনুনয় করে বলল, 'তোমারই জয় হয়েছে।

লাভিনিয়া তোমারই। শুধু দয়া কর আমার বৃদ্ধ পিতাকে। তাঁকে ফিরিয়ে দিও তাঁর পুত্রকে। আর একান্তই যদি আমাকে হত্যা কর, আমার মৃতদেহটা সৎকারের জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দিও।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উদ্যত অসি হাতে ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঈনিয়াস। কী করবে সে? আঘাত করবে, না ক্ষমা করবে?

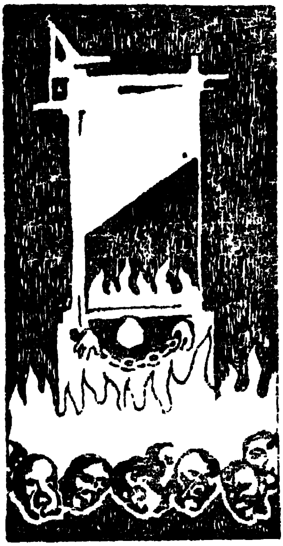
ভাবতে ভাবতে ক্ষমারই বুঝি জয় হবে। গভীর অনুভূতিতে ভরে উঠতে লাগল ঈনিয়াসের হৃদয়।

চকিতে ঈনিয়াসের দৃষ্টি পড়ল টারনাসের বেল্টে। এ যে তরুণ বীর প্যালাসের বেল্ট! প্যালাসকে হত্যা করে তার বেল্ট সে পরেছে নিজের দেহে।

ক্রোধে বিষাক্ত হয়ে উঠল ঈনিয়াসের মন। প্যালাসের হত্যাকারীকে ক্ষমা? অসম্ভব!

তীব্র কণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠল, 'ওরে হতভাগ্য, নিজের বুকে চিরদুঃখের ঐ চিহ্ন ঝুলিয়ে তুই চাস আমার ক্ষমা? প্যালাস যে চীৎকার করে চাইছে তোর মৃত্যু, চাইছে তোর বুকের রক্ত!'

মূর্তিমান প্রতিহিংসার মত ঈনিয়াসের হাতে ঝলসে উঠল তরবারি। বিদ্যুৎচমকের মত নেমে এল নীচে। টারনাসের বিরাট দেহ মৃত্যুর স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত তার আত্মা যাত্রা করল রলোকের পথে।



রক্তাক্ত তিরানব্বই

ভিক্টর হুগো

পটভূমি: ফ্রান্স, ১৭৯৩

১৪ই জুলাই, ১৭৮৯…ফরাসী রাজ-কারাগার বাস্তিল-এর পতন…জন-নির্যাতনের অবসান।

৪ঠা অগস্ট, ১৭৯০…সামন্ততন্ত্রের অবসান।

জুন, ১৭৯১…ভারেনিস…রাজতন্ত্রের অবসান।

সেপ্টেম্বর, ১৭৯২…ফরাসী প্রজাতন্ত্রের জন্ম।

১৭৯৩…গিলোটিনের খড়্গতলে ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ড হলো…ফরাসী বিপ্লবের প্রাণ-মন্ত্র সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীতে সারা ইওরোপের রাজতন্ত্রের বুক উঠলো কেঁপে…ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটের নেতৃত্বে ইওরোপ জুড়ে গড়ে উঠলো বিপ্লবীবিরোধী ব্লক…ইওরোপের লড়াই শুরু হল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে…ফ্রান্সের লড়াই প্যারি নগরীর বিরুদ্ধে…বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রাণ কেন্দ্র প্যারি নগরী।

স্বপ্ন-ভাঙা গণ-প্রাণ-স্রোত কিন্তু রুদ্ধ হলো না, হতে পারে না। সারা ইওরোপের বিরুদ্ধে জয়ী হলো ফ্রান্স…ফ্রান্সের সংগ্রামে জয়ী হলো প্যারি…জয়ী হলো বিপ্লবী গণ-পরিষদ…কনভেনশন।

তাই ১৭৯৩ সাল মানুষের ইতিহাসের একটি চরম ও পরম ক্ষণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৎসর। ইওরোপ ঝাঁপিয়ে পড়লো ফ্রান্সের বুকে…ফ্রান্স আক্রমণ করলো প্যারি। জগৎইতিহাসের করুণতম ঘটনা। ঘটনার বৈচিত্র্যে ও বীরত্বে, ত্যাগ ও ভাব-স্বপ্নের গভীরতায় ১৭৯৩-র ইতিহাস যে কোন মহাকাব্যের উপযোগী।

ঝড় উঠলো। কাঁপলো ঘর। ভাঙলো দেয়াল। বিক্ষুব্ধ হলো দিক-

দিগন্ত। সাগর-ঈগলের মত পাখা মেলে নতুন দ্বীপের প্রত্যাশায় বেপরোয়া পথে পাড়ি জমালো দুঃসাহসী বীর ম্যারাৎ…রোবেস্‌পিয়র…দাঁতন। গিলোটিনের কালো ছায়া পড়লো প্যারির পথে প্রান্তরে। রক্তস্রোতে ধুয়ে গেল প্যারির ক্লেদাক্ত রাজপথ। সেই পথ একদা শেষ হলো কি নতুন দ্বীপে? এলো কি নতুন মানুষ?

এমনি নানা প্রশ্ন ও জবাবের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত ১৭৯৩-র সারা অঙ্গ। ১৭৯৩ আজও তাই বেঁচে রয়েছে সারা বিশ্বের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন-চিহ্ন হয়ে…বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও আতংকের জীবন্ত প্রতীক ১৭৯৩।…

॥ এক ॥

১৭৯৩। মে মাসের শেষ। ফ্রান্সের অন্তর্গত লা সোদ্রার গহন অরণ্য।

শিকারী বাঘের মতো সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে একদল বিপ্লবী সৈন্য। সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ। একটি স্বেচ্ছাসেবিকাও আছে দলে।

ঘন জঙ্গল। লতায় পাতায় ঢাকা। দশ পা দূরের মানুষ চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝেই ছড়িয়ে আছে শত্রুর আস্তানা গাড়ার চিহ্ন: পোড়া মাটি, সাদা ঘাস, তাঁবুর বাঁশ, গাছের ডালে রক্তের দাগ। মানুষের চিহ্ন আছে। মানুষ নেই। কোথায় তারা গেছে? হয়তো বহু দূরে। হয় তো কাছেই কোথাও আছে ওৎ পেতে। তাদেরই সন্ধানে এই অভিযান। তাই এত সতর্ক পদক্ষেপ।

সহসা চমকে উঠল সৈন্যদল। কার যেন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। সামনের গাছপালাগুলো যেন নড়ে উঠলো।

বেজে উঠলো সংকেত-ধ্বনি। সকলে একযোগে ঘিরে ফেললো জায়গাটা। সঙিন উঁচিয়ে এগিয়ে এলো চারদিক থেকে। বন্দুকের ঘোড়ার উপর ত্রিশটা আঙুল তৈরী।

স্বেচ্ছাসেবিকা এগিয়ে গেলো ঝোপের পাশে। ঝোপটা নড়ে উঠলো। সার্জেন্টের ঠোঁটের কোণে উদ্যত আদেশ: ফায়ার…

স্বেচ্ছাসেবিকা চেঁচিয়ে উঠলো, থামো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, কমরেড, গুলি করো না। তারপর ঢুকে গেলো ঝোপের ভিতরে।

ঝরা পাতার উপর বসে আছে একটি স্ত্রীলোক। একহারা গড়ণ। অল্প বয়স। জামা-কাপড় ছেঁড়া। মুখখানি বিষণ্ণ, ম্লান। কোলে একটি ছোট মেয়ে। দুই হাঁটুর উপর ঘুমিয়ে আছে দুটি ছেলে।

স্বেচ্ছাসেবিকা বললো, এখানে কি করছ ? তুমি কি পাগল যে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ ? আর একটু হলে যে গুলির ঘায়ে ছাতু হয়ে যেতে ?

সার্জেণ্ট রাদুব এগিয়ে এসে বললো, তোমার নাম কি ?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এলো, মিসেল ফ্রেসার।

—তোমার কে কে আছে ?

—কেউ নেই।

—স্বামী ?

—তাকে মেরে ফেলেছে ?

—কে মেরেছে ? নীলকোর্তা, না সাদাকোর্তা ?

—অত জানি না। একটা বুলেট এসে লাগলো। স্বামী আমার ছটফট করতে করতে মরে গেলো। এইমাত্র জানি।

—তারপর ?

—তারপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি পালিয়েছি।

—কোথায় চলেছ ?

—যে দিকে দুচোখ যায়।

—কোথায় ঘুমাও তোমরা রাতে ?

—মাটিতে।

—কি খাও ?

—কিছু না। না খাই। ঘাস, পাতা, ফল, মূল—যা পাই পথে তাই খাই।

—কিন্তু এমন ভাবে পালাচ্ছ কেন ?

—না পালিয়ে কি করব ? এরা সবাই যুদ্ধ করছে। চারদিকে গোলাগুলি ছুটছে। কি যে এরা চায় তাও বুঝি না। শুধু খুন আর খুন।

সার্জেণ্ট রাদুব বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাটিতে একটা আঘাত করে আপন মনেই বলে উঠল, হায় রে যুদ্ধ! হায় রে মানুষের পাশবিক ব্যবহার! একটি বিধবা স্ত্রীলোক। তিনটি অসহায় শিশু! এদের সামনে শুধু সীমাহীন পলায়ন, সকলের উপেক্ষা, আর একান্ত নির্জনতা। দিগন্ত কালো করে উঠেছে যুদ্ধের কালবৈশাখী। ক্ষুধায় অন্ন নেই। পিপাসার জল নেই। আকাশ ছাড়া কোন আশ্রয় নেই।

আরো কাছে গিয়ে সার্জেণ্ট কোলের মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলো অপলক চোখে। মেয়েটিও চেয়ে রইলো নীল চোখ মেলে। ঠোঁটে ফুটলো মিষ্টি হাসি। সার্জেণ্ট চোখ ফেরালো। তার চোখের কোল বেয়ে মুক্তার মতো এক ফোঁটা জল এসে মোটা গোঁফের সাথে ঝুলছে।

সজল কণ্ঠে বললো রাদুব, কমরেড, আমাদের এই সৈন্যদলই আজ হতে

হোক এই পিতৃহীন তিন শিশুর আশ্রয়দাতা পিতা। তোমরা সম্মত? এই তিন শিশুকে আমরা পোষ্য নিলাম।

সৈন্যরা চীৎকার করে উঠলো, প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।

সার্জেন্ট রাদুব মাকে বললো, আমার সঙ্গে এসো, হে নাগরিকা।

॥ দুই ॥

১৭৯৩। ১লা জুন। সময়—সূর্যাস্ত। স্থান—ইংলিশ চ্যানেলের বুকে একটি ছোট দ্বীপ—জার্সি। চারদিক কুয়াসায় ঢাকা।

সেই কুয়াসার আবরণে একখানি জাহাজ জলে ভাসলো। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, জাহাজখানির নাম 'ক্লেমোর'। ইংরেজ নৌ-বহরের অধীন হলেও জাহাজের কর্মচারীরা সকলেই ফরাসী।

রহস্যময় 'ক্লেমোর'। বাইরে দেখতে একখানি সাধারণ বাণিজ্য-জাহাজ; কিন্তু আসলে মারণাস্ত্রে সজ্জিত রণতরী। যাত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ক্যাপ্টেন—কাউন্ট দ্য বোয়াবার্তেলো। সেকেন্ড অফিসার—নাইট্‌লা ভি ভস। প্রধান নাবিক—ফিলিপ গাকোয়াল। একদল ফরাসী অফিসার ও নাবিক; রণকুশল ও রাজভক্ত। অর্ধ-রেজিমেন্ট নৌ-সৈন্য।

জাহাজ ছাড়বার ঠিক আগেই এসে উঠেছে একজন অপরিচিত যাত্রী। সঙ্গে ছিলো জার্সি দ্বীপের গবর্ণর লর্ড বাল্‌কারাস আর ফরাসী রাজবংশের যুবরাজ তুর্ দ্য অভেরইএ; আর সসম্মানে তার কেবিনের তত্ত্বাবধান করে গেলো যুবরাজের প্রধান গোয়েন্দা মঁসিয় গেলাম্বার স্বয়ং।

লোকটিকে দেখলেই মনে হয় দুঃসাহসী। বুড়ো মানুষ। মাথাভর্তি পাকা চুল। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। কঠিন মুখশ্রী। চোখে বিদ্যুৎ। বীর্যে যুবক। কর্তৃত্বে সে অশীতিপর বৃদ্ধ।

তার পরনে কৃষকের পোষাক। মাথায় সাধারণ একটা টুপি। কনুই ও হাঁটুর নীচে জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে—এতই পুরাণো আর রঙচটা তার পোষাক। অথচ জাহাজ ছাড়বার সময় মঁসিয় দ্য গেলাম্বার এই 'কৃষক' লোকটাকে স্যালুট করল ভক্তিভরে। লর্ড বাল্‌কারাস বলল, তোমার সৌভাগ্য কামনা করি সেনাপতি। আর যুবরাজ তুর্ দ্য অভেরইএ বললো, বিদায় ভাই, বিদায়। আশ্চর্য!

দেখতে দেখতে নেমে এলো রাতের আঁধার। 'ক্লেমোর' অদৃশ্য হয়ে গেল সাগর-বুকে।

এক ঘন্টা পরে।

মঁসিয় দ্য গেলাম্বার ডিউক-অব্-ইয়র্কের হেড-কোয়ার্টারে কাউণ্ট দ্য আতোকে সাদাম্পটন এক্সপ্রেস-যোগে একখানি চিঠি পাঠালো :

"মঁসিয়, এই মাত্র জাহাজ ছেড়ে গেল। জয় অনিবার্য। আট দিনের মধ্যে গ্রেনভিল হতে সেণ্ট মালো অবধি সমগ্র তীরভূমিতে আগুন জ্বলে উঠবে।"

এই ঘটনার চারদিন আগে—

বিপ্লবীদের প্রতিনিধি প্রিউর গ্রেনভিলে বসে কোন গুপ্তচরের কাছ থেকে একটি নোট পেয়েছিল। নোটটি এই :

'নাগরিক প্রতিনিধি', ১ জুন জোয়ারের সময় রণতরী 'ক্লেমোর' ছদ্মবেশের আবরণে যাত্রা করবে। ২ তারিখ সকালে 'ক্লেমোর' হতে একটি লোক ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করবে। লোকটির বিবরণ : লম্বা, বুড়ো, পাকা চুল, কৃষকের পোষাক, ধনিকের চেহারা। ক্রুজারগুলিকে সতর্ক করো। রণতরী আটক করো। লোকটিকে গিলোটিনে ফেল।'

* * *

জাহাজ চলেছে। কুয়াসাচ্ছন্ন আঁধারে দিগন্ত ঢাকা।

সেণ্ট উয়েন ঘণ্টা-ঘরে ঢং ঢং করে দশটা বাজলো।

'কৃষক' লোকটি ডেক ছেড়ে কেবিনের দিকে পা বাড়ালো। দরজার সামনে দেখা হলো ক্যাপ্টেন ও সেকেণ্ড অফিসারের সাথে। তাদের দিক তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে লোকটি বললো, সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা যে কতখানি দরকার তা আপনারা বোঝেন। যতক্ষণ না বিস্ফোরণ হচ্ছে, ততক্ষণ চুপ। এখানে আপনারা দুজন ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি আমার নাম জানে না।

কবর পর্যন্ত এ-নাম আমি সাথে নিয়ে যাব।—বললো বোয়াবার্তেলো।

আর আমি?—বললো ভিভিল, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও এ-নাম আমি বলব না।

লোকটি কেবিনে ঢুকলো।

ক্রমে রাত বাড়ে। ডেকের উপর পায়চারি করে বেড়ায় ক্যাপ্টেন ও সেকেণ্ড অফিসার। নানা আলোচনা করে।

হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকারে তাদের চমক ভাঙলো। সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো ভয়াবহ কলরব। জাহাজের গহ্বর থেকেই চীৎকার ও গোলমালের শব্দ আসছে।

শব্দ লক্ষ্য করে তারা ছুটলো কামান-সাজানো নীচের ডেকে। কিন্তু নামতে পারলো না। গোলন্দাজরা সব বেপরোয়া হয়ে উপরে উঠে আসছে।

সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। আকস্মিক। প্রাণঘাতী। একটি কুড়ি পাউণ্ডের

গোলাবর্ষী কামান শিকল ছিঁড়ে স্থানচ্যুত হয়েছে। সাগরবুকে এর চেয়ে ভীষণতর দুর্ঘটনা আর কিছু বুঝি হতে পারে না। কামানের শিকল খুলে গেলে হঠাৎ সেটা অতিপ্রাকৃত পশু হয়ে ওঠে। যন্ত্র হয় তখন যন্ত্র-দানব। তীব্র-বেগে ছুটে চলে জাহাজের এক কোণ হতে অন্য কোণে; চক্কর দেয় ঘূর্ণি-হাওয়ার বেগে; লাফায়; ভাঙে; হত্যা করে; ধ্বংস করে। চিরদিনের শৃংখলিত ক্রীতদাস যেন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

দোষটি প্রধান গোলন্দাজের। কামানটা আটকে রাখবার শিকলের স্ক্রু-নাটটা অবহেলাবশত শক্ত করে আঁটা হয় নি। তারই ফলে এই নারকীয় দুর্ঘটনা।

কিন্তু সে তো পরের কথা। দোষ-অপরাধের বিচার হবে পরে। এখন উপায় কি? এ ধ্বংস-দূতের গতিরোধ হবে কেমন করে? একে একে পাঁচজন নাবিক এরই মধ্যে যন্ত্র-দানবের করাল নিষ্পেষণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহে মরণকে বরণ করেছে। কয়েকটি ছোট কামান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। জাহাজের খোলও কয়েক জায়গায় জখম হয়েছে। তবু ভাগ্য ভালো যে জল-রেখার উপরে ফাটলগুলি হয়েছে। নইলে তো এতক্ষণ হুহু করে জল ঢুকতো জাহাজে। আর তাই বা ঢুকতে কতক্ষণ? ইস্পাতী ঘোড়ার এই অন্ধ আস্ফালন আরও কিছুকাল চললে 'ক্লেমোর'-এর সলিল-সমাধির আর কত দেরী?

সারা জাহাজ আতংকে কাঁপছে। ক্যাপ্টেন বোয়াবার্তেলো ও লেফটেন্যান্ট ভিভিল নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়।

কে-একজন দুই হাতে তাদের সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। এ সেই রহস্যময় যাত্রী—'কৃষক' মানুষ।

সিঁড়ির ঠিক নীচেই সে চুপ করে দাঁড়ালো।

ইস্পাতী পশুর নর্তন, কুর্দন ও গর্জন চলেছে অবিরাম। সারা ডেকময় সে ছুটে বেড়াচ্ছে। মাথার উপরে লণ্ঠনটা কাঁপছে। সেই কাঁপা আলোয় আর আঁধারে ডেকের দৃশ্য হয়ে উঠেছে প্রেতভূমির মতো—বীভৎস, ভয়ংকর।

ক্যাপ্টেন আদেশ দিলো—উপরে যা কিছু ভারী জিনিস আছে, কামানের চাকার নীচে ফেলে দাও, তাতে যদি এর গতি রোধ হয়।

মাদুর, পালের চট, গুটানো দড়ি আর আজে-বাজে জিনিসের স্তূপ জমে উঠলো। গাঁটের পর গাঁট জাল-নোট ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু তাতে কি হবে? সেগুলোকে ঠিক জায়গায় দেয় কে?

ক্রমে জাহাজের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। বড় মাস্তুলটি একেবারেই অকেজো হবার জোগাড়। ত্রিশটা কামানের দশটা নষ্ট হয়ে গেছে। জাহাজের খোলে চিড় ধরে একটু একটু করে জল ঢুকছে। সলিল-সমাধি অনিবার্য।

বৃদ্ধ যাত্রী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চল। নির্বাক। নিরুপায়।

সহসা এক লাফে নীচে নেমে এলো আর একটি মানুষ। তার এক হাতে এক খণ্ড লোহা, অপর হাতে ফাঁস-কল করা একগাছা দাড়ি।

এই মানুষটিই প্রধান গোলন্দাজ—এরই ত্রুটির ফলে এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত। এতগুলো মানুষের এই সমূহ মুশকিলের জন্যে দায়ী সে, সেই এর আসান করবে। হয় লোহার ডাণ্ডাটা কোন রকমে ঢুকিয়ে দেবে কামানের চাকার মধ্যে; না হয় দাড়ির ফাঁস-কলটা পরিয়ে দেবে কামানের মুখে। ব্যাস্। তাহলেই কাজ ফতে।

সুরু হলো সংগ্রাম—কামানের সঙ্গে গোলন্দাজের; বস্তুর সঙ্গে বুদ্ধির; নিষ্প্রাণের সঙ্গে প্রাণবানের সংঘর্ষ।

কামানটা ছুটে আসে শিং-উঁচানো বুনো মোষের মতো। গোলন্দাজ শাঁ করে পাশ কাটিয়ে সরে যায় আর সুযোগের অপেক্ষা করে। হঠাৎ একবার কামানটি এমনভাবে রুখে এলো যে গোলন্দাজের আর পাশ কাটাবার জায়গা রইলো না, ফুরসুতও নেই।

হায়! হায়! হায়! সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো। বৃদ্ধ যাত্রীটি ঝড়ের চাইতে ক্ষিপ্রতর গতিতে লাফ দিয়ে সামনে এলো। এক গাঁট নকল নোট দুই হাতে তুলে বিদ্যুৎবেগে ছুঁড়ে দিলো কামানের চাকার ভিতরে। ফল হলো বিস্ময়কর। যে কামানের উদ্যত আক্রমণে দুজনেরই মৃত্যু ছিল অনিবার্য, নকল-নোটের গাঁট কীলকের মতো তার চাকাকে আটকে দিলো। সেই সুযোগে গোলন্দাজ লোহার ডাণ্ডাটি ঢুকিয়ে দিলো পিছনের চাকার স্পোকের ভিতরে। কামান থামলো। তৎক্ষণাৎ সে ফাঁস-কলটি পরিয়ে দিলো পরাজিত দানবের ইস্পাতী গলায়। লোকজন সব ছুটে এলো দড়ি-দড়া ও শিকল নিয়ে। হলো রণজয়।

গোলন্দাজ এগিয়ে এসে বৃদ্ধ যাত্রীকে স্যালুট করল, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন হুজুর।

বৃদ্ধের মুখ ভাবলেশহীন। কোন উত্তর সে দিলো না। এগিয়ে এলো কাউন্ট দ্য বোয়াবার্তেলো। বলল, সেনাপতি, এই লোকটি যা করেছে সে জন্যে ওকে কি পুরস্কৃত করা উচিত নয়?

বৃদ্ধ জবাব দিলো, নিশ্চয়।

—তাহলে আদেশ করুন।

—আদেশ করবেন আপনি। আপনি ক্যাপ্টেন।

—কিন্তু আপনি সেনাপতি।

গোলন্দাজের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললো, এগিয়ে এসো।

কাউণ্টের গায়ে ছিল ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম। সেখান থেকে সেণ্ট লুইর ক্রশ-চিহ্নটি খুলে নিয়ে বৃদ্ধ সেটাকে পরিয়ে দিল গোলন্দাজের জামায়।

সকলে চেঁচিয়ে উঠলো, হুররা—

বিহ্বল গোলন্দাজের দিকে তর্জনী তুলে বৃদ্ধ আবার কথা বললো, এইবার একে গুলি করে মারো।

উল্লাস আতংকে স্তব্ধ হলো।

বৃদ্ধের গলা শোনা গেল আবার, একটিমাত্র ত্রুটিতে এই জাহাজ আজ বিপন্ন। হয়তো এর ধ্বংসই হবে। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কোন গুরুত্বের অপরাধেরই শাস্তি মৃত্যু। বীরত্বের পুরস্কার আছে। কর্তব্যে ত্রুটির আছে শাস্তি। সৈন্যগণ, তোমাদের কর্তব্য শেষ করো। এর শাস্তি মৃত্যু।

কয়েক মিনিট পরে।

একটু হঠাৎ আলোর ঝলকানি। রাইফেলের একটি আওয়াজ। সাগরের জলে একটি 'ঝপাত' শব্দ। আর সব চুপ।

দূরে ঝড়ের আর্তনাদ।...

॥ তিন ॥

আবার বিপদ।

'ক্লেমোর'-এর অবস্থা শোচনীয়। জাহাজের পাঁচ জায়গায় চিড় ধরেছে। অবিলম্বে সেগুলি মেরামত করতে হবে। ত্রিশটা কামানের মধ্যে একুশটা অকেজো হয়ে গেছে। কামান-সাজানো ডেকের অবস্থা পাগলা হাতীর খাঁচার চাইতেও দুর্দশাগ্রস্ত।

এদিকে সকলের অজ্ঞাতে জাহাজ বাতাসের বেগে ভেসে গেছে বিপথে। চারদিকে উন্মত্ত সাগর। বাতাসে ঝড়ের গর্জন। ঝলকে ঝলকে জল উঠছে জাহাজে। তরঙ্গ ভীষণ।

উপরের ডেকে দাঁড়িয়ে তিন মূর্তি—বুড়ো যাত্রী, ক্যাপ্টেন ও ভিঁভিল।

রাতের আঁধার কেটে গেল। পূর্ব-দিগন্তে উষার আভাস। পশ্চিম-দিগন্তে বিদায়ী চাঁদের ম্লান আলো।

উভয় দিগন্তের আলো-আঁধারের পটে আঁকা পড়েছে দুটি বিরাট-দেহ ছায়ামূর্তি। পশ্চিমে আকাশ-ছোঁয়া পর্বতের সারি। পূবে ফরাসী ক্রুজার বাহিনীর আটখানি রণতরী পরপর সাজানো।

ডেকের উপর ত্রিমূর্তির বুক কেঁপে উঠলো। এ যে উভয়-সংকট। কুখ্যাত ওই পাহাড়ের নীচে জাহাজ চালালে জাহাজ ডুবী অনিবার্য। সামনে এগিয়ে গেল সুসজ্জিত নৌ-বহরের হাতে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। মরণ সম্মুখে—মরণ পশ্চাতে। কোথায় পথ ?

লা ভিভিল হতাশ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, এ পথে ডুববে জাহাজ—ও পথে গর্জাবে কামান। এ কি পাথর-চাপা বরাত রে বাবা !

চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে বোয়াবার্তেলো এগিয়ে এলো বুড়ো যাত্রীর পাশে। বললো, স্যার, আমার প্রস্তুত। ভাঙা জাহাজটাকে যথাসম্ভব মেরামত করা হয়েছে। জানি, মৃত্যু অনিবার্য। তবু আমরা যুদ্ধই করব। মরতে যখন হবেই তখন ঢেউয়ের চেয়ে কামানের গোলাই ভাল। জলের চেয়ে আগুনই আমি ভালবাসি। মৃত্যুই আমাদের ভাগ্যলিপি। কিন্তু আপনার নয়। আপনি রাজ-প্রতিনিধি। আপনার কাজ অনেক বড়—ভাঁদির যুদ্ধ পরিচালনা। আপনার মৃত্যুতে রাজতন্ত্রের অবসান। সুতরাং বাঁচতে আপনাকে হবেই। একখানি নৌকা ও একজন নাবিক আপনাকে দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনি জাহাজ ত্যাগ করুন।

বৃদ্ধ যাত্রী কোন কথা বলল না। কেবল সম্মতি জানিয়ে একবার ঘাড় নাড়ল।

আবার ধ্বনিত হল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর, সৈনিক ও নাবিকগণ, এই লোকটি রাজার প্রতিনিধি। আমাদের হাতে এঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা এঁকে বাঁচাব। সুদক্ষ সেনাপতি ইনি। ভাঁদির রণক্ষেত্রে ইনিই হবেন আমাদের নায়ক। আমাদের সবাইকে নিয়ে এঁর ফ্রান্সের মাটিতে পা দেবার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের ছাড়াই এঁকে নামতে হবে। মাথা যদি বাঁচে তাহলে সবই বাঁচাল।

সকলে সমস্বরে বলল, ঠিক—ঠিক—

ক্যাপ্টেন সামনের দিকে চেয়ে বলল, সম্মুখে তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্র। ছোট একখানি নৌকা নিয়ে পার হতে হবে ইংলিস চ্যানেল। কে আছ দুঃসাহসী নাবিক, এগিয়ে এস।

দৃঢ়দেহ একজন নাবিক এল এগিয়ে, আমি আছি।

যাত্রা শুরু হল।

অনুকূল ঢেউয়ে দেখতে দেখতে নৌকাখানি জাহাজ থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ল।

সহসা বেজে উঠল রণভেরী।

বাতাসে ভেসে এলো বোয়াবার্তেলোর কঠিন কণ্ঠস্বর, সৈন্যগণ, মাস্তুলের মাথায় শ্বেত পতাকা ওড়াও! কে জানে, হয়তো এই আমাদের জীবনের শেষ সূর্যোদয় !

'ক্লেমোর'-এর কামান গর্জে উঠল।

মিলিত কণ্ঠে উঠল জয়ধ্বনি: রাজা দীর্ঘজীবী হোক।

পূর্ব-দিগন্ত হতে এলো সুস্পষ্ট জবাব: প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।

তার সংগে সুর মিলালো শত কামানের ভৈরব গর্জন। শুরু হল সংগ্রাম। ধোঁয়া আর আগুনে ছেয়ে গেল আকাশ-সাগর।

* * *

দিনের আলোয় দেখা গেল দুইজন যাত্রী নিয়ে নৌকা ভেসে চলেছে।

নাবিকের বয়স প্রায় ত্রিশ। তামাটে কপাল। তীক্ষ্ম দৃষ্টি। কোমরের বেল্টে দুটো পিস্তল। হাতে দাঁড়।

বুড়ো যাত্রীর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে নাবিক বলল, যাকে গুলি করে মারবার আদেশ আপনি দিয়েছেন, আমি তার ভাই।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল বুড়ো, কে তুমি?

—এই তো বললাম।

—কি চাও?

—আপনাকে খুন করতে।

—কেন?

—কারণ আপনি আমার ভাইকে খুন করেছেন।

—আমি তাকে খুন করি নি।

—তবে কে করেছে?

—তার নিজের দোষ।

নাবিক হাঁ করে চেয়ে রইল।

বুড়ো শুধাল, তোমার নাম কি?

—হালমালো। কিন্তু কি হবে আমার নামে? মরবার জন্যে প্রস্তুত হোন মালিক।

হালমালোর হাতে উদ্যত পিস্তল।

—তুমি আমাকে 'মালিক' বললে কেন?

—বারে, আপনাকে দেখেই বোঝা যায় আপনি একজন 'মালিক'—সম্ভ্রান্ত লোক।

—তোমার 'মালিক' আছেন?

—নিশ্চয়। তিনি খুব বড় জমিদার। মস্ত বড় বংশ।

—তিনি কোথায়?

—তা জানি না। এ-দেশ তিনি ছেড়েছেন। তার নাম মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক—ভাইকাউণ্ট দ্য ফঁতিনা, তিনি 'সাত বনের রাজা।'

—তিনি যদি সামনে এসে দাঁড়ান, তুমি তার কথা শুনবে ?

—নিশ্চয়। সর্বপ্রথম আমি ভগবানের দাস; তারপর রাজার দাস। কিন্তু কি হবে এ-সব বাজে কথায়? আপনি আমার ভাইকে মেরেছেন— আমি আপনাকে মারব।

নাবিক পিস্তল তুলে ধরলো।

বুড়ো সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ভয়লেশহীন মুখে বললো, এখনো ভেবে দেখো, আমাকে খুন করলে তুমি নিজেকেই খুন করবে।

—মানে ?

—দেখো, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। তুমি ঈশ্বরের দাস। কিন্তু জানো কি যে, আঘাতে আঘাতে ঈশ্বরের বুক আজ ক্ষতবিক্ষত? ঈশ্বরের পুত্র ফরাসীরাজ আজ কারাগারে বন্দী? তাঁর নির্যাতন যে ঈশ্বরের নির্যাতন। কলুষিত গীর্জা আর নিহত পুরোহিতদের আর্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঈশ্বরের আর্তনাদ। সে আর্তনাদ কি তোমার কানে পেঁছিয় ?

নাবিক চিন্তায় নতমুখ।

—আমরা চাই লাঞ্ছিত ঈশ্বর-পুত্রদের রক্ষা করতে। তাই এই যুদ্ধের আয়োজন। কিন্তু সব পণ্ড করে দিলো তোমার ভাই। সে যদি ঠিক মতো কাজ করত, 'ক্লেমোর' রণতরী তাহলে এমন ভাবে অপঘাতে মরত না; বিজয়-গৌরবে আমরা এতক্ষণ ফ্রান্সের মাটিতে পা দিতাম,—হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ, চোখের সামনে শ্বেত পতাকা। আমরা সাহায্য করতাম ভাঁদির বীর কৃষকদের; রক্ষা করতে পারতাম ফ্রান্সকে—ফ্রান্সের রাজাকে। সেই হলো ঈশ্বরের কাজ। আর এখন? এখনও আমি একা চলেছি সেই মহান কর্তব্যভার মাথায় নিয়ে। অথচ তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের—নরঘাতীদের বিরুদ্ধে রাজার—শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের এই সংগ্রামে তুমি নিচ্ছ শয়তানের পক্ষ। তোমার ভাই ছিল শয়তানের প্রথম সহচর, তুমি দ্বিতীয় সহচর। সে করেছিলো শুরু, তুমি করতে চাও শেষ। করো। আমাকে মেরে ফেলো। গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলে উঠুক। প্রতি পরিবারে উঠুক ক্রন্দনের রোল। পুরোহিতদের বুক রক্তাক্ত হোক। রাজা থাক চিরবন্দী লৌহ-কারাগারে। যীশু ক্রুশবিদ্ধ থাক চিরদিন তরে।......মারো। আমাকে মারো। নিরস্ত্র আমি। তোমার অস্ত্রাঘাতে আমাকে হত্যা করো।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপছে। চোখে জ্বলছে আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তা; বুকে দৃপ্ত তেজ।

শুনতে শুনতে হালমালোর মুখ সাদা হয়ে গেলো। শরীর কাঁপতে লাগলো ঝড়ের পাতার মত। বুড়োর দুই পা জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে উঠলো, দয়া করুন প্রভু, ক্ষমা করুন। আমি অন্যায় করেছি। আমার ভাই অপরাধী। তার

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। আপনার সকল আদেশ আমি নতমস্তকে পালন করব।

—আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।

নৌকা ভেসে চললো।

দিন গেলো। রাত্রি এলো। আবার এলো দিন। দিন ফুরালো।···

নৌকাটাকে যথাসম্ভব ঠেলে দিয়ে দুজনে তীরে নামলো। বুড়ো লোকটি একখানি বিস্কুট তুলে পকেটে রাখলো। বাকি বিস্কুট ও মাংস ব্যাগে ভরে হালমালো সেটাকে কাঁধে ফেললো।

পথে নেমে শুধালো, ম'সিয়, আমি আপনার আগে যাব, না পিছনে?

—কোনটাই নয়। এইবার আমরা বিদায় নেব।

একটু থেমে বুড়ো পকেট থেকে বের করলো সবুজ সিল্কের একখানি গিল্ট-দেওয়া রুমাল। মাঝখানে সোনার সুতোয় fleur-de-lis অক্ষর ক'টি লেখা।

বুড়ো শুধালো, তুমি পড়তে জানো?

—না।

—ভালই হলো। লেখাপড়া জানা লোক বড়ো জঞ্জালে। শোনো মন দিয়ে।

—বলুন।

—তুমি যাবে ডাইনে। আমি বাঁয়ে। যেতে যেতে এক সময় পাবে সেণ্ট রুইল ও প্লেডিয়াকের মাঝখানে পাহাড়ের কোণে একটা মস্ত বাদাম গাছ। সেইখানে থামবে। চারদিকে চেয়ে দেখবে—কেউ কোথাও নেই। তখন করবে সংকেত-ধ্বনি। জানো তো সংকেত-ধ্বনির কৌশল?

হালমালো ঘাড় নাড়লো। দুটো আঙুল মুখে পুরে প্যাঁচার মতো ডেকে উঠলো—টু-হুইট—টু—হু-উ-উ—

বুড়ো খুসি হয়ে বললো, বেশ বেশ। এমনি শব্দ তিনবার করতেই যেন মাটি ফুঁড়ে একটি মানুষ হাজির হবে। তার নাম প্লাসেনা। এই নিদর্শন দেখালেই সে সব বুঝতে পারবে।

fleur-de-lis···লেখা নিদর্শনটি বুড়ো এবার হালমালোকে দিলো। ভক্তিভরে নিয়ে সেটাকে সে সযত্নে বুকের কাছে রেখে দিলো।

—সেখান থেকে তুমি যাবে আস্তিলের জঙ্গলে। সেখানে দেখা পাবে খোঁড়া মুস্কেতোর। তারপর যাবে কুসবোতে। সেখান থেকে রুগেফু। ভালো কথা, তুমি লা তুর্গ চেন?

—লা তুর্গ আবার চিনি না? সেখানেই তো আমার মালিকদের মস্ত বড় দুর্গ। দুর্গের দুটো ভাগ—নতুন আর পুরানো। মাঝখানে একটা লোহার

দরজা। এতো শক্ত যে কামানের গুলি হার মানে তার কাছে। সেই দুর্গের নীচে আছে গুপ্ত সুরঙ্গ। আমি সব জানি।

বৃদ্ধ লোকটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো; গুপ্ত সুরঙ্গ? তুমি বলছো কি?

—আজ্ঞে ঠিকই বলছি। পুরাকালে যখন লা তুর্গ দুর্গ অবরোধ করা হয়েছিলো; সেই সময় এই গুপ্ত-পথ তৈরী হয়েছিলো। এ-কথা কেউ জানে না। কেবল আমার বাবা জানতেন। তিনিই আমাকে সে-পথ দেখিয়েছিলেন। সুরঙ্গ পথে একটি পাথর আছে, সেটি আপনি নড়ে—

বুড়ো এবার হেসে উঠলো; হেঃ; কতো কথাই যে তোমরা জানো। পাথর নড়ে, পাথর গান গায়; পাথর রাত্তির করে ঝর্ণায় গিয়ে জল খায়। যতো সব বাজে—

—কিন্তু—

বুড়ো একটা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, ওসব বাজে কথা থাক। এখন কাজের কথা শোনো। এমনি করে এই নিদর্শন আর সংকেত-ধ্বনির সাহায্যে সব জায়গায় তুমি ছড়িয়ে বেড়াবে আমার আদেশ: ওঠো—অস্ত্র নাও—ধ্বংস করো।…পর্বতে-কন্দরে, বনে-বনান্তরে, ফ্রান্সের সকল স্থানে তুমি ঘুরবে। সব্বাইকে বলবে প্রস্তুত হতে। এক মাসের মধ্যে পাঁচ লক্ষ্য সৈন্য আমি চাই। ফ্রান্সের প্রতি বনে জঙ্গলে তারা লুকিয়ে থাকবে শিকারী বাজপাখির মতো। বিপ্লবী বাহিনী আমাদের শিকার।…সবাইকে আরো জানাবে, ইংরেজ আমাদের সহায়। দুই আগুনের মাঝে ফেলে প্রজাতন্ত্রকে আমরা পুড়িয়ে মারব। ইওরোপ আমাদের সাহায্য করবে। বিপ্লবের অবসান হবেই। বুঝেছ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বেশ। এইবার তবে রওনা হও।

—আবার কোথায় মসিয়র দেখা পাব?

—যেখানে আমি থাকব।

—কি করে সে কথা আমি জানব?

—সারা জগৎ সেদিন আমার কথা জানবে।

—বুঝেছি।

—বেশ। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। যাও।

—আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

—বেশ।

—যদি সফল হই—

—পুরস্কার পাবে।

—আমার ভাইয়ের মত পুরস্কার। আর যদি সফল না হই, আমাকে গুলি করবেন তো?

—ঠিক তোমার ভাইকে যেমন করা হয়েছে।

—বাস—বাস মঁসিয়।

বৃদ্ধ আত্ম-চিন্তায় বিভোর। মাথাটা নুয়ে পড়েছে। খানিক পরে চোখ তুলে দেখলো সে একা দাঁড়িয়ে। হালমালো অনেক দূরে—এগিয়েই চলেছে।

সূর্য পাটে নামছে।

॥ চার ॥

সামনেই একটা উঁচু বালিয়াড়ি।

বুড়ো লোকটি বালিয়াড়ি বেয়ে উঠলো তার মাথায়।

দূর অতীতে কবে সেখানে গড়া হয়েছিল একটি স্মৃতি-স্তম্ভ। তাইতে হেলান দিয়ে বুড়ো বসলো। তাঁর পায়ের চারদিক জুড়ে দিগন্তবিস্তৃত ভূমিখণ্ড। গোধূলির ম্লান আলোয় প্রকৃতি রহস্যময়। শান্ত। স্তব্ধ। কানে আসে সাগর-বাতাসের হা-হা স্বর

হঠাৎ সে চমকে উঠলো। দিগন্তে নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি। • সম্মুখে করমেরা ঘণ্টা-ঘর। বেশ খানিকটা দূরে। তবু স্পষ্ট চোখে পড়ে। তার মাথায় ঘণ্টার খাঁচাটি অনবরত দুলছে না? তাই তো। নইলে ওর মুখটা পর পর খুলছে আর বুঁজছে কেন? এইমাত্র পিছনের লাল আকাশ দেখা গেলো তার ভিতর দিয়ে। আবার দেখা গেলো না। এই আলো—এই আঁধার।

বুড়ো তাকালো ডাইনে। বাগুর-পিকান ঘণ্টা-ঘর। আশ্চর্য। এটাও ঠিক একই ভাবে দুলছে।

আবার সে তাকালো বাঁয়ে। তানিস্ ঘণ্টা-ঘর। এটাও দুলছে।

একে একে আশেপাশের সবগুলি ঘণ্টা-ঘর সে পরীক্ষা করলো। সবগুলি দুলছে।

এর মানে কি? নিশ্চয় ঘণ্টাগুলো কেউ বাজাচ্ছে একযোগে। নিশ্চয় এ কোন বিপদ-সংকেত। চারদিক থেকে, সমস্ত ঘণ্টা-ঘর থেকে, সবগুলি গ্রাম থেকে একযোগে বাজছে বিপদ-সংকেত। কিন্তু কোন শব্দ সে শুনতে পায় নি, এখনও পাচ্ছে না। কারণ, সাগর-বাতাসে শব্দ ভেসে যাচ্ছে উল্টো পথে। তাই বিপদ-সংকেত তাঁর চোখে ভাসছে, কানে আসছে না। কিন্তু কেন এই সংকেত? কার বিরুদ্ধে এই আয়োজন? আমার বিরুদ্ধে কি?—বৃদ্ধের লোহার মতো শরীরের ভিতর দিয়েও বুঝি একটা ঠাণ্ডা স্রোত শিরশির করে বয়ে গেলো। এরা কি আমাকে চিনতে পেরেছে? স্থানীয় গণ-

প্রতিনিধি কি আগেই পেয়েছে আমার আসার খবর? তাও তো সম্ভব নয়। 'ক্লেমোর' ডুবে গেছে অতল জলে। একটি প্রাণীও তার রক্ষা পায় নি। তবে? কে দেবে সংবাদ?

মাথার উপর কি যেন ফর্‌ফর্ করছে। ঝরা পাতার শব্দ কি?

বুড়ো উঠে দাঁড়ালো।

স্মৃতি-স্তম্ভের অপর পিঠে একখানি বিজ্ঞাপনের কাগজ লটকানো। এইমাত্র কে বুঝি লটকে রেখে গেছে। আঠা এখনও শুকায় নি। তারি খানিকটা বাতাসে খুলে গিয়ে ফর্‌ফর্ শব্দ হচ্ছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বুড়ো বিজ্ঞাপনটি পড়ে ফেললো।

—ফরাসী প্রজাতন্ত্র এক ও অখণ্ড—

'সেরবুর্গ' উপকূলস্থ গণ-বাহিনীর অস্থায়ী প্রতিনিধি আমরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতেছি:

'ভূতপূর্ব' মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক গোপনে গ্রেনভিল উপকূলে অবতরণ করায় আমরা তাঁহাকে গণ-শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। যে-কেহ জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে ষাট হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার দেওয়া হইবে। সেরবুর্গ উপকূল-বাহিনীর একটি দলকে শীঘ্রই নামমাত্র মার্কুইস দ্য লাঁতিনাককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাঠানো হইতেছে।

'পল্লীবাসীদিগকেও এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আদেশ দেওয়া হইতেছে।

১৭৯৩ সালের ২রা জুন তারিখে গ্রেনভিল টাউন-হল হইতে প্রচারিত।

(স্বাক্ষর) প্রিউর দ্য লা মার্ন'

এর নীচে আরও খানিকটা লেখা ছিলো ছোট অক্ষরে। স্তিমিত আলোয় বুড়ো সে-লেখা পড়তে পারলো না।

আর এখানে দেরী করা উচিত নয়। দ্রুত পদক্ষেপে বুড়ো বালিয়াড়ি থেকে নীচে নেমে এলো।

সামনেই পায়ে-চলা ছোট পথ। নির্জন। তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা উল্টো করে গায়ে চড়িয়ে বুড়ো পা বাড়ালো।

চাঁদ উঠেছে।

তে-মাথার মোড়ে একটা পাথরের ফলক। তার গায়ে একখানা বিজ্ঞাপনের কাগজ লটকানো। বুড়ো এগিয়ে গেলো।

—কোথায় যাচ্ছেন? কে যেন বললো।

বুড়ো পিছন ফিরলো। আর একটি বুড়ো। তারই মত লম্বা, তারই

মত বয়স, তারই মত পাকা চুল। পোষাক আরও ছেঁড়া। হাতে লম্বা লাঠি।

নবাগত শুধালো, আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায় চলেছেন আপনি?

—তার আগে আমার কথার জবাব দাও। আমি কোথায়?

—আপনি এখন তানিস-এ। আমি এখানকার এক ভিখারী; আর আপনি এখানকার মালিক।

—আমি?

—হ্যাঁ। আপনি মালিক মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক।

মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক শান্ত কণ্ঠে বললো, বুঝেছি। দাও আমাকে ধরিয়ে।

বুড়ো বললো, এখানে আমরা দুজনই নিরাপদ। আপনি দুর্গে, আর আমি জঙ্গলে।

—ও সব কথা থাক। তোমার কাজ শেষ করো। চলো কোথায় নিয়ে যাবে।

—আপনি তো যাচ্ছিলেন হার্বে-অঁ-পাইল গোলাবাড়ির দিকে?

—হ্যাঁ।

—যাবেন না।

—কেন?

—সেখানে নীলকোর্তারা রয়েছে।

—কবে থেকে?

—আজ তিন দিন হলো।

—গোলাবাড়ি আর পল্লীর লোকেরা বাধা দেয় নি?

—না। বরং তারা দরজা খুলে দিয়েছিলো।

—ওঃ!

বুড়ো গোলাবাড়ির দিকে আঙুল বাড়িয়ে শুধালো, বাড়িটার মাথায় কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

—কি যেন উড়ছে।

—হ্যাঁ।

—একটা নিশান বলে মনে হচ্ছে।

—ত্রিবর্ণ পতাকা।

একটু চুপ করে থেকে মার্কুইস শুধালো, বিপদ-সংকেত কি এখনও বাজছে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—আপনারই জন্য।

—কিন্তু আমি তো শুনতে পাচ্ছি না।

—বাতাসে শব্দটা অন্য পথে ভেসে যাচ্ছে তাই।

একটু থেমে বুড়ো লোকটি শুধালো, পথে পথে বিজ্ঞাপন পড়েছে, দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—তারা আপনাকেই খুঁজছে। একদল সৈন্য পর্যন্ত এসে গেছে।

—তাই নাকি? তাহলে তো দেখা করতেই হয়।

মার্কুইস পা বাড়ালো। তার হাত ধরে বুড়ো বললো, যাবেন না সেখানে।

—তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

—আমার বাড়িতে।

মার্কুইস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভিখারীর দিকে তাকালো।

—দেখুন মালিক, আমার ঘর ভাল নয়, কিন্তু নিরাপদ। গোলাবাড়িতে গেলেই ওরা আপনাকে গুলি করবে। আমার ঘরে তবু ঘুমোতে পারবেন। কাল সকালে নীলকোর্তারা এখান থেকে চলে যাবে। তখন আপনি যেখানে খুসি যাবেন।

মার্কুইস তবু প্রশ্ন করলো; তুমি কোন্ দলে? প্রজাতন্ত্রী না রাজতন্ত্রী?

—আমি ভিখারী।

—কোন দলেরই নও?

—দলাদলি আমি বিশ্বাস করি না।

—তুমি রাজার স্বপক্ষে, না বিপক্ষে?

—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।

—অথচ তুমি তাকে সাহায্য করতে এসেছ? কেন?

—কারণ আপনি আমার চাইতেও গরীব। আমার বাঁচবার অধিকার আছে, আপনার তাও নেই।

—তাই তুমি আমাকে বাঁচাতে চাও?

—নিশ্চয়। আমরা যে স্বগোত্র। দুজনই ভিখারী। আমি ভিক্ষা করি রুটি, আর আপনি ভিক্ষা করেন প্রাণ।

—তুমি কি জান, আমার মাথার দাম ষাট হাজার ফ্রাঁ?

—জানি বলেই তো আপনাকে লুকিয়ে রাখতে চাই সকল চোখের আড়ালে। আসুন মঁসিয়, আর দেরী করবেন না।

দুজন পথে নামলো।

অদ্ভুত বাড়ি।

একটা বুড়ো ওক গাছের শিকড় খুঁড়ে তার নীচে তৈরি হয়েছে ঘর। উপরে লতায়-পাতায় ঢাকা। নীচু, অন্ধকার, দৃষ্টির অগোচর।

হামাগুড়ি দিয়ে দুজনে ঘরে ঢুকলো। ঘরে আলো নেই। চাঁদের আলো পড়ছে বাঁকা হয়ে।

কোন রকমে সামান্য কিছু খেয়ে তারা শুয়ে পড়লো।

মার্কুইস শুধালো, তোমার নাম কি ?

—তেল্‌মার্স ; তবে সবাই ডাকে ক্যামাঁ বলে।

—বুঝেছি। ক্যামাঁ এ অঞ্চলের চলিত কথা।

—তার অর্থ ভিখারী। অনেকে আমাকে বুড়ো বলেও ডাকে। চল্লিশটা বছর লোকে আমাকে বুড়ো বলে আসছে।

—চল্লিশ বছর! বলো কি ? তখন তো তুমি যুবক ছিলে।

—যুবক আমি কোনদিনই ছিলাম না। যৌবন তো আপনাদের জন্য। আপনারা মালিক—বড় লোক। আপনার গায়ে আজও বিশ বছরের যুবকের শক্তি ; ওই উঁচু বালিয়াড়িতে আপনি অনায়াসে উঠে যান। আর আমার পক্ষে হাঁটা-চলাই কষ্টকর। অথচ আমরা সমবয়সী। ধনীদের একটা মস্ত সুবিধা যে তারা রোজ খেতে পায়। খাদ্যই তো জীবন।

একটু থেমে ভিখারী আবার শুরু করলো, ধনী আর গরিব—ওইখানেই তো যত তফাৎ—সব গোলমালের সূত্রপাত। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। গরিবরা ধনী হতে চায়, ধনীরা কিন্তু গরিব হতে রাজী নয়। তলিয়ে দেখতে গেলে এইটেই তো আসল কথা।

মার্কুইস হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, তুমি কি আমাকে আগে থেকেই চিনতে।

—নিশ্চয়। শেষ বার আপনাকে দেখেছি দু' বছর আগে। আপনি তখন ইংলণ্ডের পথে।

—অথচ আমি তোমাকে চিনি না।

—আপনি আমাকে দেখেছেন অনেকবার, কিন্তু চোখ মেলে তাকান নি। তাকিয়েছি আমি। এইখানেই তো মজা। দাতা আর গ্রহীতা এক চোখে চায় না।

—তাহলে এর আগেও তোমার সঙ্গে আমার মুখোমুখি হয়েছে ?

—অনেক বার। আমি যে ভিখারী। আপনার দুর্গে যাবার পথের ধারেই তো আমি হাত পেতে বসে থাকতাম। আপনার দান কত বার আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এমন অনেক সময় আসে যখন একটা পেনিও জীবন বাঁচায়। এক সময় আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আমি আজ সে ঋণ শোধ করলাম।

—সে কথা ঠিক। তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছ।

—নিশ্চয়। কিন্তু এক শর্তে—

—কি ?

—এখানে কারও কোন ক্ষতি আপনি করবেন না।

—আমি এসেছি এখানকার কল্যাণের জন্যে।

—সুখী হলাম। এবার ঘুমোন।

আগে-পরে দুজনই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো তেলমার্সের ডাকে।

—মঁসিয়, তানিস-এর ঘণ্টা-ঘরে এইমাত্র চারটে বাজলো। বাতাসের গতি ফিরেছে। অথচ কোন শব্দ কানে আসছে না। নিশ্চয় বিপদ-সংকেত থেমে গেছে। হার্বে-অঁ-পাইল এখন নীরব—শান্ত। নীলকোর্তারা হয় ঘুমিয়েছে, না হয় চলে গেছে। আমারও ভিক্ষায় বেরোবার সময় হল। আপনিও এই বেলা এখান থেকে সরে পড়ুন।

তারপর দুই দিকে দুই হাত বাড়িয়ে বললো, আমি যাব এই পথে; আর আপনি চলে যান এই পথে।

মার্কুইসকে অভিবাদন জানিয়ে ভিখারী চলে গেলো। বিপরীত পথ ধরে মার্কুইসও থামলো এসে তে-মাথার মোড়ে।

প্রস্তার-ফলকের গায়ে কাগজের বিজ্ঞাপনটা তখন সূর্যকিরণে চিক চিক করছে। এগিয়ে গিয়ে সে পড়তে লাগলো। 'প্রিউর দ্য লা মার্ন" স্বাক্ষরের নীচে আরও কয়েকটি লাইন লেখা রয়েছে ছোট অক্ষরে :

'ভূতপূর্ব মার্কুইস দ্য লাঁতিনাককে সনাক্ত করা হইলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গুলি করা হইবে।

স্বাক্ষর : অনুসন্ধান-বাহিনীর অধিনায়ক গোভাঁ।'

গোভাঁ!—সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলো মার্কুইস! গভীর চিন্তায় সে স্তব্ধ। অজ্ঞাতেই তাঁর মুখ হতে আবার বের হলো, গোভাঁ!

কয়েক পা এগিয়ে আবার সে ফিরে এলো। আবার পড়লো বিজ্ঞাপনটি। আবার বললো আপন মনে, গোভাঁ!

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চললো। মুখে একটি মাত্র শব্দের অস্ফুট গুঞ্জন, গোভাঁ!

ও কিসের শব্দ ?

লাঁতিনাকের চমক ভাঙলো।

উন্মত্ত চীৎকার···মুহুর্মুহু গুলির শব্দ···তাল পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া···আগুনের লেলিহান শিখা···

হার্বে-অঁ-পাইলে যুদ্ধ সুরু হয়েছে।

তীব্র কৌতূহলে লাঁতিনাক পার্শ্ববর্তী বালিয়াড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো। আশেপাশের সব কিছু সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

সত্যি বেধেছে যুদ্ধ। আক্রমণ আর অগ্নিকাণ্ড। আর্তনাদ আর অগ্নিশিখা।

কিন্তু আক্রমণ করেছে কারা? কাদের সঙ্গে এই লড়াই?

হঠাৎ থেমে গেলো বন্দুকের শব্দ। ভেরী বাজছে শুধু তীব্র নিনাদে। বাজছে আর এগিয়ে আসছে।

ঝোপে-জঙ্গলে কাকে যেন তারা খুঁজছে। কাকে?

বাজনা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তার সাথে বহুকণ্ঠের কোলাহল। আর সেই কোলাহলকে ছাপিয়ে শত শত স্পষ্ট কণ্ঠে ধ্বনিত হলো একটি মাত্র নাম—

লাঁতিনাক! লাঁতিনাক! মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক!

সঙ্গে সঙ্গে বালিয়াড়ির চারদিক ঘিরে ফেললো শত শত সৈনিক। স্পষ্ট করে তাদের কাউকে দেখা যায় না। ঝোপ-জঙ্গল, লতা-পাতার ফাঁকে দেখা যায় সঙিন, কৃপাণ আর একটি ত্রিবর্ণ নিশান। দেখা যায় জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখ।

শত শত উদ্যত সঙিন ও বন্দুকের লক্ষ্যস্থলে দাঁড়িয়ে মার্কুইস একা—একেবারে একা। তবু সে নির্ভয়—বেপরোয়া। কঠিন কণ্ঠে সে বলে উঠলো, আমাকেই তোমরা খুঁজছ। আমিই মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক; ভাইকাউন্ট দ্য ফঁতিনা, রাজার সহকারী সেনাপতি। এই মুহূর্তে কাজ শেষ করো। বন্দুক তোলো। করো গুলি।

এক টানে ছাগলের চামড়ার ভেস্টটা ছিঁড়ে ফেলে খোলা বুক ফুলিয়ে সে দাঁড়ালো দর্পিত ভঙ্গীতে।

কিন্তু কোথায় বন্দুক? কোথায় গুলি? সমবেত শতকণ্ঠে উঠলো আনন্দ-উল্লাস: লাঁতিনাক দীর্ঘজীবী হোক! সেনাপতি দীর্ঘজীবী হোক!

নাটকের যেন পট-পরিবর্তন হলো। মার্কুইসের চারদিকে ভাঁদির বীর সৈন্যদল। সম্ভ্রমে আভূমি নত। সামরিক পোষাকে সজ্জিত একটি যুবক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। হাতের খোলা তলোয়ার মার্কুইসের হাতে দিয়ে বললো; আপনাকেই আমরা খুঁজেছি—পেয়েছি। এখন হতে আপনি সেনাপতি, সবাই আমরা সৈনিক। আদেশ করুন।

যুবকের ইঙ্গিতে জনকয়েক সৈনিক এগিয়ে এলো। তাদের হাতে একটি ত্রিবর্ণ পতাকা।

যুবক বললো; মঁসিয়, আমার নাম গাভার্দ। হার্বে-অঁ-পাইলে নীল-কোর্তাদের কাছ থেকে এইমাত্র এই নিশান আমরা কেড়ে এনেছি।

—বেশ করেছ—হাতের তরবারি মাথার উপর ঘুরিয়ে মার্কুইস চীৎকার করে উঠলো, দাঁড়াও সব। বলো—রাজা দীর্ঘজীবী হোক!

সারা বনভূমি কাঁপিয়ে উঠলো বিচিত্র জয়ধ্বনি, রাজা দীর্ঘজীবী হোক, লাঁতিনাক দীর্ঘজীবী হোক!

গাভার্দকে জিজ্ঞাসা করলো মার্কুইস, সংখ্যায় তোমরা কত?

—আজ সাত হাজার। কালই হবে পনেরো হাজার।

—হার্বে-অঁ-পাইলের গোলাবাড়িতে তোমরা নীলকোর্তাদের আক্রমণ করেছিলে?

—নীলকোর্তারা বাতাসের জন্য সারা রাত আমাদের বিপদ-সংকেত শুনতেও পায় নি। আরামে তারা ঘুমুচ্ছিলো। ভোরেই আমরা গোলাবাড়ি ঘিরে ফেলি। অতি সহজেই কাজ শেষ হয়েছে। দেখুন মঁসিয়, আমার একটি ঘোড়া আছে। যদি আপনার কাজে লাগে—

—নিয়ে এসো।

সাদা ধপধপে ঘোড়াটি। সামরিক সাজে সুজ্জিত। মার্কুইস ঘোড়ায় সওয়ার হলো এক লাফে।

সমবেত জনতা চীৎকার করে উঠলো।

সামরিক কায়দায় স্যালুট করে গাভার্দ জিজ্ঞাসা করলো, মঁসিয়, কোথায় হবে আপনার ঘাঁটি?

—প্রথমে ফুজারে অরণ্যে। এই মুহূর্তে সকলে রওনা হও।

—তাই হবে। আর কি আদেশ আপনার?

—তুমি বললে না, হার্বে-অঁ-পাইলের অধিবাসীরা নীলকোর্তাদের আশ্রয় দিয়েছিলো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে?

—হ্যাঁ। নীলকোর্তারা বাধা দিয়েছিল কিন্তু তারা দেড় শো, আর আমরা সাত হাজার। অনেক মরেছে।

—বেশ হয়েছে।

—আহতদের ব্যবস্থা কি হবে?

—সাবার করে দাও।

—বন্দীদের?

—গুলি করো।

—প্রায় আশি জন বন্দী।

—সব এক সঙ্গে গুলি করো।

—দুটি স্ত্রীলোক আছে।

—গুলি করো।

—তিনটি শিশু?

—তাদের নিয়ে চলো। যা হয় পরে ঠিক করা যাবে।

মার্কুইস ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

তেলমার্স আপন মনে পথ চলেছে।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো—কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপার কি? তেলমার্স দ্রুত পায়ে ধোঁয়া লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলো।

একটা পাহাড়ে উঠলো অতি কষ্টে। চারদিকে তাকালো। গ্রাম বা গোলা-বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। হাবের্-অ-পাইলের ধ্বংস-স্তূপের বুকে তখনও জ্বলছে লেলিহান অগ্নিশিখা।

তেলমার্সের চোখে জল এলো। প্রাসাদ যখন পুড়ে যায় তাও সয়, কিন্তু কুড়ে ঘর যখন আগুনে পোড়ে তার চাইতে শোচনীয় বুঝি আর কিছু নেই। এ যে মরার উপর খাঁড়ার ঘা—মাটির কীটের উপর নির্মম শকুনির নখরাঘাত!

কাঁপতে কাঁপতে সে নেমে এলো। গোলবাড়ির দরজার কাছে এসে থামলো। উঠোনের মাঝখানে একটা কালো স্তূপ। মৃত মানুষের স্তূপ। চারদিকে রক্তের ঢেউ।

হায় নিরীহ গ্রামবাসী! হায় বিপ্লবী সৈনিকদল!

একটা আধ-ভাঙা দেয়ালের পাশে তেলমার্সের চোখ পড়লো। চারখানি পা। সে এগিয়ে গেলো। দুটি স্ত্রীলোক পড়ে আছে। একজনের পরণে ইউনিফর্ম—স্বেচ্ছাসেবিকা বুঝি। মাথায় চারটি গুলির চিহ্ন। অপরটি জনৈকা চাষী। শরীর এখনও একেবারে ঠাণ্ডা হয় নি। বুকে ক্ষীণ স্পন্দনের আভাষ। মরে নি। অজ্ঞান হয়ে আছে।

তেলমার্স চেঁচিয়ে ডাকল, কেউ কি এখানে আছ?

—আমি আছি ক্যামাঁ।

—আমিও আছি।

গর্তের ভিতর থেকে দুটি চাষী বেরিয়ে এলো।

একজন শুধালো, বেঁচে আছে কি?

তেলমার্স ঘাড় নাড়লো। মুখে কোন কথা বলতে পারলো না। চাষী দুজন কথা বললো।

—উঃ, সবাইকে মেরে ফেললো গো।

—সব পুড়িয়ে দিলো। হা ঈশ্বর, এমন করেই কি দিন চলবে?

—ওই লম্বা বুড়ো লোকটাই তো হুকুম করে গেলো। বললো, মার, পোড়াও, কাউকে রেহাই দিও না।

—তিনি আবার একজন মার্কুইস। নাম লাঁতিনাক।

আকাশে মুখ তুলে তেলমার্স আপন মনে বললো, আগে যদি জানতাম—

॥ পাঁচ ॥

১৭৯৩। জুলাই মাস। সূর্য ডোবে ডোবে।

ক্রয়-ব্রাকার্দ হোটেলের সামনে এসে ঘোড়া থামালো এক অশ্বারোহী। গায়ে ভারী আলখাল্লা। মাথায় চওড়া টুপি, তিন-রঙা চিহ্ন আঁকা। কটিদেশে বেল্টের সাথে দুটো পিস্তল। তার নীচে ঝুলছে কোষবদ্ধ তরবারি।

দরজা খুলে হোটেলওয়ালা শুধালো, আপনি কি এখানে থাকবেন?

—না। আমার ঘোড়াটার কিছু দানাপানির ব্যবস্থা করে দাও।

ঘোড়ার খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে হোটেলওয়ালা প্রশ্ন করলো, আপনি কোথায় যাবেন?

—দোলে?

—তাহলে ফিরে যান।

—কেন?

—দোলে এখন লড়াই হচ্ছে।

—ওঃ।

—কোত্থেকে আসছেন আপনি?

—প্যারি।

—একা?

—সঙ্গী আছে।

—কোথায়?

—এই তরবারি আর পিস্তল।

অশ্বারোহীকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে হোটেলওয়ালা মনে মনে বললো—কিন্তু দেখে তো একে পুরোহিত বলেই মনে হয়। বাইরে বললো, দেখুন, আজ রাতের মত আপনি এখানেই বিশ্রাম করুন। আপনি পথশ্রান্ত। আপনার ঘোড়াটাও ক্লান্ত।

—ঘোড়ার ক্লান্ত হবার অধিকার আছে; মানুষের নেই। হ্যাঁ, তুমি বলছিলে না দোলে লড়াই হচ্ছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কারা লড়াই করছে?

—সে-এক মজার ব্যাপার। কাকার সঙ্গে ভাই-পোর লড়াই।

—মানে ?

—একজন ভূতপূর্ব লর্ড নিয়েছে প্রজাতন্ত্রের পক্ষ। আরেক ভূতপূর্ব লর্ড নিয়েছে রাজার পক্ষ। একজন যুবক, অপর বৃদ্ধ। কাকা রাজভক্ত, আর ভাই-পো দেশভক্ত। কাকা সাদাকোর্তা দলের অধিনায়ক; ভাইপো নীলকোর্তা দলের সেনাপতি। কেউ কমতি যায় না। মরণ পর্যন্ত তারা লড়বে।

—মরণ পর্যন্ত ?

—হ্যাঁগো মঁসিয়। এই দেখুন না, খুড়ো-ভাই-পোর কেমন ভাব।

হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করে হোটেলওয়ালা দরজার গায়ে পাশাপাশি লাগানো দুখানা বিজ্ঞাপনের দিকে আঙুল বাড়ালো। লেখাগুলো বড় বড়। অশ্বারোহী বুড়ো হলেও তার পড়তে কোন কষ্ট হলো না।

প্রথম বিজ্ঞাপন ঃ

মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভাইকাউণ্ট গোভাঁকে জানাইতেছেন যে, ভাইকাউণ্টকে ধরিতে পারিলেই তাহাকে সসম্মানে গুলি করার ব্যবস্থা করা হইবে।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন ঃ

'গোঁভা লাঁতিনাককে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তাঁহাকে ধরিতে পারিলেই গুলি করা হইবে।'

অশ্বারোহী টুপি খুলে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনখানাকে অভিবাদন করলো। তারপর বললো, আচ্ছা, কোন্ পক্ষ জিতবে বলে তোমার মনে হয় ?

—সে-কথা বলা শক্ত। তবে ভাইকাউণ্টের পাল্লাই ভারী বলে মনে হয়। আসল ব্যাপার কি জানেন ? দুজনই এতদঞ্চলের মালিক গোভাঁ পরিবারের বংশধর। একটি শাখার বর্তমান মাতব্বর হলেন মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক; অপর শাখার মাতব্বর ভাইকাউণ্ট গোভাঁ। অথচ দুজনে আজ কামড়া-কামড়ি করে মরছে। নগর আর সহরের লোকেরা চায় বিপ্লব, তারা গোঁভাঁর পক্ষে। পল্লী অঞ্চলে লাঁতিনাকই সর্বেসর্বা। চাষীরা তো তাঁকে রাজা বলেই জানে। ফ্রান্সে পা দেওয়ামাত্রই আট হাজার লোক তার সাথে যোগ দেয়। তার উপর আছে ইংলণ্ডের সাহায্য। সাগরের তীরভূমি দখল করতে পারলে তো ইংরেজরা এতো দিন নেমে পড়তো ফ্রান্সে। কিন্তু গোভাঁও সেয়ানা কম নয়। উপকূলটা সে হাতের মধ্যে নিয়ে বসে আছে।

একটু থেমে হোটেলওয়ালা আবার বলতে লাগলো, এদিকে আবার আর এক কাণ্ড ঘটেছে। লাঁতিনাক যেদিন এলেন, অনেক বন্দীকে সেদিন হত্যা করা হয়। দুটি মেয়েমানুষকেও তারা গুলি করে। তাদের একজনের ছিলো তিনটি শিশু সন্তান। তাদের ওরা সঙ্গে করে নিয়ে পালায়। ছেলে-

মেয়ে তিনটে যে এখন কোথায় আছে কেউ জানে না। এদিকে বিপ্লবী দলের প্যারি-বাহিনীর 'বনেট রুজ' নামে একটি দুর্ধর্ষ সেনাদল ওই ছেলেমেয়ে তিনটিকে নিয়েছিলো পোষ্য। এ ব্যাপারে তারা তো ক্ষেপে উঠেছে। স্ত্রীলোকদের হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবেই। পোষ্যদের তাদের চাইই। এখানেই বেঁধেছে যতো গেরো।

অশ্বারোহী শুধালো, দোলে যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

—প্রায় তিন ঘণ্টা। কিন্তু না যাওয়াই আপনার ভালো ছিলো।

—না গিয়ে আমার উপায় নেই।

—অতি প্রিয়জন কেউ কি সেখানে আছে?

—হ্যাঁ।

—আপনার ছেলে কি—

—তাও বলতে পারো।

হোটেলের পাওনা মিটিয়ে অশ্বারোহী ঘোড়ায় চাপলো।

দোল সহর।

সহর বললে ভুল হয়—একটা রাজপথ। পুরানো কালের পথ। রাস্তার কোল ঘেঁসে বড় বড় বাড়ী। দুই দিক থেকে বেরিয়ে গেছে অসংখ্য গলি। রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পুরানো বাজার।

ক্রয় ব্রাঁকার্দের হোটেলওয়ালা ঠিকই বলেছে। ঘোরতর লড়াই চলেছে দোল সহরের বুকে।

সকালে এসেছে সাদাকোর্তা বাহিনী। রাতের অন্ধকারে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো নীলকোর্তা দল। সাদাকোর্তারা সংখ্যায় ছ' হাজার, আর নীলকোর্তারা মাত্র পনেরো শো। তবু তারাই প্রথম আক্রমণ করলো। যুদ্ধ সুরু হলো।

অতর্কিত আক্রমণে সাদাকোর্তা দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। মৃতের স্তূপ জমে উঠলো দুই পাশে।

মার্কুইস দ্য লাঁতিনাকের সহকারী ইমানু ছুটে এলো। বললো, মঁসিয়, আমরা অতর্কিতে আক্রান্ত।

—যত শীঘ্র পারো ব্যারিকেড তৈরী করো। আর সেই ব্যারিকেডের আড়াল থেকে কামান দাগো।

—মঁসিয়, অকেজো মালপত্র ও স্ত্রীলোকদের আমি ইতিমধ্যেই ফুজারেতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেই তিনটি শিশু-বন্দীর কি করা হবে?

—তারা আমাদের জামিন। তাদের পাঠিয়ে দাও লা তুর্গ দুর্গে।

কথা শেষ করেই মার্কুইস ব্যারিকেডের দিকে ছুটে গেলো।

ব্যারিকেড প্রায় সম্পূর্ণ। দুই ছিদ্র পথে বসানো হয়েছে ষোল পাউণ্ডের দুটি কামান। একটির উপর ঝুঁকে পড়লো মার্কুইস স্বয়ং।

সুরু হলো অবিরাম তোপধ্বনি। হাতাহাতি সংঘর্ষের শেষ অধ্যায়।

ছিদ্রপথে গোভাঁকে লক্ষ্য করে মার্কুইস্ তিনবার তোপ দাগলো পর পর। তিনবারই তাঁর লক্ষভ্রষ্ট হলো।

এদিকে প্রমাদ গুনলো গোভাঁ! দুটি মৃত্যুগর্ভ কামানের সামনে তার মুষ্টিমেয় সৈন্য কতক্ষণ টিকবে? অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য নিয়ে একযোগে কি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে ব্যারিকেডের উপর? কিন্তু বার শো সৈন্য কি পাঁচ হাজার সৈন্যকে হটিয়ে দিতে পারে? তবে কি সে অপেক্ষাই করবে? তাতেও তো ধ্বংস অনিবার্য। উপায়?

বিদ্যুতের মতো একটা সমর-কৌশল খেলে গেলো গোভাঁর মাথায়। এ সহর তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। সে জানে পুরানো বাজারের যেখানটায় ভাঁদির সৈন্যরা ব্যারিকেড বানিয়ে আত্মরক্ষা করে আছে, তারি ঠিক পিছনে আছে সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা গলির একটা গোলকধাঁধা।

সহকারী ক্যাপ্টেন গেসাকে কাছে ডেকে গোভাঁ বললো, সম্মুখ-বাহিনীর ভার রইলো তোমার উপর। প্রাণপণ শক্তিতে তোপ দাগো। শত্রুপক্ষ যেন মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম না পায়।

গেসা ঘাড় নাড়লো।

গোভাঁ শুধালো, আমাদের ভেরীবাদকরা সব প্রস্তুত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ন'জন ভেরীবাদকের দু'জন তুমি রাখো। সাত জন চলুক আমাদের সাথে।

আতংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো গেসা, কোথায়?

তার কানে কানে কি যেন বলে গোভাঁ ডাকলো, বনেট রুজ।

সার্জেণ্ট রাদুব সহ বারো জন সৈন্য এসে দাঁড়ালো।

গোভাঁ বললো, সমস্ত সৈন্যদল আমি চাই।

—উপস্থিত। বললো রাদুব।

—বারো জন মাত্র?

—আমরা বারো জনই বেঁচে আছি।

—যথেষ্ট। সার্জেণ্ট, তোমার সৈন্যদের আদেশ করো—খড়ের দড়ি প্যাকিয়ে যার যার বন্দুক জড়িয়ে নিক ভালো করে। যেন ঠোকাঠুকি লাগলেও কোন শব্দ না হতে পারে।

অন্ধকারে কাজ চললো নিঃশব্দে।

গোভাঁ আদেশ দিলো, সৈন্যগণ, জুতো খোলো।

—জুতো আমাদের নেই।—উত্তর দিলো সার্জেণ্ট।

সজ্জিত হলো বাহিনী। বারো জন সৈন্য আর সাত জন ভেরীবাদক।

গোভা যোগ করলো বিংশতিতম প্রাণ। চেঁচিয়ে বললো, একজন করে দাঁড়াও সার বেঁধে। আমার পরেই ভেরীবাদক। তারপরে সৈন্যদল। পা ফেলো। চলো এগিয়ে।

অন্ধকারে এগিয়ে চললো কুড়িটি ছায়া মূর্তি—কুড়িটি প্রাণ। দুই পাশে অবিরাম গোলাবর্ষণ। ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ। বাতায়ন দীপহীন। সারা সহর স্তব্ধ—মৃত।

বিশ মিনিট নিঃশব্দ অভিযান। গোভার অগ্রগতি অভ্রান্ত। গলি শেষ হয়েছে। সামনে পুরানো বাজার। পথ খোলা। বাধা দেবার কেউ নেই। উনিশ জন সঙ্গীসহ সশস্ত্র গোভা। সম্মুখে পাঁচ হাজার ভাঁদি-বীর। কিন্তু তাদের মুখ দেখা যায় না—দেখা যাচ্ছে পিঠ।

বারো জোড়া হাতে বারোটি বন্দুক উদ্যত। সাত জোড়া হাতে ভেরী বাজাবার কাঠি।

গোভার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো রণ-নির্দেশ—গুলি চালাও। সঙীন উঁচু করো। ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুর বুকে।

সম্মুখে কামানের মুখে অবিরাম অগ্নিবর্ষণ। পিছনে বন্দুকের মৃত্যু-গর্জন। দুই আগুনের মাঝে শত্রুসৈন্য দিশেহারা।

পলায়ন। আত্মসমর্পণ। পরাজয়।

বিপ্লবী দল জয়ের উল্লাসে আত্মহারা। গোভা নীরব অচঞ্চল।

সহসা তার চোখে পড়লো—সেই হট্টগোল আর ধ্বংস-স্তূপের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে একটা লোক। তার এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে খোলা তলোয়ার। সর্বাঙ্গে ক্ষত-চিহ্ন! রক্তাপ্লুত দেহ।

গোভা এগিয়ে গেলো, আত্মসমর্পণ করো।

লোকটা চাইলো তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে।

গোভা বললো, তুমি আমার বন্দী।

লোকটি নিরুত্তর।

—তোমার নাম কি?

—'ছায়া-নর্ত্তক' বলে সবাই আমাকে ডাকে।

—সত্যি তুমি বীর।—বলে গোভা হাত বাড়ালো।

লোকটি অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলো, রাজা দীর্ঘজীবী হোক।

বলেই যথাশক্তিতে দুই হাত এক সঙ্গে তুলে এক হাতে পিস্তল ছুড়লো গোভার বুক লক্ষ্য করে, আরেক হাতে তরবারি হানলো গোভার মাথায়।

বিদ্যুৎ গতিতে ঘটলো এই বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু বিদ্যুৎতর গতিতে

ছুটে এলো এক অশ্বারোহী। দাঁড়ালো দু'য়ের মাঝখানে। গোভাঁর প্রাণরক্ষা হলো। কিন্তু পিস্তলের গুলিতে ঘোড়াটা মরলো। অশ্বারোহীর মুখে লাগলো তরবারির আঘাত। রাস্তার পাথরে লুটিয়ে পড়ে সে জ্ঞান হারালো।

গোভাঁ হাটু গেড়ে বসলো তার পাশে। সেই ফাঁকে পালিয়ে গেলো আক্রমণকারী। গোভাঁর সেদিকে খেয়াল নেই। আহত লোকটির দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বললো, কে এই মহাপ্রাণ ?

লোকটির সারা মুখ রক্তে লাল। চিনবার উপায় নেই। শুধু দেখা গেল সাদা চুল। গায়ে আলখাল্লা। মাথায় তিন-রঙা চিহ্ন। কোমরে পিস্তল ও তরবারি।

—এখানে কেউ কি একে চেনো না ?—প্রশ্ন করলো গোভাঁ। সবাই নীরব।

—দেখ তো এঁর পকেটে কোন কাগজপত্র আছে কিনা ?

একজন ডাক্তার আহত ব্যক্তির ক্ষত স্থান ধুইয়ে দিচ্ছিলো। সেই পকেটে হাত দিলো।

বের হলো একখানি চার-ভাঁজ করা কাগজ। তাতে লেখা : গণ-রক্ষা পরিষদ—নাগরিক সিমুরদ্যাঁ।

—সিমুরদ্যাঁ!—আর্তনাদ করে উঠলো গোভাঁ।

ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ মেললো আহত বৃদ্ধ।

তাঁর পায়ের উপর পড়ে গোভাঁ কেঁদে ফেললো, আপনি ? মাস্টারমশায় ?

—হ্যাঁ বাবা।—টেনে টেনে বললো সিমুরদ্যাঁ।

জনকয়েক সৈনিক এসে অভিবাদন করলো। তাদের সংগে একটি বুড়ো মানুষ। আহত, রক্তাক্ত দেহ।

সৈনিক বলল, সেনাপতি, এই লোকটিই আপনাকে গুলি করেছিলো। সকলের অলক্ষ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা সেলারে ঢুকছিলো। আমরা দেখতে পেয়ে ধরে এনেছি।

তার দিকে তাকিয়ে গোভাঁ বললো, তুমি আহত।

লোকটি কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিল, আমাকে গুলি করবার কোন অসুবিধা তাতে হবে না।

—লোকটাকে শুইয়ে দাও। ক্ষত স্থান বেঁধে দাও যত্ন করে। ওকে বাঁচিয়ে তোল।

—আমি মরতে চাই।

—আমি চাই তোমাকে বাঁচাতে। রাজার নামে তুমি চেয়েছিলে আমাকে খুন করতে ; প্রজাতন্ত্রের নামে আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।

সিম্বুরদ্যাঁর কপালে কিসের যেন ছায়া পড়লো। হতাশ ভাবে সে বললো নিজের মনে, দয়ালু—বড় বেশী দয়ালু এই ছেলেটা।

॥ ছয় ॥

হাসপাতালের একটা ছোট ঘরে শুয়ে আছে সিম্বুরদ্যাঁ একা।

চোখে ঘুম নেই। আঘাতের যন্ত্রণা আর মিলনের আনন্দে সে আত্মহারা। গোভাঁ ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। এতটুকু কিশোর এত বড় হয়েছে। হয়েছে মহাবীর। সিম্বুরদ্যাঁর মনের আকাশে অনেক স্বপ্নের রামধনু উঠলো ঝলমলিয়ে।

অনেক দিন আগেকার কথা।

সংসারে সর্বহারা একটি যুবক। বাপ-মা মারা গেছে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নেই। বিষয়-সম্পত্তির বালাই নেই।

অগাধ পণ্ডিত। ইওরোপের সবগুলি ভাষা সে জানে। দিন রাত পড়াশুনা করে। চিন্তা করে অবিরাম। ধ্যানগম্ভীর।

অনেক ভেবে পুরোহিতের একক জীবন সে বেছে নিলো। কিন্তু তাতেও শান্তি মিললো না। ধর্মের নামে মিথ্যাচার আর পুরোহিতের চোখ-ধাঁধানো খোলস তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো। সব ছেড়ে দিয়ে সে নেমে এলো পথে।

পরিবার হতে বঞ্চিত হয়ে সে ভালবাসলো দেশকে। জীবন-সঙ্গিনী ধরা দিলো না; তাই সে মনের রাখী বাঁধলো মানবতার সাথে। বিশ্ব-মানব-সাম্যের স্বপ্ন ধরা দিলো তাঁর চোখে। প্লেটোর বাণী তাঁকে হাতছানি দিলো।

এমনি সময়ে এক রাজ-পরিবারে তাঁর ডাক পড়লো গৃহ-শিক্ষকের কাজে। কিশোর ছাত্র। রাজবংশের উত্তরাধিকারী। যুবকের বঞ্চিত জীবনের রুদ্ধ ভালবাসার ঝর্ণা কিশোর ছাত্রকে কেন্দ্র করে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো সহস্র ধারায়। সে হলো একাধারে তার শিক্ষাদাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু—সব। এই কিশোর-চিত্তকে সে গড়ে তুলবে। মানুষ করবে। বিরাট পুরুষে রুপায়িত করবে।

ঘনিষ্ঠ জীবন যাপনে বন্ধন হলো ঘনিষ্ঠতর। কিশোর বাপ-মা-হারা। মানুষ করে এক অন্ধ ঠাকুরমা। সংসারের মালিক কাকা বিষয়-কর্মে ব্যস্ত। একা থাকে ভার্সাই সহরে। অতএব গৃহ-শিক্ষকের উপরেই পড়লো কিশোর-ছাত্রের সকল ভার।

শিক্ষক ছাত্রের ব্যবধান ঘুচে গেলো ক্রমে। বাঁধা হলো প্রাণের রাখী।

তারপর এলো অনিবার্য বিদায়ের দিন।

পাঠ সাঙ্গ হলো। কিশোর হলো যুবক। ক্যাপ্টেনের পদ নিয়ে চলে গেলো কোন্ সুদূরে সেনানিবাসে।

আর শিক্ষক? পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে সেও ফিরে এলো রিক্ত পৃথিবীতে। গির্জার একতলা ঘরে পাতলো শূন্য আসন।

এলো বিপ্লবের কালো মেঘ। ঝড় উঠলো আকাশ আচ্ছন্ন করে। শিক্ষকের বেদনা-বিক্ষুব্ধ অন্তরে বেজে উঠলো স্বপ্ন-বাঁশরী। সেও ছুটে এলো পথে। বিপ্লব-পথিক।

অনেক সূর্যোদয় আর রাতের আঁধার পার হয়ে…বহু পথে পথে পদচিহ্ন এঁকে আর এক রক্তাক্ত কালো রাতে আবার দেখা হলো শিক্ষক ও ছাত্রে।…

হাসপাতালের রোগশয্যায় শুয়ে বৃদ্ধ সিমুরদ্যাঁ স্বপ্ন দেখছে বীর গোভাঁর মুখচ্ছবি।

বিচিত্র কালের গতি।…

॥ সাত ॥

দেখতে দেখতে এলো অগস্ট মাস।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ফরাসী ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা লেখা হয়ে গেছে। বিপ্লবের অন্যতম হোতা ম্যারাত্ প্রাণ দিয়েছে গুপ্ত-ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে। চার্লোতি কোর্দার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এদিকে দোলের নৈশ-যুদ্ধ শোচনীয় পরাজয়ের পর ভাঁদির সৈন্যদলের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে বার বার তাদের হার হয়েছে। প্রজাতন্ত্রীদলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে নিঃসন্দেহ। তাই এবার শুরু হয়েছে খণ্ড যুদ্ধ—বনে, জঙ্গলে, দুর্গ-প্রাকারের অন্তরালে।

মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক তাঁর দলবলসহ আশ্রয় নিয়েছে গোভাঁ-পরিবারের বাসভবন ফুজারের অন্তর্গত লা তুর্গ দুর্গে। আর ভাইকাউণ্ট গোভাঁ সদলে অবরোধ করেছে সেই দুর্গ।

দুর্গের চারদিকে বিপ্লবী সেনাদল আস্তানা পেতেছে। শিবির পড়েছে পর পর। দুর্গের বাইরে যাবার পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ।

ওদিকে গার্নসির দরিয়ায় নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছে বৃটিশ নৌ-বহর। জেনারেল ক্রেগ তাদের অধিনায়ক। মার্কুইস দ্য লাঁতিনাকের একটি ইঙ্গিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে ফ্রান্সের মাটিতে।

কিন্তু কোন্ পথে যাবে সেই ইঙ্গিত?

মার্কুইস দ্য লাঁতিনাক লা তুর্গ্‌ দুর্গে অবরুদ্ধ। একটি পিঁপড়েরও দুর্গ হতে বের হবার পথ নেই। চতুর্দিকে বিপ্লবী বাহিনীর সতর্ক শ্যেন-দৃষ্টি।

লা তুর্গ্‌।

বিরাটকায় গোলাকার দুর্গ। একটা খাঁড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে সোজা মাথা তুলেছে আকাশে। আজ তার অতীত গৌরব বিলুপ্তপ্রায়। বহিঃ-প্রাচীরে ফাটল ধরেছে। ভেঙে পড়েছে অনেক খিলান আর গম্বুজ। চুনকাম খসে খসে পড়ছে। তবু লা তুর্গের দিকে চাইলে মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে ওঠে—যেন নেশা লাগে। সীমাহীন বিরাটত্ব আর অপরাজেয় শক্তির প্রতীক। বিধ্বস্ত হলেও ভয়াবহ!

রাতের আঁধার নেমেছে ফুজারে অরণ্যের বুকে। লা তুর্গ্‌ দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে ভীমকায় প্রেতের মত। তার খোলা জানালা দিয়ে ঠিকরে আসছে আলো! প্রেত-দেহের সহস্র জ্বলন্ত চোখ যেন।

দুর্গের চূড়া থেকে অকস্মাৎ কর্কশ রবে শিঙা বেজে উঠলো। রাতের স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো।

দুর্গের নীচে থেকে উত্তর দিলো রণভেরীর শব্দ।

দুর্গ-চূড়া হতে আবার বেজে উঠলো শিঙা।

নীচ থেকে আবার উত্তর দিলো রণভেরী।

দুর্গ-চূড়ায় দেখা দিলো একটি ছায়া-মূর্তি। বাতাসে ভেসে এলো তার কণ্ঠস্বর, এইবার তাহলে আমার বক্তব্য শুরু করি?

অন্ধকার সেনা-শিবির হতে উত্তর এলো, স্বচ্ছন্দে।

—শোন তাহলে। মার্কুইস দ্য লাঁতিনাকের সহকারী আমি গুজ্‌-লে-বুয়াঁ কথা বলছি। আমার আর এক নাম 'ব্রিস-ব্লু', কারণ তোমাদের মতো নীলকোর্তাদের ধ্বংস করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। গ্রেনভিলের যুদ্ধে আমার একটি আঙুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তোমাদেরই কারও তরবারির আঘাতে। লাভালে তোমরাই গিলোটিনে ফেলে হত্যা করেছ আমার বাবাকে, মাকে, আমার আঠারো বছরের বোন জ্যাকুলাইনকে। সেই আমি কথা বলছি মার্কুইস্‌ গোভাঁ দ্য লাঁতিনাকের পক্ষ থেকে। তিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মুখ দিয়ে তিনিই কথা বলছেন।

এইবার শোন আসল কথা। আমাদের হাতে তিনটি শিশু-বন্দী রয়েছে। তোমাদেরই কোন সেনাদল তাদের পোষ্য নিয়েছে। সুতরাং তারা তোমাদের লোক। সেই তিনটি শিশুকে তোমাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই। কিন্তু এক শর্তে। আমাদের স্বাধীনভাবে এই দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে দিতে হবে।

যদি তোমরা এই প্রস্তাবে রাজী না হও, তাহলে মাত্র দুটি পথে তোমরা এই দুর্গ আক্রমণ করতে পারবে। এক—বনের দিকটা, সেখানে বুরুজের খানিকটা দেয়াল ভাঙা আছে। আর—দুর্গ-প্রবেশের সেতু-পথে। ওই সেতু-পথের উপরের দালানটি তিন-তলা। নীচের তলায় আমি নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছি ছয় পিপে আলকাতরা আর একশো বোঝা শুকনো কাঠ। সমস্ত দোতলাটা কাগজ-পত্রে ভর্তি। আর তেতলায় বোঝাই রয়েছে খড়। সেতু-পথ আর মূল দুর্গের মাঝখানে আছে একটি দুর্ভেদ্য লোহ-দ্বার। কামানের গোলাও সে দরজা ভাঙতে পারবে না কোন দিন। লোহ-দ্বারের চাবি রয়েছে স্বয়ং মঁসিয়র হাতে।

সেই লোহ-দ্বারের নীচ দিয়ে আমি কাটিয়েছি একটি সরু গর্ত। সেই গর্ত-পথে বসিয়েছি একটি গন্ধকের শলা। তার এক দিক রয়েছে আলকাতরার পিপের সাথে যুক্ত, অপর দিক রয়েছে মূল দুর্গে আমার হাতের কাছে। ইচ্ছা করলেই যে-কোন মুহূর্তে আমি সেই গন্ধকের শলায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারি।

দুর্গ-নীচের বন্ধুগণ, এখন ভেবে দেখ,—যদি তোমরা আমাদের বাইরে যেতে না দাও, তাহলে বন্দী শিশু তিনটিকে আমরা রেখে দেব সেতু-পথের উপরকার তিন-তলা দালানের মাঝের তলায়। তার নীচের তলায় থাকবে আলকাতরার স্তূপ আর উপরের তলায় থাকবে খড়। গন্ধক-শলার একটা দিক থাকবে আমাদের হাতে। আর বহির্গমনের একমাত্র পথ ওই লোহ-দ্বার আমরা দেব বন্ধ করে।

তারপরে—

তোমরা যদি সেতু-পথে আক্রমণ কর, ওই দালানে তোমরাই আগুন জ্বালাতে বাধ্য হবে। আর যদি পিছনের বুরুজের ভাঙা দেয়াল তোমরা আক্রমণ কর, তাহলে আমরা আগুন ধরাব ওই দালানে। যদি তোমরা একযোগে দুই পথেই আক্রমণ কর, আমরা দুজনেই ওই দালানে আগুন জ্বালাব এক সঙ্গে। অর্থাৎ শিশু তিনটির ধ্বংস অনিবার্য। এখন বলো,—আমাদের প্রস্তাবে তোমরা রাজী কি গররাজী। যদি রাজী হও আমরা বেরিয়ে যাব এই দুর্গ থেকে। যদি গররাজী হও, শিশু তিনটি মরবে। ব্যস্, আমার বক্তব্য শেষ।

দুর্গ-চূড়া স্তব্ধ হলো।

নীচ থেকে ধ্বনিত হলো জবাব, আমরা গররাজী।

কর্কশ, কঠিন, স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কোমল কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের জন্যে আরও চব্বিশ ঘণ্টা সময় তোমাদের দিলাম। আগামী

কাল ঠিক এই সময়ের মধ্যে যদি তোমরা আত্মসমর্পণ না কর তাহলে আমরা আক্রমণ চালাব।

প্রথম কণ্ঠস্বর নীচ থেকে বললো আবার, আর সে আক্রমণ হবে নির্মম—নিষ্ঠুর।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হলো দুর্গ চূড়ায়। ম্লান চন্দ্রালোকে ফুটে উঠলো তার মুখ—মাকুইস দ্য লাঁতিনাক।

বিস্মিত কণ্ঠে সে বললো, একি? পুরোহিত, আপনিও ওই দলে?

নীচের কঠিন কণ্ঠস্বর জবাব দিলো, হ্যাঁ দেশদ্রোহী; আমিও ঐ দলে।

নীচের কঠিন কণ্ঠস্বর বৃদ্ধ সিমুরদ্যাঁর।

আর কোমল কণ্ঠস্বরের মালিক তরুণ গোভাঁ।

শুধু কণ্ঠস্বরে নয়, দুজনের প্রকৃতি ও নীতিতেও এই তফাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট। একজনের প্রকৃতি তীব্র, তীক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ; অপরের প্রকৃতি কোমল; কান্ত, মধুর। একজনের পথ হৃদয়হীন কর্তব্য; অপরের পথ প্রাণস্পর্শে সজীব। একজন সেনাপতি; অপর জন নাগরিক-প্রতিনিধি।

দুজনের মধ্যে ভালোবাসা গভীর! শিক্ষক ও ছাত্র। পিতা ও পুত্র।

কিন্তু দুয়ের মধ্যে নীতির পার্থক্য বুঝি বা গভীরতর। দুজনই ভাঁদি-বিদ্রোহ দমনে কৃতসংকল্প। দুজনই পথিক বিপ্লব-পথের। কিন্তু ভিন্ন তাদের অস্ত্র। সিমুরদ্যাঁর হাতে ধ্বংসের বজ্র; গোভাঁর লক্ষ্য বিজয়লাভ।

দুজনই সর্বশক্তিমান। গণ-নিরপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি সিমুরদ্যাঁ। রোবেস্‌পিয়র, দাঁতন ও ম্যারাত্‌ স্বাক্ষরিত ক্ষমতা-নামা তাঁর হাতে। দোল-বিজয়ী বীর গোভাঁ। সৈন্য-শক্তি তাঁর হাতে।

নীতির বিরোধ একদিন ফুটে বেরুলো ঘরোয়া আলোচনাকে কেন্দ্র করে।

সিমুরদ্যাঁ জিজ্ঞাসা করলো, লাঁতিনাককে বন্দী করে কি করবে?

—গুলি। উত্তর দিলো গোভাঁ।

—না, তাকে গিলোটিন করতে হবে।

—আমি কিন্তু সামরিক মৃত্যুর পক্ষপাতী।

—আমি পক্ষপাতী বৈপ্লবিক মৃত্যুর।

পরক্ষণে গোভাঁর মুখের উপর চোখ রেখে সিমুরদ্যাঁ শুধালো, সেণ্ট-মারি-লা-ব্রাঁ-র গির্জার সন্ন্যাসিনীদের তুমি ছেড়ে দিলে কেন?

—স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করি না।

—লুভাতে যাদের বন্দী করা হয়েছিলো সেই সব ধর্মান্ধ বুড়ো পুরুতদের কেন তুমি বিপ্লবী-বিচারশালায় পাঠাও নি?

—বুড়ো মানুষের বিরুদ্ধেও আমি যুদ্ধ করি না।

—কিন্তু বুড়ো পুরুত যুবক পুরুতের চেয়েও মারাত্মক। সাদা চুল আর কুঁচকানো মুখের উপর মানুষের অটল বিশ্বাস। এতটা দয়ালু হয়ো না গোভাঁ। টেম্পল্ টাওয়ার-এর উপর কড়া নজর রেখো।

—'টেম্পল টাওয়ার!' ডফিনকে আমি কারাগার থেকে মুক্তি দেব। শিশুর বিরুদ্ধেও আমার যুদ্ধ নয়।

সিমুরদ্যাঁর চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠলো, দ্যাখো গোভাঁ, স্ত্রীলোক যখন মারি-আঁতয়নেত্ হয়, বৃদ্ধ যখন হয় ষষ্ঠ পায়াস বা পোপ, আর শিশু যখন দেখা দেয় লুই কাপেত্-এর রূপে,—তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।

—আপনি আমার গুরু। আপনি তো জানেন, আমি রাজনীতিক নই।

—তবে কি লাঁতিনাককে ক্ষমা করবে?

—না।

—কেন? তার বিরুদ্ধেও তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়। সে তোমার আত্মীয়।

—ফ্রান্স আমার আত্মীয়তম।

—লাঁতিনাক বৃদ্ধ।

—লাঁতিনাক দেশত্যাগী। তাই তাঁর বেলায় কোন বয়সের বিচার নেই। লাঁতিনাক ডেকে এনেছে ইংরেজদের ফ্রান্সের মাটিতে। লাঁতিনাক আক্রমণের প্রতীক। লাঁতিনাক দেশের শত্রু। তাঁর আর আমার মধ্যে যে শত্রুতা, একজনের মৃত্যু ছাড়া তার অবসান হতে পারে না।

—গোভাঁ, তুমি প্রতিজ্ঞা করছ?

—হ্যাঁ, করছি।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। কি দেখছে দুজন দুজনের চোখে?

কথা বললো গোভাঁ, নর-রক্তে চিরকাল লাল হয়ে থাকবে এই দিনগুলি—রক্তরাঙা সতেরো শো তিরানব্বই।

সিমুরদ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, খুব সাবধানে পা ফেলো গোভাঁ। পৃথিবীতে নির্মম কঠোর কর্তব্যও আছে। অকারণে কাউকে দোষী করো না। মহাবিপ্লবের দিনে আমাদের বাস। এই বিপ্লবের চরমতম শত্রু পুরনো পৃথিবী। দয়ার স্থান এখানে নেই। প্রাণঘাতী রোগের বিরুদ্ধে চিকিৎসা-বিদের যে সংগ্রাম, সেখানে দয়ার স্থান আছে কি? গ্যাংগ্রিনে অস্ত্রপ্রচার করতে সার্জন কি মায়া করে? বিপ্লব নির্মূল করে রাজার রাজশক্তি, অভিজাতের আভিজাত্য, সৈনিকের অত্যাচার, পুরোহিতের অন্ধ বিশ্বাস,

বিচারকের বর্বরতা। এ কাজ ভয়ানক। বিপ্লব অকম্পিত হাতে তাই সমাধা করে। বিপ্লব ধরণী-দেহের গ্যাংগ্রিনে অস্ত্র চালায়। দূষিত অংশকে কেটে বাদ দেয়। তাই এত রক্তপাত। আজকের দিন তাই রক্তাক্ত।

ধীর গলায় গোভাঁ বললো, যে-সার্জন অস্ত্রপ্রচার করে তাকে দেখি ধীর, স্থির, প্রশান্ত। কিন্তু বিপ্লবের পুরোভাগে যাঁদের দেখছি, তারা অশান্ত, উচ্ছৃংখল।

সিমুরদ্যাঁ জবাব দিলো, নির্মম কর্মীকেও বিপ্লবের প্রয়োজন। হাতিয়ার ধরতে যে-হাত কাঁপে বিপ্লব তাকে দূরে করে দেয়। দাঁতন ভয়ংকর। রোবেসপিয়র অটল। ম্যারাত চির-রুষ্ট। তাঁদেরই আজ প্রয়োজন। সারা ইওরোপ তাঁদের দিকে চেয়ে আতংকে শিউরে উঠবে।

—হয়তো অনাগত ভবিষ্যৎও সন্ত্রাসে কাঁপবে এঁদের স্মরণ করে।

—বিপ্লবের মধ্যেই একদিন এই সন্ত্রাসবাদের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে।

—কে জানে, হয়তো এই সন্ত্রাসবাদই কলংক-কালিমা এঁকে দেবে বিপ্লবের ললাটে।

একটু থেমে গোভাঁ বলতে লাগলো স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠে, সাম্য. মৈত্রী, স্বাধীনতা। শান্তি ও মিলনের এই বাণীকে কেন আমরা মানুষের আতংকের কারণ করে তুলবো? আমরা চাই বিশ্ব-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ভয় দেখিয়ে কি এত বড় কাজ হবে? জুজুবুড়ী দেখিয়ে কি মানুষের মনকে টানা যায়? যায় না। মন্দের পথে ভালোর আবির্ভাব হয় না। রাজার মৃত্যু হোক, কিন্তু বাঁচুক জাতি। মুকুট ভেঙে যাক, মাথা থাক উঁচু। বিপ্লব শান্তি, ভীতি নয়। মানব-সাহিত্যের সুন্দরতম কথাই তো মুক্তি। পরাজিতকে যদি ক্ষমা না করতে পারি, তাহলে জয়লাভের সার্থকতা কোথায়? সমর-ক্ষেত্রে আমরা শত্রুর শত্রু, কিন্তু জয়লাভের পরে আমরা তার ভাই।

সিমুরদ্যাঁ আবার বললো, খুব সাবধান গোভাঁ। তুমি আমার পুত্রাধিক প্রিয়। তাই বলছি—সাবধান। যে সংকটকালের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি তাতে ক্ষমা অনেক সময় বিশ্বাসভঙ্গেরই নামান্তর।

আড়াল হতে যদি কেউ এই দুটি মানুষের আলোচনা শোনে তাহলে হয়তো কল্পনা করবে—কথা বলছে কুঠার আর তরবারি।

* * *

অপরিচিত পথ ধরে এগিয়ে চলেছে একটি ভিখারিণী। ছিন্ন বাস। রুক্ষ কেশ। খালি পা ফেটে ঝরছে রক্ত ধারা।

রাত-দিন সে চলেছে। কখনো ভিক্ষা করে, কখনো বা ফলমূল খেয়ে সে এগিয়েই চলেছে। কেউ আশ্রয় দিলে থাকে। না হয় তারায় ভরা আকাশের তলে রাত কাটায়। ঝড়-জল উপেক্ষা করে অবিরাম পথ চলে।

পথে যাকে পায় তাকেই শুধায়, হ্যাগা, তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে কোথাও দেখেছ ?

সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—দেখো নি ? দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে ?

কেউ জবাব দেয় না দেখে ভিখারিণী আবার বলে, তিনটি ছেলেমেয়ে গো—রেনি-জাঁ, গ্রেস-আলাঁ আর জর্জেত। দেখো নি তাদের ?

পথিকরা যে যার কাজে চলে যায়। ভিখারিণী কখনো কাঁদে, কখনো বুক চাপড়ায়।

একদিন একটি কৃষক তাকে শুধালো, তিনটি ছেলেমেয়ে বলছ না ?

—হ্যাগো।

—দুটি ছেলে ?

—আর একটি মেয়ে।

—হুঁ। শুনেছি বটে একজন মালিক তিনটি ছেলেমেয়েকে আটকে রেখেছে।

ভিখারিণী চীৎকার করে উঠলো, কোথায় সে ? কোথায় তারা ?

—লা তুর্গ দুর্গে।

—সে কত দূরে ?

—তা জানি না।

—কোন্ দিকে ?

—ঠিক জানি না। তবে শুনেছি ফুজারের দিকে।

—কোন্ পথে যাব ?

—সোজা চলে যাও পশ্চিম দিকে।

ভিখারিণী ছুটলো সূর্যাস্তের পানে।

পিছন হতে কৃষক চেঁচিয়ে বললো, কিন্তু সাবধান। সেখানে এখন জোর লড়াই চলেছে।

ভিখারিণী এগিয়ে চললো।

একটি গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখা হলো এক কৃষাণীর সাথে।

ভিখারিণী শুধালো, হ্যাগো, লা তুর্গ যাবো কোন্ পথে ?

কৃষাণী চমকে উঠলো লা তুর্গের নামে। বললো, জানি না। আর জানলেও বলবো না। সে বড় খারাপ জায়গা। কেউ সেখানে যায় না।

—কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে। আমার বাছারা যে সেখানে আটক আছে।

ভিখারিণীর দুচোখে নামলো অশ্রুধারা।

কৃষাণীর দয়া হলো। যাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে বললো, না জানি কত দিন তোমার খাওয়া হয় নি। নাও, এই রুটিখানা খেয়ো।

হাত পেতে কালো রুটিখানা নিয়ে ভিখারিণী আবার ছুটলো।

গ্রামের শেষ প্রান্তে তিনটি উলঙ্গ শিশুকে দেখতে পেয়ে রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে গেলো তাদের দিকে।

কাছে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো নিজের মনে, এ যে দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে।

হাতের রুটিখানা তাদের দিয়ে ভিখারিণী সামনের জংলা পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এই ভিখারিণী সন্তানহারা মিসেল ফ্লেসার।

॥ আট ॥

পরদিন। সূর্য অস্তাচলে। চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। প্রতীক্ষিত মুহূর্ত সমাগতপ্রায়।

ঝড়ের মুখে বিরাট বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছে গোভাঁ—স্থির, অচঞ্চল। পাশে দাঁড়িয়ে সহকারী গেসাঁ।

সার্জেণ্ট রাদুব এসে অভিবাদন জানালো।

—কি সংবাদ সার্জেণ্ট রাদুব?

—'বনেট রুজ' বাহিনীর পক্ষ হয়ে আপনার কাছে একটি নিবেদন জানাতে এসেছি।

—অসংকোচে বলো।

—আমাদের মরবার অনুমতি দিন সেনাপতি।

—অর্থাৎ?

—লা তুর্গ আক্রমণের প্রথম অধিকার আমরা প্রার্থনা করি।

—কিন্তু তোমাদের আমি রিজার্ভ রাখতে চাই সর্বশেষ আঘাত হানবার জন্যে।

—সকলের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার অধিকার প্যারির চিরদিনের গৌরব। আর তাছাড়া—ভেবে দেখুন সেনাপতি—আমাদেরই তিনটি শিশু-সন্তান ওই দুর্গে আটক রয়েছে। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। হয় তাদের রক্ষা করব, না হয় প্রাণ দেব।

উল্লসিত কণ্ঠে গোভাঁ বললো, তাই হোক সার্জেণ্ট, তাই হোক। তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তোমাদের দ্বাদশ বীরকে আমি দুই দলে ভাগ করব। একদলে থাকবে পুরোভাগে, আর একদল সর্বপশ্চাতে।

—আর আমিই কি থাকব তাদের অধিনায়ক?

—নিশ্চয়।

—ধন্যবাদ সেনাপতি। আমি থাকব সকলের আগে।

আর একবার অভিবাদন জানিয়ে সার্জেন্ট রাদুব চলে গেলো।

গোভাঁ পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলো। গেসাঁ-র কানে কানে বললো কয়েকটি কথা। আক্রমণকারী সেনাদল তৈরী হতে লাগলো একে একে।

এখনই সুরু হবে সংগ্রাম। চরম সংঘর্ষ।

সিমুরদ্যাঁর মন গভীর উল্লাসে শান্ত। লাঁতিনাকের মৃত্যুতে হবে ভাঁদির মৃত্যু। আর ভাঁদির মৃত্যুতে রক্ষা পাবে ফ্রান্স। কী আনন্দ!

সঙ্গে সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তার কালো ছায়া নেমে এলো তাঁর মুখে। বড় ভীষণ আসন্ন সংগ্রাম। গোভাঁ হবে তার সেনাপতি। যুদ্ধের নামে সে পাগল। যদি শত্রুর অস্ত্রাঘাতে সে মরে? গোভাঁ যে তাঁর পুত্রোপম শিষ্য। বিশাল জগতে তাঁর একমাত্র স্নেহ-বন্ধন।

বিচিত্র নিয়তি। তাঁর জীবনের দুই পাশে গোভাঁ-পরিবারের দুই বংশধর। একজনের মৃত্যু তাঁর কাম্য, অপরের জীবন তাঁর কাছে প্রিয়তম।

কি ভেবে সিমুরদ্যাঁ উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে চললো ভেরীবাদকের দিকে।

অকস্মাৎ বেজে উঠলো রণভেরী। দুর্গ চূড়ায় প্রত্যুত্তরে হলো শিঙা-ধ্বনি। আবার বাজলো রণভেরী। বাজলো শিঙা।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালো গোভাঁ। ফিরে তাকালো কর্মব্যস্ত সেনাদল। সিমুরদ্যাঁ এগিয়ে গেলো দুর্গের নীচে। তাঁর হাতে একখানি সাদা রুমাল। সিমুরদ্যাঁ বলে উঠলো, দুর্গবাসিগণ, আমাকে চিনতে পার কি?

উপর হতে ভেসে এলো ইমানুর স্বর, চিনি।

—আমি গণ-নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিভূ।

—তুমি পুরোহিত।

—আমি ন্যায়ের প্রতিনিধি।

—তুমি স্বধর্মত্যাগী।

—আমাকে পেলে কি তোমরা খুসি হও?

—এখানে আমরা আঠারো জন আছি। তোমার মাথার বিনিময়ে আঠারোটা মাথা দিতে রাজী।

—বেশ। আমি আত্মসমর্পণ করছি তোমাদের কাছে।

উপর হতে ভেসে এলো উন্মাদ অট্টহাস্য, বেশ, চলে এস তাহলে।

—কিন্তু এক শর্তে।

—কি?

—আমার বিনিময়ে লাঁতিনাককে দিতে হবে।

—কেন ?

—দ্যাখো, কি হবে এত রক্তপাত করে ? দুজনের প্রাণ বলি দিলে যদি গোলযোগ মেটে, কেন অকারণে এতগুলি নরহত্যা করবে ?

—দুজনের মানে ?

—লাঁতিনাকের আর আমার। ভেবে দ্যাখো ইমানু, এই দুজনের প্রত্যেকেই একশো—আমাদের কাছে লাঁতিনাক আর তোমাদের কাছে আমি। আমার প্রস্তাবে রাজী হও, সকলের জীবন রক্ষা হোক। লাঁতিনাককে দাও আমাদের হাতে, আর আমাকে নাও তোমরা। লাঁতনাককে আমরা গিলোটিনে চড়াব ; আমাকে নিয়ে তোমরা করো যা তোমাদের খুশি।

ভেসে এলে উন্মাদ অট্টহাসি, তুমি শুধু শয়তান নও, তুমি পাগল। মঁসিয়কে ছেড়ে দেব তোমাদের হাতে ? অসম্ভব।

—অন্যথায় ফল হবে ভয়াবহ।

—আমরা প্রস্তুত।

—বেশ, তবে তাই হোক।

সংগ্রাম শুরু হলো। এক দিকে সাড়ে চার হাজার বিপ্লবী সৈনিক। কামান-বন্দুক-অস্ত্রে সুসজ্জিত। অন্য দিকে সুদৃঢ় দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে অবরুদ্ধ ঊনিশটি বীর সেনানায়ক—সমরে দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুরতায় অদ্বিতীয়।

গোভাঁর নির্দেশক্রমে আক্রমণ শুরু হলো দুর্গের পিছনকার বুরুজের ভগ্ন-প্রাচীরের পথে।

এই দুর্গে গোভাঁ মানুষ হয়েছে ছোটবেলায়। তার অলিগলির সন্ধান সে জানে। দশ হাত পুরু এই দেয়াল। অনর্গল কামান দেগেও এর কিছু করা যাবে না। কাজেই কামানের যুদ্ধ এখানে নিরর্থক। দূর পাল্লার যুদ্ধ এখানে অচল। চালাতে হবে হাতাহাতি যুদ্ধ। একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দুর্গের ভিতরে। কুড়ুল, ছোরা, পিস্তল, হাত আর দাঁত—এই এ যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্র। দংশন-ক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুজে ভুজঙ্গ সনে।

সামনের সেতু-পথে আক্রমণ করা অসম্ভব। তিনটি শিশুর জীবন তাহলে বিপন্ন হবে। পণ্ড হবে সব আয়োজন।

বুরুজের ভগ্ন-প্রাচীরই তাই একমাত্র পথ।

প্রাচীর পার হলেই একতলার হল। হলের মাঝামাঝি আর একটি প্রাচীর এমন সুকৌশলে তৈরী করা হয়েছে যে, এক দিকে তাতে দোতলায় উঠবার ঘোরানো সিঁড়িটা সুরক্ষিত হয়েছে, অন্য দিকে আবার তার পিছনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে সেই প্রাচীরের ছিদ্রপথে শত্রুদলকে আক্রমণ করা চলে নিরাপদ-অন্তরালে থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই একতলার মাথায় একটা ছোট গোল ঘর—নানা অস্ত্রশস্ত্রে সাজানো। কবেকার কোন্ শত্রু-পক্ষের গোলাবর্ষণে এই গোল-ঘরের দেওয়ালে একটা গর্ত হয়ে আছে। সেই ছিদ্রপথে চাঁদের আলো পড়ে অস্ত্রশস্ত্র-গুলো ঝক্‌মক্ করছে।

গোল ঘর থেকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই তে-তলার গোল ঘর। এই ঘরের সঙ্গেই সেতু-পথের উপরকার দালানের যোগাযোগ। মাঝখানে লোহার দরজা। তাঁর নীচে ছিদ্র-পথে বসানো হয়েছে গন্ধক-শলা। পাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা মশাল।

অবরুদ্ধ লাঁতিনাক-দলের আয়োজনের ত্রুটি নেই। কিন্তু ত্রুটি তাদের মূল বস্তুতে—যথেষ্ট গোলা-বারুদ তাদের নেই। যথেষ্ট বারুদ যদি থাকতো, লা তুর্গ্ দুর্গ তারা উড়িয়ে দিতে পারতো শত্রুমিত্রসহ। যথেষ্ট বন্দুক-পিস্তল তাদের আছে। কিন্তু কার্তুজ নেই। সমস্ত কার্তুজ তারা বন্দুকে ভরে রেখেছে। কিন্তু সে কটা? কতক্ষণ?

দু পক্ষের উদ্যোগ-আয়োজন বিচার করলে পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে তাহলে এই দাঁড়ায়—

আক্রমণকারীদের পার হতে হবে একটি ভাঙা দেয়াল; দখল করতে হবে একটা ব্যারিকেড; শুধু গায়ের জোরে একে একে দখল করতে হবে তিনটি ঘর, আর বুলেটের ঝড়ের ভিতর দিয়ে বেয়ে উঠতে হবে দুটো ঘোরানো সিঁড়ি।

আর অবরুদ্ধদের সামনে রয়েছে প্রাণপণে লড়বার পর নিশ্চিত মৃত্যু।

ভীষণ—বীভৎস যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় চলেছে ভাঙা দেয়ালের গুহা-পথে। গুহাই বটে। দশ হাত লম্বা একটা সুড়ঙ্গ। চারদিকে ভাঙা ইট আর পাথর। গ্রানিট পাথরে মাথা ঠুকে যায়। পায়ের নীচে চুন-সুরকি ঝুরঝুর করে ঝরে। অন্ধকারে চোখে ধাঁধা লাগে। একটা হাঙর যেন অগুনতি দাঁত মেলে হাঁ করে আছে নররক্ত লালসায়।

তারই মধ্যে অবিরাম গুলি ছুটছে উনিশটা বন্দুকের মুখে। বিপ্লবী সৈন্য মরছে ঝড়ের পাতার মত। তাদের বুকের উপর দিয়ে চলেছে পিছনের সৈন্য।

—চীৎকার—আর্তনাদ—হাহাকার…

লাঁতিনাক চেঁচিয়ে উঠলো, নির্ভয়ে গুলি চালাও।

গর্জে উঠলো গোভাঁর বজ্রস্বর, আক্রমণ করো।

কানে এলো কার মৃদু ডাক, গোভাঁ!

গোভাঁ চমকে উঠলো, মাস্টারমশায়, আপনি কেন এখানে এলেন?

—আমি এসেছি তোমার কাছে।

—কিন্তু এখানে যে অনিবার্য মৃত্যু।

—তবে—তবে তুমি এখানে কেন ?

—আমার এখানে দরকার—আপনার নয়।

—কিন্তু তুমি যখন এখানে আছ, আমাকে তো থাকতেই হবে।

—না মাস্টারমশায়, না।

—হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ।

সিমুরদ্যাঁ কিছুতেই গোভাঁকে ছেড়ে গেলো না। হায় রে প্রাণ-বন্ধন !

রক্তের স্রোত আর স্তূপীকৃত শবের উপর দিয়ে যুদ্ধ এগিয়ে এলো হল ঘরে।

লাঁতিনাক দলের আর জন পনেরো অবশিষ্ট আছে। তার একজন—শাঁতে-অঁ-হাইবার—গুরুতর আহত। তার একটা চোখ ছুটে বেরিয়ে গেছে। কোন ক্রমে টলতে টলতে দোতলার গোল ঘরে সে আশ্রয় নিয়েছে। ছিদ্রপথের খোলা হাওয়ায় সে জোরে জোরে শ্বাস টানছে বসে।

কিন্তু অবাধ নরবলি চলছে ব্যারিকেডের সামনে। সে দিকে তাকিয়ে গোভাঁ শিউরে উঠলো। চেঁচিয়ে বললো, ব্যারিকেড আক্রমণ করো। কেউ কি এই ব্যারিকেডটা বেয়ে পার হতে পারে না ?

এগিয়ে এলো সার্জেণ্ট রাদুব, আমি পারি।

বলেই সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। অগ্রগামী বিপ্লবী বাহিনীকে ঠেলে ছুটে বেরিয়ে গেলো সুড়ঙ্গ-পথে।

পালিয়ে গেলো ? সার্জেণ্ট রাদুব কি পালিয়ে গেলো ভয়ে ?

দুর্গের বাইরে এসে চোখ মুছে দাঁড়াল রাদুব। ছুঁড়ে ফেলে দিলো হাতের বন্দুক। খুলে ফেললো ঘাড়ের বেল্ট। খুললো কোট ও জ্যাকেট। খুললো জুতো। পিস্তল দুটো গুঁজে নিলো কোমরের বেল্টের নীচে। খোলা তলোয়ার কামড়ে ধরলো দাঁতের ফাঁকে। তারপর বেড়ালের মতো বেয়ে উঠতে লাগলো ফাটলধরা পুরনো দেয়াল।

হাত পঁচিশেক উঠে দেয়ালের গায়ে পেলো একটা গর্ত। কবেকার কোন্ শত্রুর গোলাবর্ষণে দেয়ালের খানিকটা আড়াআড়িভাবে ফেটে গেছে। একটা মানুষ অনায়সে তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে।

দু হাত একসঙ্গে গর্তের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এক ঝাঁকিতে রাদুব কোমর পর্যন্ত শরীরের অর্ধেকটা সহ দোতলার গোল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর একটা ঝাঁকিতেই সে নিরাপদ হবে।

কিন্তু শিকার-লোলুপ বাঘের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা লোক। বিদ্যুৎ-গতিতে সে এক হাতে খুলে নিলো রাদুবের কোমরের দুটো পিস্তল, অন্য হাতে নিলো তার যুদ্ধের তরবারি।

চমকে রাদুব মুখ তুললো। লোকটার মুখ বিকৃত বীভৎস। একটা চোখ নেই। চোয়াল ভাঙা। সারা মুখ রক্তে লাল। লাল মুখোস যেন আঁটা। সে-মুখের মালিক শাঁতে-অঁ-হাইবার।

মুহূর্ত বিলম্ব নয়। রাদুব এক ঝটকায় ঘরের মেঝেয় ঢুকেই উঠে দাঁড়ালো। সিংহের মতো ঝাপটে ধরলো শাঁতে-অঁ-হাইবারকে।

কিছুক্ষণ চললো ধ্বস্তাধ্বস্তি। একজন নিরস্ত্র। অপর জন সশস্ত্র। কিন্তু শাঁতে-অঁ-হাইবারের এক হাতে দুটো পিস্তল থাকায় সে গুলি ছুঁড়তে পারছে না। তার উপর সে আহত—দুর্বল। তার শরীর কাঁপছে থর্‌থর্‌ করে। তবু একবার প্রাণপণ শক্তিতে তরবারির আঘাত করলো রাদুবের গলা লক্ষ্য করে।

বিদ্যুৎ-গতিতে রাদুব তাকে ঠেলে দিলো এক ঝটকায়। তবু আঘাতের হাত থেকে সে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেলো না। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে তরবারির আঘাত লাগলো তার কাঁধে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

শাঁতে-অঁ-হাইবারও সে ধাক্কায় ছিটকে পড়লো পিছনের দেয়ালে। হাতের তরবারি ঝনঝন করে মেঝেয় পড়ে গেলো হাত থেকে। তাতে বুঝি তার ভালোই হলো। দুই হাতে সে বাগিয়ে ধরলো দুই পিস্তল। তখনও তার হাত কাঁপছে।

প্রথম পিস্তলের গুলিতে রাদুবের একটা কান উড়ে গেলা।

এইবার দ্বিতীয় পিস্তল।

কিন্তু আর নয়। রাদুব এমন জোরে তাকে ধাক্কা দিলো আবার যে হাতের পিস্তল ছিটকে পড়লো। গুলি লাগলো ঘরের সিলিং-এ। হিংস্র বাঘের মতো রাদুব দু হাতে চেপে ধরলো শাঁতে-অঁ-হাইবারের ভাঙা চোয়াল। তীব্র আক্রোশে তার মাথাটাকে মোচড়াতে লাগলো।

আর্তনাদ করে বেচারা সেখানেই ঢলে পড়লো। কয়েকবার হাত-পা-ছুঁড়লো। তারপর সব শেষ।

মেঝে থেকে তরবারিখানা কুড়িয়ে নিয়ে রাদুব এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। ঘরের এককোণে চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়ালো। পরপর সাজানো রয়েছে নানা অস্ত্র—পিস্তল, বন্দুক, তরবারি—কত।

আনন্দে বাঁ হাতের তালুতে একটা ঘুসি মেরে রাদুব দুই হাতে নিলো দুই পিস্তল। এক লাফে দরজার কাছে গিয়ে গুলি ছুড়লো দুবার। আবার নিলো একটা গাদা বন্দুক। লক্ষ্যহীন ভাবে ছুড়লো একে একে পনেরোটা গুলি। গুলির শব্দে পুরানো দুর্গ গম-গম করে উঠলো। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো রাদুব, জয়—প্যারির জয়।

আর একটি গাদা বন্দুক সিঁড়ির দিকে মুখ করে বাগিয়ে ধরে সে চুপ ক'রে দাঁড়ালো দরজার আড়ালে।

ব্যারিকেডের নিরাপদ আশ্রয়ে নীচের হল ঘরে এতক্ষণ যারা যুদ্ধ করছিলো, উপরে অবিরাম গুলির শব্দে আতংকে তাদের বুক কেঁপে উঠলো।

মার্কুইস চেঁচিয়ে বললো, শত্রুরা দোতলায় ঢুকে পড়েছে। মুহূর্ত দেরী না করে সবাই ছুটে যাও তে-তলার ঘরে। সেখান থেকেই সুরু হবে নতুন আক্রমণ।

সবাই ছুটলো উপরে। মার্কুইস সকলের শেষে। সে যে সেনাপতি। এই সাহসই তাঁকে এবারের মতো বাঁচালো।

গোল-ঘরের সামনের সিঁড়িতে যে-ই উঠে আসে, অজ্ঞাত হাতের অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে সেই ঢলে পড়ে। মার্কুইস যদি প্রথম ছুটত তেতলার দিকে, তারও মৃত্যু ছিলো অনিবার্য।

রাদুবের হাতের বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেলো। আর একটি বন্দুক আনতে সে পিছন ফিরলো। লাঁতিনাক-দলের অবশিষ্ট সৈনিকরা সেই ফাঁকে তেতলার ঘরে উঠে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় উঠে এলো গোভাঁ। সঙ্গে সৈন্যদল। শত্রুপক্ষের এই আকস্মিক পশ্চাদপসরণে তারা বিস্ময়ে বিমূঢ়।

হাসিমুখে অভিবাদন করলো সার্জেণ্ট রাদুব, আমি এখানে রয়েছি। দোল-যুদ্ধের কথা আমি ভুলিনি। দু-মুখো আক্রমণের নীতি তো আপনার কাছেই শিখেছি সেনাপতি।

গোভাঁ তাকে জড়িয়ে ধরলো, সাবাস সার্জেণ্ট রাদুব, সাবাস। অসাধ্য সাধন তুমি করেছ। কিন্তু একি? তোমার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। তুমি আহত।

—ও কিছু নয়। মানুষের কান একটা কম থাকলেই কি আর বেশী থাকলেই কি। আর অস্ত্রাঘাত? এতগুলি মানুষ মারতে একটু-আধটু কাটবেই তো।

ছুটতে ছুটতে উঠে এলো সিমুরদ্যাঁ। তাঁর হাতে লণ্ঠন। তেতলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে বললো, এইবার শেষ আঘাত।

লাঁতিনাক-দলের অবশিষ্ট মাত্র সাত জন। মার্কুইস ও ইমানু ছাড়া সবাই আহত। গোলা-গুলি ফুরিয়ে গেছে! কার্তুজের বাক্স শূন্যপ্রায়। সাত জনের ভাগে রয়েছে মাত্র চারটি গুলি।

অনিবার্য মৃত্যু। পালাবার পথ নেই। সেতু-পথের মুখে শত্রুপক্ষের ছয়টি কামান যমের মতো হাঁ করে আছে। নীচের সিঁড়িতে বহু মানুষের পদধ্বনি: মৃত্যুর পদশব্দ যেন।

গম্ভীর গলায় কথা বললো মার্কুইস, বন্ধুগণ, সব শেষ। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।

অকস্মাৎ তাদের পিছন হতে ধ্বনিত হলো কার অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর; কেমন ? আমি বলেছিলাম না মঁসিয় ?

অবাক বিস্ময়ে সকলে ফিরে তাকালো।

কেউ নেই কোথাও। শুধু দেয়ালের মাঝখানে একখানা পাথর ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে পাথরের দুই পাশে দুটি পথ খুলে গেলো। ছোট হলেও দুজন মানুষ তার ভিতর দিয়ে সহজেই ঢুকতে পারে।

সেই ফাঁকে দেখা দিলো একখানি মুখ।

মার্কুইস সহজেই চিনলো—যে মুখ হালমালোর।

—হালমালো, তুমি ?

—হ্যাঁ মঁসিয়। দেখলেন তো, সত্যি পাথর নড়ে। কিন্তু আর সময় নষ্ট করবেন না। চলে আসুন আমার সাথে। ওই গোপন সুরঙ্গ-পথে দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা গভীর বনে পেঁছে যাবো।

সঙ্গীরা এক সাথে বলে উঠলো, আপনি আগে যান মঁসিয়।

—না, তোমরা আগে যাও, তেমরা আহত।

—আবার কোথায় দেখা হবে ?

—পিয়ারে গোভের জঙ্গলে। কাল ঠিক দুপুরে। সবাই উপস্থিত থেকো। আজীবন আমরা এ-যুদ্ধ চালাবো।

ইমানু হালমালোর কাঁধে হাত রেখে শুধালো, কমরেড, এখান থেকে নিরাপদ জায়গায় পেঁছিতে কতক্ষণ লাগবে ?

—প্রায় এক কোয়ার্টার। কিন্তু আপনারা আর দেরী করবেন না মঁসিয়। আমি এই গুপ্ত পথ খুলতেই জানি, বন্ধ করতে পারি না। কাজেই শত্রুরা এখানে পেঁছবার আগেই আমাদের অনেক দূর চলে যেতে হবে। নইলে তারা যদি একবার সুরঙ্গ-পথে পিছু নেয়, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

এত কথা শুনবার অবসর ইমানুর নেই। সে তখন কর্মব্যস্ত।

ঘরের কোণায় ছিলো একটা মস্ত বড় ভারী ওক কাঠের বাক্স। এক কালে সেটাতে হয়তো জামাকাপড় রাখা হত। সেটাকে টেনে ইমানু বসিয়ে দিলো নীচে নামবার সিঁড়ির দরজার মুখে। শুধু মাথার দিকে খানিকটা ফাঁক রেখে দরজাটা সম্পূর্ণ আটকে গেলো।

মার্কুইস বললো : একটা কাঠের বাক্স দিয়ে সঙীন-বন্দুকধারী শত্রুকে পনের মিনিট আটকে রাখতে পারবে কে ?

—আমি।—উত্তর দিলো ইমানু।

—তুমি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের ছয় জনের মধ্যে পাঁচজন আহত। আমার গায় একটি আঁচড়ও লাগে নি।

—আমারও না।

—কিন্তু মঁসিয়, আপনি দলপতি আর আমি সৈনিক। দলপতি আর সৈনিক আলাদা।

—কিন্তু আমারও একটা কর্তব্য আছে।

—না মঁসিয়, আপনার আর আমার সম্মুখে আজ একই কর্তব্য—আপনার জীবন রক্ষা।

সংগীদের দিকে ফিরে ইমানু আরো বললো, কমরেড, এখন একমাত্র কাজ শত্রুদের পথ আটকে রাখা। তোমরা সবাই আহত। আমার শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্তও পড়ে নি। কাজেই এ-কাজের উপযুক্ত একমাত্র আমি। তোমরা পালাও। রেখে যাও তোমাদের অস্ত্র। আমি কথা দিচ্ছি, শত্রুদের আধ ঘণ্টা আমি আটকে রাখবোই।

সবাই চুপ।

আবার কথা বললো ইমানু, গুলিভরা পিস্তল কটা আছে?

—চারটি।

—মাটিতে রেখে দাও।

নীরবে তার আদেশ পালন করলো সকলে।

—বাস। আমি রইলাম শত্রুর সাথে কথা বলতে। তোমরা পালাও—পালাও।

বাইরে অগণিত পদধ্বনি। কাঠের বাক্সের উপর সঙীনের আঘাতের শব্দ। শব্দ হলো একটা পিস্তলের।

এক লাফে ইমানু ছুটে গেলো বাক্সের আড়ালে। হাঁটু গেড়ে বসলো দু হাতে দুটি পিস্তল ধরে।

মাথার উপর ঝুলছে মৃত্যুর খড়্গ। কথা বলবার সময় নেই।

—আসুন মঁসিয়।—বললো হালমালো।

পকেট থেকে পেন্সিল বের করে মার্কুইস কি যেন লিখলো নড়া পাথরের গায়। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেলো সুরঙ্গের অন্ধকারে।

ইমানু একা। বিপক্ষ দলে অগনিত সৈন্য। মাঝখানে একটি ওক কাঠের বাক্স। আঘাতে আঘাতে বাক্সের গায়ে দুটো ফুটো হয়েছে,—একটা নীচে, একটা উপরে। উপরের ছিদ্রপথে ইমানু দেখলো, একটা চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। গর্জে উঠলো তার হাতের পিস্তল। বাক্সের ও পাশে উঠলো মরণ-আর্তনাদ।

আবার ছিদ্রপথে চোখ রেখে দেখলো—একটা লোক সাপের মতো বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। তার পিছনে আর একটি।

গর্জে উঠলো তার হাতের পিস্তল। আর একটি আর্তনাদ শোনা গেলো। সৈনিক গড়িয়ে পড়লো বাঁকানো সিঁড়ি দিয়ে।

শূন্য পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইমানু হাত বাড়ালো তৃতীয় পিস্তল তুলতে।

সেই হাত মাঝপথে থেমে গেলো। তীব্র কণ্ঠে সে আর্তনাদ করে উঠলো।

কাঠের বাক্সের নীচেকার ছিদ্র-পথে একখানি অদৃশ্য হাতের শানিত কৃপাণ আমূল বিদ্ধ হয়েছে ইমানুর তলপেটে।

তবু সে লুটিয়ে পড়লো না মাটিতে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, আচ্ছা।

কোন মতে টলতে টলতে সে লৌহ-দ্বারের কাছে পেঁছিল। পাশেই মশাল জ্বলছে। বাঁ হাতে পেটের বেড়িয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি চেপে ধরে ডান হাতে কাত করে ধরলো জ্বলন্ত মশাল। লোহার দরজার নীচেকার গন্ধক-শলায় আগুন ধরে উঠলো।

মশাল ফেলে দিয়ে আবার হাতে নিলো পিস্তল। কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়লো মেঝেয় বিছানো পতাকার উপর। আর প্রাণপণ শক্তিতে ফুঁ দিতে লাগলো গন্ধক-শলায়।

আগুনের রেখা নাচতে নাচতে এগিয়ে চললো। পার হলো লৌহ-দরজা। ওপাশে সেতু-পথের উপরকার ঘরে আছে আলকাতরা আর শুকনো কাঠ।

ইমানুর মুখে ফুটে উঠলো ম্লান হাসি—এরা আমাকে চিরদিন মনে রাখবে। 'টেম্পল টাওয়ার'-এ বন্দী রাজ-শিশুর মন্দভাগ্যের প্রতিশোধ আমি নিলাম এই শিশু তিনটিকে হত্যা করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কাঠের বাক্সটাকে সশব্দে উল্টে ফেলে এক লাফে বেরিয়ে এলো রাদুব। হাতে খোলা তলোয়ার। চীৎকার করে সে বললো, কোথায় শয়তানের দল, এসো এইবার।

উত্তর এলো পিস্তলের শব্দে। একটা গুলি তার কনুইয়ের নীচ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে বিঁধলো।

—কে ?

—আমি ?

—তুমি আমার বন্দী।

—বটে!

ইমানু জ্বলন্ত গন্ধক-শলায় উপর কাত হয়ে পড়লো।

আগুনের শিখাটাকে আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে তার শেষ নিঃশ্বাস চিরতরে থেমে গেলো।

ঘরে ঢুকলো গোভাঁ ও সিমুরদ্যাঁ।

লণ্ঠনের আলোয় সিমুরদ্যাঁ দেখলো—দেয়ালের গায়ে গুপ্ত পথের মুখে এক খণ্ড ঘুরানো পাথর। তাতে লেখা :

বিদায়। লাঁতিনাক।

অপলক চোখে সিমুরদ্যাঁ প্রস্তর-ফলকের দিকেই চেয়ে রইলো।

॥ নয় ॥

একটা পাহাড়ের নীচে এসে সুড়ঙ্গ-পথ শেষ হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে মার্কুইস একা। হালমালো চলে গেছে।

সমস্ত পাহাড়টা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। দিনের পর দিন সেখানে আত্মগোপন করে থাকলেও কেউ টের পাবে না!

মার্কুইস পকেট থেকে ঘড়ি বের করলো। দশটা বাজে। রাত আটটায় সুরু হয়েছে প্রলয়-সংগ্রাম। দশটায় শেষ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, মাত্র একশো কুড়ি মিনিটে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। চিন্তিত পদক্ষেপে মার্কুইস পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

অকস্মাৎ একটা আর্ত চিৎকারে সমস্ত ফুজারে বনভূমি যেন কেঁপে উঠলো। মার্কুইস ফিরে তাকালো।

কাঁদছে এক ভিখারিণী। কাঁদছে সন্তানহারা জননী। কাঁদছে মিসেল ফ্লেসার।

লা তুর্গ দুর্গের সেতু-পথের উপরকার দালানের একতলায় আগুন লেগেছে। ছিদ্র-পথে জিহ্বা মেলেছে আগুনের লেলিহান শিখা। মৃত্যু-কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে।

ওই দালানের দোতলায় রুদ্ধদ্বার ঘরে রয়েছে তিনটি অসহায় শিশু : গ্রস-আলাঁ, রেনি-জাঁ ও জর্জেত্।

তাই বুকে করাঘাত করে কাঁদছে অভাগিনী জননী। চুল ছিঁড়ছে দুই হাতে। মাথা খুঁড়ছে মাটিতে আর কাঁদছে। কাঁদছে আর চীৎকার করছে : দোহাই ঈশ্বরের! রক্ষা করো—রক্ষা করো। আমার বাছাদের বাঁচাও। আগুন—আগুন—আগুন। আগুনে পুড়ে মলো আমার সোনার চাঁদরা। বাঁচাও—তাদের বাঁচাও। ওই যে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। কে আমার মানিকদের ওখানে রেখেছে? কোন্ সে পাপিষ্ঠ? ঈশ্বর তার বিচার করবেন। তার সব পুড়ে যাবে। ছাই হয়ে যাবে। ওরে আমার বাছারে!

দুর্গের নীচে লোক জড়ো হলো অনেক। সিমুরদ্যাঁ, গোভাঁ, রাদুব—সবাই এলো। কিন্তু নিরুপায়। কিছুই করবার উপায় নেই। অবস্থার চক্রে চার হাজার মানুষ সমবেত হয়েও তিনটি শিশুর প্রাণ বাঁচাতে অক্ষম।

পাহাড়ের মাঝপথে দাঁড়িয়ে মার্কুইস একবার পকেটে হাত দিলো। লোহ-দ্বারের চাবি ঠিকই আছে।

তারপর দ্রুত পা ফেলে নেমে এলো নীচে।

গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথে আবার সে ফিরে এলো তেতলার গোল ঘরে।

খুট্‌ করে একটা শব্দ হলো। বিরাট লোহ-দরজা সশব্দে খুলে গেলো। এক ঝলক কালো গরম ধোঁয়া লাগলো মার্কুইসের মুখে। মার্কুইসের ভ্রূক্ষেপ নেই। দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে চললো মাথা উঁচু করে।

বিমূঢ় জনতা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দোতলার জানালায়। অসহায় তিনটি শিশু ইতস্তত ছুটোছুটি করছে। হবে না—ওদের রক্ষা হবে না। থামবে না অভাগিনী জননীর চোখের জল।

সহসা সেই ঘরে দেখা দিলো দীর্ঘদেহ একটি মানুষ। আগুনের পটভূমিকায় তার মুখ কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু তার মাথার সাদা চুল উড়ছে বাতাসে।

সকলে চিনলো—সে লাঁতিনাক।

ক্ষণেকের জন্য বৃদ্ধ জানালা থেকে সরে গেলো। আবার এলো। তাঁর হাতে একটি মই। ঘরের মেঝেয় মইটি পড়ে ছিলো। মইটির এক মাথা দুই হাতে শক্ত করে ধরে লাঁতিনাক ধীরে ধীরে জানালা দিয়ে সেটাকে নীচে নামিয়ে দিলো।

সার্জেণ্ট রাদুব এগিয়ে গিয়ে ধরলো মাইটির অন্য মাথা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো; প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।

উপর হতে চেঁচিয়ে বললো মার্কুইস, রাজা দীর্ঘজীবী হোক।

রাদুব মুখ ভেঙেচে বললো, যত খুসি চেঁচাও তুমি। যা খুসি তাই বলো। আজ তুমি দয়ার অবতার।

মইটি ঠিক মতো বসানো হতেই কুড়িটি সৈনিক উঠে গেলো মই বেয়ে। রাদুব তাদের সকলের আগে।

দেখতে দেখতে রাদুবের হাত দোতলার জানালায় পেঁছিল।

মার্কুইস তার হাতে তুলে দিলো একটি শিশু। সে তাকে নামিয়ে দিলো নীচেকার সৈনিকের হাতে।

এমনি করে হাতে হাতে তিনটি শিশু ফিরে এলো ভিখারিণী জননীর বুকে। সে পাগলের মতো তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলো, আদর করে চুমো খেলো।

তারপর অতি আনন্দে বিকট চীৎকার করে তখনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

ধীরে ধীরে মই বেয়ে নামতে লাগলো মার্কুইস একা। তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই। সবাই আনন্দে মত্ত।

মার্কুইসের একটি পা যেমনি মাটিতে নেমেছে, অমনি তার কাঁধে কে যেন হাত রাখলো অতি সাবধানে।

মার্কুইস ফিরে তাকালো।

—আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি। বললো সিমুরদ্যাঁ।

—তথাস্তু। বললো লাঁতিনাক।

॥ দশ ॥

লা তুর্গ দুর্গের একটা অন্ধকার কুঠুরীতে লাঁতিনাক বন্দী।

এক পাশে জ্বলছে একটা মিটমিটে বাতি। এক কুজো জল। এক টুকরো রুটি। মেঝেতে বিছানো এক গাদা খড়। বন্দীর শয্যা।

পাশেই এক তলার হল ঘর। কিছুক্ষণ আগেই সেখানে চলছিলো মরণ-সংগ্রাম। এখন সেখানে বিরাজ করছে মৃত্যু-স্তব্ধতা।

রুদ্ধদ্বার কুঠুরীর সামনে সশস্ত্র প্রহরী। অনেক সৈন্য ইতস্তত ঘুমিয়ে আছে হল ঘর জুড়ে। বুরুজের ভাঙা দেয়ালের বাইরে প্রবেশ-মুখেও সশস্ত্র প্রহরী। কোন পথ নেই পালাবার।

মাঠের এক কোনে অন্ধকারে বসে আছে গোভাঁ। নীরব। নির্জন।

তার একাগ্র দৃষ্টির সামনে রাতের আঁধারে মুখ ঢেকে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে লা তুর্গ্ দুর্গ।

গোভাঁর মনে অনেক চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত। মার্কুইস লাঁতিনাক। বিপ্লবের শত্রু। দেশের শত্রু। ইংরেজকে সে ডেকে এনেছে সাগর পার হতে। সে হাত মিলিয়েছে পিট, ক্রেগ, কর্ণওয়ালিস আর জলদস্যুদের সাথে। চীৎকার করে সে বলেছে: এসো ইংলণ্ড, ফ্রান্স অধিকার করো। এ হেন দেশদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যু।

কিন্তু—

যে-মানুষ ছিলো দেশদ্রোহী লাঁতিনাক, সেই কি লা তুর্গ্ দুর্গের বন্দী লাঁতিনাক? অতীতের ভস্মস্তূপে জন্মে নি কি নতুন মানুষ? লাঁতিনাকের সামনে ছিলো ঘন জঙ্গল, মুক্তির খোলা পথ। কিন্তু স্বেচ্ছায় সে ফিরে এলো শত্রু-বেষ্টিত দুর্গে—একক, সহায়হীন। নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। তাও আত্ম-স্বার্থের খাতিরে নয়। তিনটি অনাত্মীয় শিশুর প্রাণ বাঁচাতে। তারই পুরস্কার কি হবে গিলোটিন? নিজের ও পরের জীবন দুদিক থেকে তাঁকে ডাকলো হাতছানি দিয়ে। সে বেছে নিলো মৃত্যু। তবু তাঁকে বাঁচালো দৈব। সেই মৃত্যুই কি হবে তাঁর

এত বড় বীরত্বের পুরস্কার? উদারতার বিনিময়ে সে কি পাবে বর্বরতা? বিপ্লবের হবে এত বড় পতন? প্রজাতন্ত্রের এত বড় অসম্মান?

গভীর উত্তেজনায় গোভাঁ উঠে দাঁড়ালো। দুই হাত পিছনে রেখে পায়চারী করতে লাগলো মন্থর পায়ে। এক সময়ে তার মনে পড়লো সিমুরদ্যাঁর ঘোষণা। সে রূঢ় কণ্ঠস্বর এখনো যেন তার কানে বাজছে: কাল হবে কোর্ট-মার্শাল। পরশু গিলোটিন। ভাঁদির চির-অবসান।

গোভাঁর শরীর শিউরে উঠলো।

দূরের ঘণ্টা-ঘরে রাত দুটো বাজলো। দৃঢ় পদক্ষেপে গোভাঁ এগিয়ে চললো দুর্গের ভাঙা দেয়ালের দিকে। সান্ত্রীরা পথ ছেড়ে দিলো সসম্ভ্রমে।

আঁধার গুহা-পথ পার হয়ে গোভাঁ হল ঘরে ঢুকলো। ভারপ্রাপ্ত অফিসার এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালো।

কারাকক্ষের দিকে আঙুল বাড়িয়ে গোভাঁ আদেশ দিলো, দরজা খোলো।

খোলা দরজা দিয়ে গোভাঁ ভিতরে ঢুকলো। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

তারপর হো-হো করে হেসে উঠলো মার্কুইস। জোর গলায় বললো: গুড্ ইভ্‌নিং স্যার। বহুকাল পরে তোমার দর্শন লাভের সৌভাগ্য হলো, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এসো না, একটু কথাই বলা যাক। একা একা একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমার বন্ধুরা অকারণে বড় সময় নষ্ট করে। অপরাধীকে সনাক্ত করা, কোর্ট-মার্শাল ডাকা—এত হৈ-হল্লা কেন রে বাবা!

হ্যাঁ, তারপর—দিন কেমন চলছে? খুব চমৎকার, না? এক যে ছিলো রাজা আর তার রাণী। রাজা ছিলো রাজাই আর রাণী হলো ফ্রান্স। সবাই মিলে রাজার মাথাটি ফেললো কেটে; আর রাণীর বিয়ে দিয়ে দিলো রোবেসপিয়রের সাথে। তাদের একটি মেয়ে হলো—নাম গিলোটিন। তার সাথেই তো কাল সকালে আমার পূর্বরাগের আয়োজন হয়েছে। না কি বলো?

হাসতে হাসতে মার্কুইসের স্বর হঠাৎ তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো: এ-ঘর আমার। একদিন ছিলো যখন লর্ডরা এখানে আটক করে রাখত বিদূষকদের। আর আজ গেঁয়ো চাষীরা বন্দী করে রাখে লর্ডদের। একে তোমরা বলো বিপ্লব? আশ্চর্য। দ্যাখো, একটা কথা তোমাকে বলছি। গোভাঁর বংশধর তুমি। তোমার শিরায় বনেদী নীল রক্তের ধারা। সেই রক্ত বইছে আমারও বুকের তলে। অথচ যে-রক্ত আমাকে করেছে সম্ভ্রান্ত মানুষ, সেই রক্তই তোমাকে গড়ে তুলেছে একটা রাস্কেল। এই কি বিপ্লব?

একটু থেমে নিজেকে সংযত করে মার্কুইস আবার বলতে লাগলো, রাজাকে মারো। বড় লোকদের মারো। পরুতদের মারো। ছিঁড়ে ফেলো। ধ্বংস করো। হত্যা করো। তোমাদের পায়ের তলায় পিষে মারো যত সব প্রাচীন রীতি আর নীতি। সিংহাসন ভেঙে ফেলো। দেবতার আসনে লাথি মারো। চুরমার করো। নাচো। ধ্বংসের শেষ সীমায় ছুটে যাও। এই তো তোমাদের কথা? তোমরা বিশ্বাসঘাতক। তোমরা কাপুরুষ। সাধনার শক্তি নেই। ত্যাগের সামর্থ্য নেই। মূর্খ, অপদার্থের দল।

তীব্র উত্তেজনায় মার্কুইসের শরীর কাঁপছে। ধীরে ধীরে সে বললো, আমার কথা শেষ হয়েছে। মঁসিয় ভাইকাউণ্ট, আমি তোমার একান্ত অনুগত ভৃত্য। এইবার আমাকে গিলোটিন করো।

উত্তরে গোভাঁ বললো শুধু দুটি কথা, আপনি মুক্ত।

নিজের গায়ের সেনাপতির পোষাক খুলে গোভাঁ সেটাকে বেঁধে দিলো মার্কুইসের গলায়। মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিয়ে সেটাকে টেনে দিলো চোখের উপরে। পাছে তাঁর মুখ দেখা যায়।

মার্কুইস শুধালো, কি করছ?

দ্বাররক্ষীকে ডেকে গোভাঁ বলল, লেফ্‌টেন্যাণ্ট, দরজা খোলো।

দরজা খুলে গেলো। বিস্ময়-বিমূঢ় মার্কুইসকে গোভাঁ দরজার দিকে ঠেলে দিলো।

মুহূর্তমাত্র কি যেন ভেবে মার্কুইস দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো। কারা-দ্বার আবার বন্ধ হলো।

।। এগারো ।।

কোর্ট-মার্শাল : ১৭৯৩।

লা তুর্গ্ দুর্গের একতলার হল ঘরে বসেছে বিচার-সভা: তিনখানা চেয়ার। তিনটি টুল। একটি টেবিল। দুটো মোম বাতি। টেবিলে পিতলের সিল-মোহর একটা, কিছুটা সিল করবার মোম, দুটো দোয়াতদান, কিছু কাগজ, আর আইনসংক্রান্ত দুখানি ছাপানো নির্দেশ-নামা।

কারা-কক্ষের দিকে মুখ করে পাতা হয়েছে টেবিল। মাঝখানের চেয়ারটি ত্রিবর্ণ-পতাকায় সাজান। সেটায় বসেছে সিমুরদ্যাঁ—বিচার-সভার সভাপতি। তার টুপিতে ত্রিবর্ণ চিহ্ন। পাশে তরবারি। বেল্টে দুটো পিস্তল। ডাইনের চেয়ারে বসেছে ক্যাপ্টেন গেসাঁ, প্রথম বিচারক। বাঁয়ের চেয়ারে সার্জেণ্ট রাদুব, দ্বিতীয় বিচারক। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। টেবিলের দুই পাশের দুখানি টুলে

বসেছে কমিশনার-অডিটার আর রেজিস্ট্রার ; দু জনই সামরিক কর্মচারী। টেবিলের উল্টো দিকের টুলটা খালি—সেটা বন্দীর আসন। দু পাশে সঙীনধারী দুই সৈনিক।

বেলা দুপুর। বিচার এখনও সুরু হয় নি।

একখানা সাদা কাগজে সিমুরদ্যাঁ লিখেছে :

গণ-নিরাপত্তা পরিষদের নাগরিক সদস্যগণ, লাঁতিনাক বন্দী। আগামী কাল তার মৃত্যুদণ্ড।

তারিখ, স্বাক্ষর ও সিল শেষ করে সিমুরদ্যাঁ চিঠিখানা পাশে-দাঁড়ানো একজন সৈনিককে দিলো। অভিবাদন করে সে বেরিয়ে গেলো। বাইরে শোনা গেলো তার অশ্বক্ষুরধ্বনি।

সিমুরদ্যাঁ আদেশ করলো, কারাগারের দরজা খোলো।

দুইজন সৈনিক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো।

—বন্দীকে বাইরে নিয়ে এসো।

বেরিয়ে এলো গোভাঁ। দুপাশে দুই সৈনিক।

—গোভাঁ! চীৎকার করে উঠলো সিমুরদ্যাঁ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।

—লাঁতিনাক কোথায়?

—মুক্ত।

—কে তাকে মুক্তি দিয়েছে?

—আমি?

—তুমি কি স্বপ্ন দেখছ?

—নিজ হাতে আমার সেনাপতির পোষাক আমি তার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছি। চোখের উপর টেনে দিয়েছি টুপি।

—এনে দাও লাঁতিনাককে।

—গভীর রাতে তিনি এ-দুর্গ পরিত্যাগ করেছেন।

—তুমি উন্মাদ।

—আমি ঠিকই বলেছি।

—তাহলে তোমার শাস্তি—

—মৃত্যু। আমি জানি।

সিমুরদ্যাঁর মুখ মরার মত সাদা হয়ে গেলো। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সে বসে রইলো—নিশ্চল, স্থানু। তাঁর গলার স্বর আটকে আসছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কপালে জমেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

তবু সে বিচারক। সংকল্পে অটল। প্রশ্ন করলো, আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমার কি বলবার আছে?

ধীরে মাথা তুলে গোভাঁ বললো, একটিমাত্র কথা। একটা দিকে চোখ ছিলো বলে আরেকটা দিক আমি দেখতে পাই নি। একটি প্রত্যক্ষ স্পষ্ট মহৎ কাজ আমার চোখ থেকে মুছে ফেলেছিলো শত অন্যায়ের ছবি। এক দিকে এক বৃদ্ধ; অন্য দিকে তিনটি শিশু। তাদের চিন্তায় আমি ভুলে গেলাম অগ্নিদগ্ধ গ্রাম, রিক্ত মাঠ, বহু বন্দীর মৃত্যু, আহতের আর্তনাদ। আমি ভুলে গেলাম ইংলণ্ডের হাতে ফ্রান্সকে তুলে দেবার কলংক-কথা। আমার দেশকে যে খুন করেছে তাকে আমি মুক্ত করে দিলাম। আমি দোষী।

—আর কিছু বলবে?

—হ্যাঁ। দলপতি হিসাবে আমার কর্তব্য আমি করেছি। আপনারাও করুন আপনাদের কর্তব্য। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন।

দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে সিমুরদ্যাঁ বললো. বিচার হবে আইনের নির্দেশে। প্রত্যেক বিচারক ঘোষণা করবেন তার অভিমত—উচ্চকণ্ঠে এবং অপরাধীর সামনে। ন্যায়ের কাছে লুকোচুরি নেই। প্রথম ভোট দেবেন ক্যাপ্টেন গেসাঁ।

ক্যাপ্টেন গেসাঁ দাঁড়ালো; আইনের নির্দেশ অপরিবর্তনীয়। সেনাপতি গোভাঁ বিদ্রোহী লাঁতিনাকের পলায়নে সাহায্য করেছেন। তিনি দোষী। আমার ভোট—মৃত্যু।

দৃঢ় স্পষ্ট গলায় গোভাঁ বললো, আপনাকে ধন্যবাদ।

সিমুরদ্যাঁ বললো, এবার ভোট দেবেন সার্জেণ্ট রাদুব।

গোভাঁকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে রাদুব বললো, এই যদি বিচার হয়, তাহলে গিলোটিনের খড়্গ পড়ুক আমার গলায়। সে বৃদ্ধ যা করেছেন, আমি হলেও তাই করতাম: আমার সেনাপতি যা করেছেন, আমি হলেও তাই করতাম। এরা বীর, এরা মহান। আর আপনারা চান সেনাপতিকে গিলোটিন করতে। আপনাদের কথা শুনে আমার হাসি পায়। না না, সে হবে না—হতে পারে না।

উত্তেজনার ফলে রাদুবের ব্যাণ্ডেজ ভিজে রক্তধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো ঘাড় বেয়ে।

সিমুরদ্যাঁ শুধালো, আপনি তাহলে আসামীর মুক্তির স্বপক্ষে ভোট দিতে চান?

—আমি ভোট দেই—তাঁকে প্রজাতন্ত্রের সর্বাধিনায়ক করা হোক।

—বাজে কথা রেখে বলুন,—মুক্তি না মৃত্যু?

—আমি ভোট দেই—তাঁর বদলে আমার মাথা কেটে ফেলা হোক।

সিমুরদ্যাঁ বললো, লিখুন রেজিস্ট্রার—মুক্তি।

লেখা শেষ করে রেজিস্ট্রার ঘোষণা করলো, এক ভোট : মৃত্যু। এক ভোট : মুক্তি। সমান সমান।

এবার সিমুরদ্যাঁর ভোটের পালা।

সে উঠে দাঁড়ালো। টুপি খুলে রাখলো টেবিলে। ধীর অথচ গম্ভীর গলায় বললো, আসামী, প্রজাতন্ত্রের নামে এই বিচার-সভা তোমাকে ২—১ ভোটে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলো।

সিমুরদ্যাঁ কি পাথর! আসনে বসে সে টুপি তুলে দিলো মাথায়। বললো, গোভাঁ, আগামী কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে গিলোটিন করা হবে।

অভিবাদন জানিয়ে গোভাঁ বললো, বিচার-সভাকে ধন্যবাদ।

সার্জেণ্ট রাদুব মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

॥ বারো ॥

গভীর রাত।

একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে চলেছে সিমুরদ্যাঁ। হল ঘর অতিক্রম করে সান্ত্রীকে ইঙ্গিত করলো কারা-কক্ষের দরজা খুলে দিতে। দরজা খুলে গেলো।

এক কোণে ঘুমিয়ে আছে গোভাঁ। তৃণ-শয্যা।

লণ্ঠনটা নামিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো সিমুরদ্যাঁ। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো গোভাঁর মুখের দিকে। মায়ের দৃষ্টি কি এর চেয়ে স্নেহময় ?

হাঁটু গেড়ে বসে গোভাঁর একখানি হাতে তুলে নিলো। গভীর আবেগে একটি চুমো খেলো!

চমকে জেগে উঠলো গোভাঁ। ম্লান আলোয় দেখলো সিমুরদ্যাঁর স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখ। বললো, মাস্টারমশায়, আপনি ? আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, মৃত্যুর ঠোঁট ছুঁয়েছে আমার হাত।

সিমুরদ্যাঁ ডাকলো, গোভাঁ—

—বলুন মাস্টারমশায়।

তার পাশে খড়ের উপর বসে সিমুরদ্যাঁ বললো, আমি এসেছি তোমার সঙ্গে বসে খেতে।

এক টুক্‌রো রুটি ছিঁড়ে গোভাঁ তাঁর হাতে দিলো। সিমুরদ্যাঁর খাওয়া হলে এগিয়ে দিলো জলের কুজো।

সিমুরদ্যাঁ বললো, আগে তুমি খাও।

গোভাঁ জল খেয়ে কুজোটা দিলো সঙ্গীর হাতে। সিমুরদ্যাঁ আকণ্ঠ পান করলো।

খেতে খেতে সুরু হলো আলোচনা।

গোভাঁ বললো, বিরাট ঘটনা-স্রোত বয়ে চলেছে। বিপ্লবের বর্তমান কাজগুলি রহস্যময়। কিন্তু এর অন্তরালে রয়েছে অদৃশ্য ভবিষ্যৎ। বর্বরতার ফাঁসি-মঞ্চের তল হতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে সভ্যতার মণি-মন্দির।

সিমুরদ্যাঁ যোগ দিলো, ঠিক বলেছ। বিপ্লবের অস্থায়ী কর্মস্রোতের ভিতর দিয়েই একদিন দেখা দেবে এর স্পষ্ট স্বরূপ। অধিকার আর কর্তব্য চলবে পাশাপাশি: ন্যায্য করনীতি; আবশ্যিক সামরিক জীবন; জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্যের প্রতিষ্ঠা; আর সকলের উপরে আইন।

গোভাঁ বাধা দিলো কথার স্রোতে, আমার দৃষ্টি আরো উপরে।

—আইনের উপর আবার কি আছে?

—ন্যায় বিচার।

—স্পষ্ট করে বলো।

—যেমন—আপনি চান আবশ্যিক সামরিক জীবন। কিন্তু যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে? অন্য মানুষের। আমি চাই সামরিক জীবনের লোপ। আমি চাই শান্তি। আপনি চান নির্যাতিতের উদ্ধার। আমি চাই নির্যাতনের অবসান। আপনি চান আয় অনুপাতে কর। আমি চাই কর বিলোপ। আমি চাই মানুষের জীবনযাত্রার খরচ নেমে আসুক একেবারে নীচের কোঠায়। আর সে ব্যয় বহন করুক সমাজের উদ্বৃত্ত অর্থ।

—তার মানে?

—মানে এই: প্রথমে পরগাছা-বৃত্তির নিপাত করুন—পুরোহিত, বিচারক আর সৈনিকের পরগাছা-বৃত্তি। তারপর কাজে লাগান আপনাদের সঞ্চিত অর্থ। প্রতি জমিতে সার দিন। মোট জমির চার ভাগের তিন ভাগ আজ পতিত। সারা ফ্রান্সকে চষে ফেলুন। অপ্রয়োজন গো-চারণ ভূমির উচ্ছেদ করুন। সমান ভাবে ভাগ করে দিন সমস্ত জমি। জন প্রতি একটি করে গোলা দিন, আর গোলা প্রতি একটি মানুষ। দেখবেন মোট ফসল শত গুণ বেড়ে যাবে।

আজ ফ্রান্সের চাষীরা মাংস খেতে পায় বছরে মাত্র চার দিন। জমি চাষের সুব্যবস্থা করে দিন, সারা ইওরোপকে সে পেট ভরে খাওয়াতে পারবে।··· প্রকৃতি মানুষের এক বিস্ময়কর অনাদৃত বন্ধু। তাকে কাজে লাগান। প্রতিটি বাতাস, প্রত্যেকটি জলপ্রপাত আর বিদ্যুৎ-চমককে কাজে লাগান। মাটির নীচে প্রসারিত রয়েছে অসংখ্য শিরা-উপশিরা। তাদের ভিতর দিয়ে

বয়ে চলেছে জল, তেল আর আগুনের সীমাহীন প্রবাহ। সেই সব শিরা কেটে দিন। সেই জলে আপনার ঝরণার শক্তি বৃদ্ধি হোক। সেই তেলে জ্বলুক আপনার আলো। সেই আগুনে জ্বলুক আপনার উনুন। চেয়ে দেখুন সমুদ্র-তরঙ্গের দিকে। কী এক বিরাট শক্তি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। নির্বোধ পৃথিবীর মানুষ তাকে কোন কাজে লাগায় না।

—তুমি একেবারে স্বপ্নের মেঘে পাল তুলে দিয়েছ গোর্ভা!

—আজ্ঞে না। এই বাস্তব সত্য। তারপর ধরুন স্ত্রীলোক। তাদের আপনি কি করবেন?

—তারা যেখানে আছে সেখানেই থাক—পুরুষের দাসী।

—বেশ। কিন্তু এক শর্তে।

—কি?

—পুরুষ হবে স্ত্রীলোকে দাস।

—তুমি বলো কি? পুরুষ হবে দাস। অসম্ভব। পুরুষ প্রভু। নিজের ঘরে সে রাজা।

—হ্যাঁ তাই। কিন্তু এক শর্তে।

—কি?

—নারী হবে সেখানে রাণী।

—তাহলে তুমি বলতে চাও নর ও নারী হবে—

—সমান।

—সমান? এ-কথা তুমি ভাবতে পারো? তারা যে আলাদা জীব।

—আমি বলেছি তারা সমান। তারা এক, এমন কথা তো বলি নি।

একটু চুপ করে থেকে সিমুরদ্যাঁ শুধালো, আর ছেলেমেয়ে? তাদের তুমি কোন্ ভাগে ফেলবে?

—প্রথমে জন্মদাতা পিতার ভাগে; তারপরে জন্মদায়িনী জননীর ভাগে; তারপরে শিক্ষাদাতা শিক্ষকের ভাগে; তারপরে নগরের ভাগে; তারপর দেশের ভাগে; আর সর্বশেষে মনুষ্যত্বের ভাগে।

—ঈশ্বরের কথা তো তুমি বললে না?

—বাবা, মা, শিক্ষক, নগর, দেশ, মনুষ্যত্ব—ঈশ্বরের কাছে যাবার এরাই তো সিঁড়ি। এই সিঁড়ি পার হলেই ঈশ্বরের দেশ। স্বর্গের দুয়ার তো সেখানেই খোলা।

বলতে বলতে গোর্ভার স্বরে লাগলো স্বপ্নের ছোঁয়াচ। আপন মনে সে বলেই চললো, কেবল বোঝা বয়ে বেড়াবার জন্যে মানুষ জন্মে নি। না, না, কেউ আর অস্পৃশ্য থাকবে না, দাস থাকবে না, দণ্ডিত থাকবে না, নির্যাতিত থাকবে না। পরের জোয়াল কেউ আর কাঁধে নেবে না। পরের শিকল টানবার

জন্য মানুষ জন্মে নি, সে জন্ম নিয়েছে আকাশে উড়তে। সাপের মত মানুষ আর বুকে হাঁটবে না। সোনার পাখা সে মেলবে সুনীল আকাশে। আমি চাই মাটির কীট জীবন্ত ফুল হয়ে উড়ে যাবে। আমি চাই—

মাঝ পথে থেমে গেলো গোভাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর চোখ জ্বলছে। ঠোঁট কাঁপছে।

খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসে বাইরের শব্দ। অনেক দূরে ভেরীর আওয়াজ। কানে আসে হাতুড়ির শব্দ। লোহা লক্করের ঠক্ ঠক্ শব্দ।

সিমুরদ্যাঁ কান পেতে শুনলো। তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেলো ছাইয়ের মতো।

গোভাঁ কিন্তু শুনলো না কিছুই। গভীর ধ্যানে সে মগ্ন।

সিমুরদ্যাঁ শুধালো, কি ভাবছ?

—ভবিষ্যৎ। গোভাঁ উত্তর দিলো।

আবার চুপ।

গোভাঁর স্বপ্নবিভোর চোখ বুজে এলো। অকম্পিত স্থির তার দেহ।

সিমুরদ্যাঁ উঠলো। ধ্যানমগ্ন যুবকের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছিয়ে এলো দরজার কাছে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কারাকক্ষের দরজা আবার বন্ধ হলো।

।। তেরো ।।

দিকচক্রবালে ঊষার রক্তিম পদচিহ্ন।

ফুজারের অস্পষ্ট বন-রেখাকে অতিক্রম করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মূর্তি···দুটি ছায়াচ্ছন্ন দানব যেন।

একটি—লা তুর্গ্: দুর্গ।

অপরটি—সদ্যনির্মিত গিলোটিন: রাতারাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছে বুঝি রক্তপিপাসু শয়তান।

লা তুর্গ্···দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের প্রস্তর-রূপ···দাসত্ব ও সামন্ততন্ত্রের মূর্ত প্রতীক।

গিলোটিন···১৭৯৩-র একটি বছরের কাষ্ঠ-রূপ···সংক্ষিপ্ত একটি বছর পনেরোটি শতাব্দীর সফল প্রতিদ্বন্দ্বী।

লা তুর্গ্···রাজতন্ত্র।

গিলোটিন···বিপ্লব।

দুই শক্তি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।...

দূরে ড্রাম বেজে উঠলো। প্রভাতের শান্ত স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো মৃত্যু-শোভাযাত্রা। প্রথমে ড্রামবাদক দল। তারপর সঙীনধারী সৈন্য। তারপর উন্মুক্ত কৃপাণধারী একদল সৈন্য। পিছনে গোভাঁ। পরিমিত পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলেছে। তার হাতে শিকল নেই। পায়েও না। কোমরে তরবারি। সকলের পিছনে আর একদল সৈনিক।

মৃত্যু-যাত্রা মঞ্চের নীচে এসে থামলো।

গোভাঁ মঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়ালো। সরল, শান্ত, সুন্দর। মুখে পড়েছে প্রথম সূর্যের আলো। বাতাসে উড়ছে বাদামী চুল।

একজন অফিসার খুলে নিলো তার তরবারি। জল্লাদ এগিয়ে এলো দড়ি নিয়ে। এইবার তাকে বাঁধতে হবে।

গোভাঁ বললো : অপেক্ষা কর!

ডান হাত তুলে সিমুরদ্যাঁকে জানালো শেষ বিদায়-সম্ভাষণ। উচ্চকণ্ঠে বললো; বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

তাকে শুইয়ে দেওয়া হলো পাটাতনের উপর। জল্লাদ সযত্নে দুই ভাগ করে দিলো চুলগুলি। তারপর স্প্রিং-এ হাত দিলো।

স্প্রিংটা ঘুরছে। প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে। তারপরে একটা শব্দ—

ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি শব্দ হলো।

গিলোটিনের খড়োর শব্দের প্রতিধ্বনি হলো পিস্তলের শব্দে।

সিমুরদ্যাঁ পিস্তলের গুলি ছুঁড়েছে নিজের বুকে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কয়েক ঝলক রক্ত।

তারপর সব শেষ।



বেন-হুর

লিউ ওয়ালেস

॥ প্রথম পর্ব ॥

মাউণ্ট জেবেল-এর একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে চলতে যে নদী-খাতটি শেষ পর্যন্ত জাব্বক নদীর রূপ ধরেছে—সেই নদী-খাত ধরে একটি পথিক মরুভূমির উপত্যকা-অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

চেহারা দেখে মনে হয়, তার বয়স পুরো পয়তাল্লিশ বছর। বুক-ভর্তি কালো দাড়িতে সাদার ছিটে লেগেছে। বাদামী মুখটা "কুফিয়ে" (মাথায় বাঁধবার রুমাল) দিয়ে এমন ভাবে ঢাকা যে তার সামান্য অংশই চোখে পড়ে। পরনে পূর্ব দেশগুলিতে প্রচলিত ঢিলে জোব্বা। একটা বড় সাদা উটের পিঠে ছোটখাট তাঁবুর নীচে সে বসে আছে।

দু'ঘণ্টা ধরে উটটা এক তালে পুব দিক পানে এগিয়ে চলল। পথিক কিন্তু একবারও নড়ল না, বা ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল না। ঠিক দুপুর নাগাদ উটটা নিজে থেকে থেমে গিয়ে করুণ স্বরে ডেকে উঠল। সে ডাক শুনে মনিবটি নড়েচড়ে বসল, যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। "হাওদা"-র পর্দা তুলে চারদিকে ভাল করে তাকাল। সব দেখেশুনে খুসি হয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে এমন ভাবে মাথাটা নাড়তে লাগল যেন বলতে চাইছে, "অবশেষে, অবশেষে!" তার গলা দিয়ে একটা শব্দ বের হল—ইখ্! ইখ্!—হাঁটু ভেঙে বসবার ইংগিত। সংগে সংগে উটটা হাঁটু ভেঙে বসল, আর আরোহী তার ঘাড়ের উপর পা রেখে বালির উপরে নেমে পড়ল।

এবার তার পুরো চেহারাটা চোখে পড়ল। খুব লম্বা না হলেও বেশ শক্ত-

সমর্থ। রেশমী ফিতেটা ঢিলে করে মাথার "কুফিয়ে"টা ঠেলে সরিয়ে দিতেই তার সবটা মুখ দেখা গেল। বলিষ্ঠ মুখ, প্রায় নিগ্রোদের মতই কালো; তবু নীচু, চওড়া কপাল, উন্নত নাক, চোখের বাইরের কোণ দুটি সামান্য তোলা, ইস্পাতের মত ঝকঝকে শক্ত, খাড়া, প্রচুর চুল—এ সব কিছু দেখে তার বংশ-পরিচয় বুঝতে কষ্ট হয় না! ফারাওগণ ও পরবর্তীকালের টোলেমিরাও দেখতে এই রকমই ছিল; মিশরীয়দের আদি পুরুষ মিজরাইমও এই রকমই দেখতে ছিল।

অনেকটা পথ উটের পিঠে বসে থেকে থেকে পথিকের হাত-পা অবশ হয়ে এসেছে। হাত ঘসতে ঘসতে পা ঠুকে ঠুকে সে তার বিশ্বস্ত চাকরটার চার দিকে ঘুরতে লাগল, আর মাঝে মাঝে যত দূর চোখ যায় চার দিকে তাকাতে লাগল। চোখে-মুখে ঈষৎ হতাশা ফুটে উঠলেও ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে সে একটা দলের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা যে আসবেই সে বিষয়ে পথিকের মনে কোন সন্দেহই নেই। প্রথমেই উটের পিঠের বাক্সের ভিতর থেকে খানিকটা স্পঞ্জ ও একপাত্র জল এনে উটটার চোখ, মুখ ও নাক ধুইয়ে দিল। তারপর বের করল লাল-সাদা ডোরা-কাটা একটা গোলাকার লাল কাপড়, এক বস্তা লাঠি ও একটা শক্ত বেত। বেতটা এমন কৌশল করে তৈরী যে সেটাকে টেনে টেনে মাথার চাইতে উঁচু একটা দণ্ডের মত বানানো হল। সেটাকে বালিতে পুঁতে দিয়ে লাঠিগুলিকে তার সঙ্গে আটকে দিয়ে তার উপরে কাপড়টাকে ছড়িয়ে দেওয়া হল; বাস, তৈরি হয়ে গেল একটা ঘর—আমির ও শেখদের বসবাসের ঘরের তুলনায় অনেক ছোট হলেও অন্য সব বিচারে অনেকটা সেই রকমই। তারপর একটা কার্পেট বের করে তাঁবুর মেঝেতে সূর্যের দিকে পিঠ করে পেতে দিল।

এবার একটা বেতের ঝুঁড়ি এনে তার ভিতর থেকে খাবার-দাবার বের করে কার্পেটের উপর সাজিয়ে রাখা হল। সব তৈরি করে সে আবার বাইরে গেল। আরে! ঐ তো! মরুভূমির বুকে পূব দিকে একটা কালো বিন্দু! বিন্দুটা ক্রমেই বড় হচ্ছে; একটা হাতের মত হল; তারপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। একটু পরেই দেখা গেল তার নিজের উটের মতই আর একটা লম্বা, সাদা উট; পিঠে একটা "হাওদা"—হিন্দুস্থানের ভ্রাম্যমান শিবিকা। তখন মিশরীয় পথিকটি বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে আকাশের দিকে তাকাল।

বলে উঠল, "একমাত্র ঈশ্বরই মহান!" তার চোখে জল, বুক ভয়।

আরও কাছে এসে নবাগত থামল। সেও বুঝি এইমাত্র ঘুম ভেঙে উঠল। তার সামনে উট, তাঁবু, আর দ্বারপথে প্রার্থনারত একটি মানুষ। দুই হাত আড়াআড়ি রেখে সেও মাথা নুইয়ে নীরবে প্রার্থনা করল; তারপর উটের পিঠ থেকে নেমে মিশরীয় পথিকটির দিকে এগিয়ে গেল। মিশরীয় লোকটিও তার

দিকে এগিয়ে গেল। এক মুহূর্ত দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল; তারপর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

নবাগত বলল, "হে প্রকৃত ঈশ্বরের সেবক, তুমি শান্তি লাভ কর!"

মিশরীয় লোকটি আবেগের সঙ্গে জবাব দিল, "সত্য ধর্মে বিশ্বাসী ভাই, তুমিও শান্তি লাভ কর। তোমাকে স্বাগত জানাই।"

নবাগত দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী; মুখটা সরু, চোখ গর্তে-বসা, চুল ও দাড়ি সাদা, গায়ের রং কাঁসা ও দারচিনির মাঝামাঝি। সেও নিরস্ত্র। পোষাক হিন্দুস্থানী; মাথার টুপির চার দিকে একটা শালকে জড়িয়ে জড়িয়ে পাগড়ি বানানো হয়েছে; গায়ের পোষাকাদি অনেকটা মিশরীয়টির মতই। শুধু স্যাণ্ডালের বদলে পায়ে লাল চামড়ার আধা-চটি, আঙুলের দিকে সরু। পায়ের চটি ছাড়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব পোষাকই সাদা কাপড়ের। লোকটির প্রকৃতি মর্যাদাসম্পন্ন, রাজকীয়, কঠোর।

দু'জনই উত্তর দিকে তাকাল। আর একটি সাদা উট জাহাজের মত হেলে দুলে এগিয়ে আসছে। তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল। নবাগত উট থেকে নেমে এগিয়ে এল।

হিন্দুটিকে আলিঙ্গন করে সে বলল, "হে ভাই, তুমি শান্তি লাভ কর!"

সর্বশেষ আগত লোকটি তার বন্ধুদের থেকে আলাদা; দেখতে ছোটখাট, গায়ের রং ফর্সা, ছোট সুন্দর মাথায় ঢেউ-খেলানো পাতলা চুল, গাঢ় নীল চোখে একটি নরম মনের আভাষ, প্রকৃতিতে সদয় ও সাহসী। তার মাথায় কোন আবরণ নেই, সঙ্গে নেই অস্ত্র। হাতকাটা, গলা খোলা, হাঁটু পর্যন্ত ঝুল যে জামা সে পরেছে তাতে গলা, বাহু ও পায়ের সবটাই দেখা যাচ্ছে। পায়ে স্যাণ্ডেল। সে স্বয়ং যদি এথেনি-র কুঞ্জ থেকে নাও এসে থাক, তার পূর্বপুরুষরা নিশ্চয় এসেছিল।

মিশরীয় লোকটি আলিঙ্গন সেরে বলল, "শিবির প্রস্তুত, খাবারও প্রস্তুত; চলে এস।"

দুজনকেই হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। স্যাণ্ডেল খুলে পা ধুইয়ে দিল; হাতে জল ঢেলে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর বলল, "এবার শুরু করা যাক। খেতে খেতেই চলুক পরস্পরের পরিচয়-পর্ব।"

তিনজনই বুকের আড়াআড়িভাবে হাত রেখে উচ্চ-কণ্ঠে একযোগে বলতে লাগল:

"সকলের পিতা—ঈশ্বর!—এখানে আমাদের যা কিছু আছে সবই তোমার; নাও আমাদের ধন্যবাদ, আর কর আমাদের আশীর্বাদ; তোমার ইচ্ছা যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি।"

কথা শেষ করে তারা সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। একজনের ভাষা

অপর দুজন আগে কখনও শোনে নি, তবু প্রত্যেকের বক্তব্য তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল। স্বর্গীয় আবেগে তাদের অন্তর ভরে উঠল; ঈশ্বরের অলৌকিক উপস্থিতিকে তারা যেন উপলব্ধি করতে পারল।

তিন পথিকের মিলনের যে ঘটনা এখানে বলা হল সেটা ঘটেছিল রোমীয় বর্ষ ৭৪৭-এ। ডিসেম্বর মাস। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল জুড়ে শীতের রাজত্ব। এ সময় মরুভূমিতে পথ চললে খুব ক্ষিধে পায়। ছোট তাঁবুর নীচে উপবিষ্ট তিনটি প্রাণীও ক্ষুধার্ত। তারা পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করল। মদ্য পানের পরে আলোচনা শুরু হল।

ভোজসভার প্রধান হিসাবে মিশরীয় লোকটি বলল, "অপরিচিত দেশে ভ্রমণকারী পথিকের কাছে অন্যের মুখে নিজের নামটা শোনার মত মধুর আর কিছু নেই। আগামী অনেকগুলি দিন আমাদের এক সঙ্গে কাটাতে হবে। কাজেই পরস্পরের পরিচয় হওয়া দরকার। সকলের মত হলে যিনি সকলের শেষে এসেছেন তিনিই প্রথম কথা বলুন।"

গ্রীকটি ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল: "আমি এসেছি গ্রীস থেকে। আমার নাম গ্যাস্‌পার। এথেন্স-এর ক্লিন্থেস-এর ছেলে আমি। আমার দেশবাসী বিদ্যার অনুশীলনে সদাই রত। বিদ্যাচর্চাই আমারও জীবনের সাধনা। আমাদের দুই মহান দার্শনিকের একজন শিখিয়েছেন—সকলের মধ্যেই আত্মা আছে, আর সে আত্মা অমর; অপরজন শিখিয়েছেন—ঈশ্বর এক ও অসীম ন্যায়বান।"

এ কথা শুনে হিন্দুটি সমর্থনসূচক হাসি হাসল।

গ্রীক আবার বলতে লাগল, "আমাদের দেশের পশ্চিম অঞ্চলে থেসালি-তে অলিম্পাস নামে একটি বিখ্যাত পর্বত আছে। দেবরাজ থিউস সেখানে বাস করেন। এক সময় আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি গুহায় থেকে সাধনা শুরু করলাম। আমার আশ্রমের দরজা থেকেই সমুদ্র দেখা যেত। একদিন দেখলাম, একটি লোক জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে তীরে এল। আমি তাকে গুহার মধ্যে এনে আশ্রয় দিলাম। সে একজন ইহুদী, ইতিহাস ও আইনে সুপণ্ডিত। তার কাছেই জানতে পারলাম, যে ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি তিনি সত্যি সত্যি আছেন। শুধু তাই নয়, সে আরও বলল—যে সন্তগণ ঈশ্বরের সঙ্গে চলাফেরা করেছে, কথা বলেছে, তারাই জানিয়েছে যে তিনি আবার আসবেন।

"একদিন রাতে গুহার দরজায় বসে নিজেকে গভীর করে জানবার চেষ্টা করছি এমন সময় দেখতে পেলাম সমুদ্রের বুকে, বরং বলা যায় অন্ধকারের বুকে একটি তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে; ধীরে ধীরে তারাটি আরও কাছে এগিয়ে

আমার দরজার উপরে পাহাড়ের গায়ে এসে দাঁড়াল ; তার আলো এসে পড়ল আমার উপরে। সেখানেই পড়ে গেলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নের মধ্যে শুনলাম কে যেন বলছে :

'গ্যাসপার। তোমার বিশ্বাসের জয় হয়েছে। তুমি ধন্য। পৃথিবীর প্রত্যন্ত দেশ থেকে আগত আরও দুজনের সঙ্গে তুমি তাঁকেই দেখতে পাবে যাঁর আসার কথা আছে, তুমিও হবে তাঁর আবির্ভাবের সাক্ষী। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রা কর। যে আত্মা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার উপর বিশ্বাস রেখো।'

"সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল একটা আলো আমার অন্তরে জ্বলতে লাগল। সন্ন্যাসীর পোষাক ছেড়ে আগেকার পোষাক পরলাম। শহর থেকে আসবার সময় যে ধন-সম্পত্তি এনে লুকিয়ে রেখে-ছিলাম সে সবই সঙ্গে নিলাম। একটা জাহাজে চেপে এণ্টিয়ক-এ নামলাম। সেখানে একটা উট ও তার সাজ-পোষাক কিনলাম। তারপর এমেসা, দামাস্কাস, বোস্রা ও ফিলাডেলফিয়া হয়ে এখানে এসেছি। দেখ ভাই, আমার কাহিনী তো বললাম, এবার তোমাদের কথা শোনাও।"

মিশরীয় ও হিন্দু পরস্পরের দিকে তাকাল ; মিশরীয় হাত তুলল ; হিন্দু মাথা নুইয়ে বলতে শুরু করল।

"আমার ভাইটি খুব ভাল বলেছে। আমার কথাও যেন তার মতই জ্ঞান-গর্ভ হয়।"

একটু থেমে কি যেন ভেবে সে আবার শুরু করল :

"জন্মসূত্রে আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের জীবনের প্রথম আশ্রম ছাত্র-জীবন পার হয়ে যখন দ্বিতীয় আশ্রমে—অর্থাৎ বিয়ে করে সংসার-ধর্মে প্রবেশ করতে গেলাম, তখন সব কিছু, এমন কি ব্রহ্ম সম্পর্কেও আমার মনে সংশয় দেখা দিল ; আমি অবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পাই না। গঙ্গার পবিত্র ধারা যেখানে ভারত মহাসাগরে মিশেছে সেইখানে আছে গঙ্গা সাগর (সাগর) দ্বীপ। সেখানে গেলাম। ভাবলাম, সেখানে কপিল মুনির আশ্রমের ছায়ায় বসে শিষ্যদের সঙ্গলাভ করে মনে শান্তি পাব। কিন্তু হিন্দু তীর্থযাত্রীরা প্রতি বছর দু'বার করে সাগরের পবিত্র জলে স্নান করতে আসে। তাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে আমার মনে জাগল করুণা। এ সব কিছুর বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়েও আমি মুখ বন্ধ করে রাখলাম, কারণ ব্রহ্ম বা ত্রিমূর্তি, বা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি কথা বললেই আমার ভাবলীলা সাঙ্গ হবে ; যে সব সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণ জ্বলন্ত বালিরাশির উপর মরবার জন্য নিজেদের সেখানে টেনে নিয়ে আসে, তাদের প্রতি এতটুকু দয়া দেখালে, তাদের হয়ে এতটুকু প্রার্থনা করলে, তাদের মুখে একপাত্র জল তুলে দিলে,

আমিও যে তাদেরই একজন হয়ে যাব, পরিবার দেশ ও সমাজ থেকে হব বিতাড়িত। কিন্তু ভালবাসারই জয় হল। মন্দিরে শিষ্যদের সে কথা বললাম, তারা আমাকে তাড়িয়ে দিল। তীর্থযাত্রীদের বললাম, তারা পাথর ছঁুড়ে আমাকে দ্বীপ থেকে তাড়িয়ে দিল। পথে পথে এ কথা বলতে চেষ্টা করলাম, শ্রোতারা হয় পালিয়ে গেল, আর না হয় আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে এমন একটা জায়গাও পেলাম না যেখানে শান্তি ও নিরাপদে থাকতে পারি—এমন কি সমাজ-পরিত্যক্তদের মধ্যেও না, কারণ সমাজ থেকে নির্বাসিত হলেও তারা এখনও ব্রহ্মকে বিশ্বাস করে। এই চরম অবস্থায় পড়ে এমন একটা নির্জন আশ্রয় খঁুজতে লাগলাম যেখানে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর সকলের কাছ থেকেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারি। গঙ্গার তীর ধরে উঠতে উঠতে এক সময় সুদূর হিমালয়ে চলে গেলাম। সেখানে কেবলমাত্র ঈশ্বরকে সঙ্গী করে তপস্যায়, অনাহারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।”

কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হল। দুখানি অস্থিসার হাত দৃঢ়বদ্ধ হল।

“একদিন রাতে সরোবরের তীরে হাঁটতে হাঁটতে নীরবতাকেই উদ্দেশ করে বললাম: ‘কবে আর ঈশ্বর তাঁরই দেওয়া এই দেহকে গ্রহণ করবেন? আমার কি মুক্তি নেই?’ সহসা সরোবরের জলে একটা আলো কেঁপে কেঁপে জ্বলতে লাগল; পরক্ষণেই একটি তারা উঠে আমার দিকে এগিয়ে এসে ঠিক আমার মাথার উপর দাঁড়াল। তার উজ্জ্বলতায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মাটির উপর শুয়ে পড়ে শুনতে পেলাম একটি অপরিসীম মিষ্ট কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, ‘তোমার ভালবাসার জয় হয়েছে! হে ভারত-পুত্র, তুমি ধন্য! মুক্তি আসন্ন। পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত থেকে আগত অপর দুজনের সঙ্গে তুমিও মুক্তিদাতাকে দেখতে পাবে, তাঁর আবির্ভাবের সাক্ষী হবে। সকালে উঠেই যাত্রা কর; তাদের সঙ্গে মিলিত হও; যে আত্মা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করো।”

“সেই থেকে সে আলো আমার সাথে সাথেই রয়েছে। পাহাড়ের খাঁজে একটা বহুমূল্যবান পাথর পেয়ে হরিদ্বারে সেটাকে বেঁচে দিলাম। লাহোর, কাবুল ও জেদ্দা হয়ে ইস্পাহানে এলাম। সেখানে একটা উট কিনলাম। যাত্রীদলের জন্য অপেক্ষা না করে বাগদাদ গেলাম। একাকি নির্ভয়ে পথ চলতে লাগলাম; কারণ সেই আত্মা আমার সঙ্গে ছিল; এখনও আছে। ভাইসব, আমাদের কী গৌরব! আমরা ত্রাণকর্তাকে দেখব—তাঁর সঙ্গে কথা বলব—তাঁকে পূজা করব! আমার কর্তব্য শেষ।”

এবার গম্ভীর গলায় কথা শুরু করল মিশরীয়।

"আমি মিশরবাসী বাল্‌থাজার। রাজপুত্র ও পুরোহিতরূপে আলেক-জান্দ্রিয়াতে আমার জন্ম হয়েছিল। যথাযথ শিক্ষাও পেয়েছি। মন্দভাগ্য ফারাও-এর দিন থেকেই আমাদের দেশে দুটো ধর্ম প্রচলিত আছে—একটি ব্যক্তিগত, অন্যটি সাধারণ; জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বহুঈশ্বরবাদী ধর্ম, আর একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচলিত কেবলমাত্র পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে। অল্প বয়সেই আমার মনে অসন্তোষ দেখা দিল। ঈশ্বর যদি ন্যায়ের অধিপতি, তাহলে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নেই কেন? সত্যকে কেবলমাত্র পুরোহিত শ্রেণীর সান্ত্বনার জন্য অন্যের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হবে কেন? একদিন আলেক-জান্দ্রিয়ার সব চাইতে জনবহুল স্থান ব্রুকিয়াম-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম। শ্রোতাদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সব রকম লোকই ছিল। পাঠকক্ষের যাত্রী ছাত্র, সেরাপিয়াম-এর পুরোহিত, যাদুঘরের ভ্রমণবিলাসী, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কর্তৃপক্ষ, গ্রাম থেকে আগত মানুষ—সব রকম লোকই আমার বক্তৃতা শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। ঈশ্বর, আত্মা, সৎ-অসৎ, স্বর্গ, পবিত্র জীবনের পুরস্কার—প্রভৃতি বিষয়ে বলতে লাগলাম। শ্রোতারা প্রথমে অবাক হল, তারপর হাসতে শুরু করল। আবার চেষ্টা করলাম, তারা বক্রোক্তির পাথর ছুঁড়তে লাগল; বিদ্রূপের কথা দিয়ে ঢেকে দিল আমার ঈশ্বরকে; ঠাট্টার কথা দিয়ে অন্ধকার করে দিল আমার স্বর্গকে। আর অপেক্ষা করা নিরর্থক ভেবে পরাজয় মেনে নিলাম।"

হিন্দু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "ভাইহে, মানুষই মানুষের শত্রু।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাল্‌থাজার আবার বলতে শুরু করল।

"ভাইসব, সেদিন থেকে নীল নদের উজানে-ভাটিতে অনেক ঘুরলাম, গ্রামে-গঞ্জে নানা মানুষের কাছে এক ঈশ্বর, পবিত্র জীবন ও স্বর্গে পুরস্কারের বাণী প্রচার করতে লাগলাম। অনেক কাজ আমি করলাম—সে যে কতটা সেটা আমি বলতে পারি না। একদিন রাতে নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে প্রার্থনার সুরে বললাম, 'পৃথিবী মরতে বসেছে। আর কবে তুমি আসবে? হে ঈশ্বর, মুক্তির দিনটি দেখতে পাচ্ছি না কেন?' কাঁচের মত জলে তারাগুলি ঝিকমিক করছে। মনে হল, একটা তারা বুঝি স্থানচ্যুত হয়ে উপরে উঠে এল। তার উজ্জ্বলতায় চোখ জ্বালা করে উঠল। তারাটা আমার দিকে এগিয়ে এল, মাথার উপরে এসে দাঁড়াল, যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢাকলাম। অপার্থিব একটি কণ্ঠস্বর বলল, 'তোমার সৎকর্মের জয় হয়েছে। মিজরাইম-পুত্র, তুমি ধন্য! মুক্তি সমাসন্ন। বহুদূর থেকে আগত অপর দু' জনের সঙ্গে তুমি ত্রাণকর্তাকে দেখতে পাবে, তাঁর আবির্ভাবের সাক্ষী হবে। সকালে উঠেই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে যাত্রা কর।

তারপর সকলে মিলে জেরুজালেম শহরে গিয়ে খোঁজ কর, জন্মসূত্রে যিনি ইহুদীদের রাজা তিনি কোথায়? পূবের আকাশে তাঁর তারাকে আমরা যে দেখেছি; তাঁকে পূজা করতেই যে আমরা এসেছি। যে আত্মা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখো।"

সে থামল। তারপরই কিসের যেন প্রেরণায় তারা উঠে দাঁড়াল; পরস্পরের দিকে তাকাল।

এক সঙ্গে তিনজন হাতে হাত মেলাল।

সব চুপ। শুধু দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজল। মনের আনন্দকে তারা চেপে রাখতে পারছে না। জীবন-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সে যে আত্মার অনির্বচনীয় আনন্দ—ঈশ্বর-সান্নিধ্যে মুক্ত-মনের আনন্দ।

কিছুক্ষণ পরে তাঁবু গুটিয়ে ফেলা হল। তিন বন্ধু পর পর সারি দিয়ে উটের পিঠে সওয়ার হল; পথ দেখাবে মিশরীয়। তাদের পথ চলে গেছে সোজা পশ্চিমে—শীতার্ত রাত্রির বুকে।

এক সময় চাঁদ উঠল। তার বিচিত্র আলোয় তিন দীর্ঘ শ্বেত মূর্তি নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। তাদের দেখাচ্ছে ছায়াতাড়িত অশরীরী মূর্তির মত। হঠাৎ তাদের সামনে একটা নীচু পর্বত-চূড়ার মত জায়গায় একটা চঞ্চল অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল। সে দিকে তাকিয়ে তারা দেখল সেই অগ্নিশিখা একটা উজ্জ্বল বিন্দুতে পরিণত হল। তাদের হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুততর হল; আত্মায় জাগল শিহরণ; এক কণ্ঠে তারা চীৎকার করে বলল, "নক্ষত্র! নক্ষত্র! ঈশ্বর আমাদের সঙ্গী!"

* * *

পাঠককে এবার জেরুজালেমের জোপ্পা ফটকের খিলান-দেওয়া ফটকের নীচ দিয়ে যেতে হবে একটা সরু গলি ও চত্বরে; সেই পথ ধরে বড় গম্বুজের প্রাচীরের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেই শহর। এই চত্বরটি বাজারেরই একটা অংশ। এখন বেলা তৃতীয় প্রহর; অনেকেই চলে গেছে; তবু ভিড় বিশেষ কমে নি। নবাগত লোকদের মধ্যে একটি দল দক্ষিণের প্রাচীর ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। সে দলে আছে একটি পুরুষ, একটি স্ত্রীলোক ও একটি গাধা।

পুরুষটি দাঁড়িয়ে আছে জন্তুটার মাথার কাছে; হাতে লাগাম ধরে সে একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পোষাক আশেপাশের সাধারণ ইহুদীদেরই মত, শুধু দেখতে নতুন নতুন লাগছে এই যা। কালো দাড়িতে সাদার ছিট লেগেছে; তাতেই বোঝা যাচ্ছে তার বয়স বছর পঞ্চাশেক। নবাগত গেঁয়ো মানুষের মত আধা কৌতূহল ও আধা অর্থহীন দৃষ্টিতে সে চারদিকে তাকাচ্ছে।

গাধাটা আরাম করে কাঁচা ঘাস খাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি বসে আছে তার

পিঠে। মোটা সুতোর একটা ঢিলে জামায় তার সারা শরীর ঢাকা; সাদা অবগুণ্ঠনে ঢাকা তার মাথা ও গলা।

শেষ পর্যন্ত একজন এগিয়ে এসে পুরুষটিকে বলল, "তুমি নাজারেথ-এর জোসেফ না?"

বক্তা পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জোসেফ জবাব দিল, "ঐ নামেই সকলে আমাকে ডাকে। আর আপনি—আরে, বন্ধু রাব্বি স্যামুয়েল যে। তুমি শান্তি লাভ কর!"

"ঐ একই কামনা তোমার জন্যও করছি।" স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে রাব্বি চুপ করল। পরে বলল, "তুমি, তোমার ঘরণী ও সাহয্যকারীরা, সকলেরই শান্তি কামনা করি। গ্যালিলিতে জিলটরা কি করছে বল তো?

জোসেফ সতর্কতার সঙ্গে বলল, "আমি ছুতোর, আর নাজারেথ একটা গ্রাম। যে রাস্তার উপর আমার কাজের বেঞ্চিটা পাতা সেটা শহরে যাবার পথও নয়। কাঠ কেটে আর তক্তা চিরে ও সব দলাদলি করবার আর সময় পাই না।"

রাব্বি সাগ্রহে বলল, "কিন্তু তুমি একজন ইহুদী; তায় ডেভিড-এর বংশধর। প্রাচীন প্রথামত জিহোভা-র কড়ি না জুগিয়ে শুধু করটা দিয়েই তুমি সুখী থাকবে তা তো সম্ভব নয়।"

জোসেফ চুপ করে রইল।

তার বন্ধু বলতে লাগল, "করের পরিমাণ নিয়ে আমার কোন নালিশ নেই—এক দেনারিউস (রোমের রৌপ্য মুদ্রা) অতি তুচ্ছ জিনিস। তা নয়, কর ধার্য করাটাই অপরাধ। তাছাড়া, এ কর দেওয়া মানেই অত্যাচারকে মেনে নেওয়া নয় কি? আচ্ছা বল তো, জুডাস নিজেকে 'মেসায়া' (পরিত্রাতা) বলে দাবী করছে—এ-কথা কি সত্যি? তুমি তো তার অনুচরদের মধ্যেই বাস কর।"

"আমি শুনেছি তার অনুচররা বলে যে সে 'মেসায়া'", জোসেফ জবাব দিল।

ঠিক সেই সময় অবগুণ্ঠনটা সরে গেল, আর মুহূর্তের জন্য স্ত্রীলোকটির মুখখানি দেখা গেল। অতি সুন্দর মুখখানি রাব্বির চোখেও পড়ল। তার চোখের দৃষ্টি আগ্রহে তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। স্ত্রীলোকটির মুখ লাল হয়ে উঠল। সে গুণ্ঠন টেনে দিল।

রাজনীতিক তার বিষয়বস্তু ভুলে গেল।

নীচু গলায় বলল, "তোমার মেয়েটি সুন্দরী।"

"সে আমার মেয়ে নয়," জোসেফ বলল।

রাব্বির কৌতূহল বেড়ে গেল। তাই দেখে জোসেফ বলল, "সে তো বেথলেহেম-এর জোয়াকিম ও আন্নার মেয়ে। তাদের নাম তুমি নিশ্চয়

শুনেছ। এখন অবশ্য দুজনই মারা গেছেন। তাদের দুটি মেয়ে মারিয়ান ও মেরি। ও তাদেরই একজন। আইন অনুসারে সম্পত্তির অর্ধাংশ পেতে হলে তাকে নিকটতম আত্মীয়কেই বিয়ে করতে হবে। সে এখন আমার স্ত্রী।"

"আর আগে ছিলে—"

"তার কাকা।"

"ঠিক ঠিক। যেহেতু তোমাদের দুজনেরই জন্ম বেথ্‌লেহেম-এ তাই রোমকরা তোমাকে বাধ্য করেছে ওকেও সেখানে নিয়ে যেতে।"

রাব্বি দুই হাত যুক্ত করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সক্ষোভে বলে উঠল; "ইস্রায়েল-এর ঈশ্বর এখনও বেঁচে আছেন! প্রতিশোধ তিনিই নেবেন।"

এই কথা বলেই সে চলে গেল। কথা না বাড়িয়ে জোসেফ ইতস্ততঃ ছড়ানো কাঁচ ঘাসগুলি কুড়িয়ে নিল। কিছুক্ষণ পরেই ফটক পার হয়ে তারা বাঁ দিকে বেথ্‌লেহেম-এর পথ ধরল। হিনোম উপত্যকায় নামবার পথটা অসমান, উঁচু-নীচু, জলপাই-গাছের জঙ্গলে ভরা। লাগামটা হাতে নিয়ে জোসেফ সাবধানে স্ত্রীলোকটির পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

তার বয়স পনেরো বছরের বেশী হবে না। মুখখানি ডিমের মত গোল, গায়ের রং যত না ফর্সা তার চাইতে বেশী ফ্যাকাসে। নাকটি নিখুঁত, ঠোঁট দুটি পুরুষ্টু, বড় বড় নীল দুটি চোখ, মাথাভর্তি সোনালি চুলের বন্যা। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চোখ তুলে দুই হাত আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে প্রার্থনা করছে।

ক্রমে 'রেফাইম'-এর প্রান্তর ঘুরে অবশেষে তারা 'মার ইলিয়াস'-এর উপরে উঠল। সেখান থেকে উপত্যকার ও-পারে একটা পাহাড়ের উপর পুরনো বেথ্‌লেহেম শহরের সাদা প্রাচীর চোখে পড়ল। তারা উপত্যকায় পথ ধরে নেমে গেল। সেখানে একটি ছোট জায়গায় অনেক লোকজন ও জীবজন্তুর ভিড়। তা দেখে জোসেফ-এর ভয় হল এই ঘিঞ্জি শহরে যদি মেরির জন্য ঘর না পাওয়া যায়। আর দেরী না করে দ্রুত পা চালিয়ে তারা গ্রামের বাইরে চৌ-রাস্তার কাছে একটা 'খান'-এর ফটকের সামনে গিয়ে থামল।

'খান'-এ পেঁছে নাজারেথবাসীদের কপালে কি ঘটল সেটা ভালভাবে বুঝবার জন্য পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পাশ্চাত্য দেশের সরাই-খানার তুলনায় প্রাচ্য দেশের সরাইখানাগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। ফার্সি ভাষায় সেগুলোকে বলা হয় "খান"। সাধারণ 'খান'গুলো বেড়া-দেওয়া খানিকটা জায়গামাত্র, অনেক সময়ই ঘর বা চালা থাকে না, এমন কি অনেক সময় ফটক পর্যন্ত থাকে না। ছায়া, সুরক্ষা ও জলের সুবিধা দেখেই জায়গা-গুলো বেছে নেওয়া হয়। প্রধানত বাজার, কারখানা ও আত্মরক্ষার জায়গা

হিসাবেই এগুলিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যদিও বিলম্বে আগত কোন কোন ভ্রাম্যমান পথিককেও আশ্রয় দেওয়া হয়।

বেথ্‌লেহেম-এর যে 'খান'টিতে জোসেফ তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে উঠল সেটা অন্য সব 'খান'-এর তুলনায় অনেক ভাল—একেবারে বাজেও নয়, আবার রাজকীয় ব্যাপারও কিছু নয়।

'খান'-এর দরোয়ান ফটকের বাইরে একটা দেবদারুর গুঁড়ির উপর বসে ছিল। তার পিছনে একটা বর্শাকে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। পাশে একটা কুকুর শুয়ে আছে।

দরোয়ানের কাছে গিয়ে জোসেফ বলল, "জিহোভা তোমাকে শান্তি দিন।"

না নড়েচড়ে দরোয়ান গম্ভীর মুখে বলল, "আপনি যা দিলেন তাই ফিরে পাবেন, আর ফিরে পাবার সময় সেটা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।"

জোসেফ বলল, "আমি বেথ্‌লেহেম-এর লোক। এখানে কি একটা ঘর—?"

"ঘর নেই।"

"আমার নাম হয় তো শুনেছ—নাজারেথ-এর জোসেফ। এটা আমার পিতৃপুরুষদের বাড়ি। আমি ডেভিড-এর বংশধর।"

পরিচয়ে কাজ হল। দরোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সসম্মানে বলল, "রাব্বি, এ বাড়ির দরজা পথিকদের জন্য প্রথম কবে খোলা হয়েছিল আমি জানি না; তবে হাজার বছরেরও বেশী হবে; এই দীর্ঘকালের মধ্যে স্থান-সংকুলান হলে আজ পর্যন্ত কোন ভাল মানুষকে এখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি। আপনি তো ডেভিড-এর বংশধর। তাই আপনাকে আবার অভিবাদন জানাই। যদি দয়া করে আমার সঙ্গে আসেন তো দেখাতে পারি, এ বাড়িতে কোন ঘর খালি নেই—ভিতরে নয়, উঠোনে নয়, এমন কি ছাদেও না।"

জোসেফ তবু বলল, "কিন্তু উঠোনটা তো বেশ বড়।"

"তা ঠিক; কিন্তু নানা রকম মালপত্রে একেবারে বোঝাই।"

জোসেফ বলল, "আমার জন্য তো ভাবছি না, কিন্তু সঙ্গে আমার স্ত্রী রয়েছে; রাতটাও বেশ ঠাণ্ডা—এই পাহাড়ের উপরটা নাজারেথ-এর চাইতে অনেক বেশী ঠাণ্ডা। সে তো খোলা আকাশের নীচে থাকতে পারবে না। আচ্ছা, শহরেও কি কোন ঘর পাওয়া যাবে না?"

এবার দরোয়ান মাটিতে চোখ রেখে কি যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বলল, "আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পারি না রাব্বি। আপনার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। পাহাড়ের উপর আপনাকে পড়ে থাকতে হবে না।

আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসুন। তাড়াতাড়ি। আপনি তো জানেন; সূর্য পাহাড়ের ওপারে নেমে গেলেই রাতটা বড় তাড়াতাড়ি নেমে আসে।"

"গৃহহীন পথিকের আশীর্বাদ গ্রহণ কর," এই কথা বলে জোসেফ খুসি মনে চলে গেল এবং গাধাসহ মেরিকে নিয়ে এল।

দরোয়ান মেরিকে বলল, "যে গুহায় আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি সেখানে থাকতেন আপনাদের পূর্বপুরুষ ডেভিড। নীচের মাঠ থেকে, ওই দূরের কুয়ো থেকে তিনি তার ভেড়ার পালকে এখানে এনে নিরাপদে রাখতেন। পরবর্তী কালে তিনি যখন রাজা হলেন তখনও তিনি এই পুরনো বাড়িতে এসেই বিশ্রাম নিতেন, স্বাস্থ্য ভাল করতেন। তার সংগে থাকত অনেক জন্তু-জানোয়ার। সেদিনের সেই সব জাবনার পাত্র এখনও আছে। উঠোনে বা রাস্তার পাশে পড়ে থাকার চাইতে যে মেঝেতে একদিন তিনি ঘুমিয়েছেন সেখানকার একটি শয্যা অনেক ভাল। এই যে, আমরা এসে গিয়েছি।"

কাঠের হুড়কো তুলে দরজাটা খুলতেই মেরিকে গাধার পিঠ থেকে নামানো হল।

সকলে ভিতরে ঢুকে চারদিকে তাকাল। স্পষ্টই বোঝা গেল, ঘরটি কোন একটা গুহারই সম্মুখ ভাগ; সম্ভবত চল্লিশ ফুট লম্বা, ন'দশ ফুট উঁচু আর বারো বা পনেরো ফুট চওড়া। উঁচু-নীচু মেঝে, শষ্য ও খড়ের বোঝা, হাড়িকুড়ি ও গৃহস্থালির জিনিসপত্র—সব কিছুর উপর আলো এসে পড়েছে দরজার ভিতর দিয়ে। দেয়ালের পাশে সিমেণ্ট ও পাথরে বাঁধানো নীচু নীচু জাবনার পাত্র। কোন রকম বেড়ার বালাই নেই। পুরু হলুদে ধুলো জমেছে মেঝের উপর, এখানে-ওখানে ফাঁক-ফোকড়, ছাদ থেকে মাকড়সার জাল ঝুলছে ময়লা কাপড়ের মত। তাছাড়া জায়গাটা মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

দরোয়ান বলল, "ভিতরে আসুন। এই সব খড় রয়েছে আপনাদের মত যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য। যা দরকার হয় নেবেন।"

মেরির দিকে ফিরে বলল, "এখানে থাকতে পারবেন তো?"

"এ স্থান তো পবিত্র," সে জবাব দিল।

"তাহলে আমি যাচ্ছি। আপনারা শান্তিতে থাকুন।"

বেথ্‌লেহেম-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দেড় কি দু'মাইল দূরে পাহাড়ের ওপারে একটা বড় মাঠ আছে। সেখানে খাড়া পাহাড়ের গায়ে অনেক দিনের পুরনো একটা বড় 'মাড়া' বা ভেড়ার খোঁয়ার আছে। কালক্রমে ছাদ ধসে পড়ে বাড়িটা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু চারদিকে বেড়াটা অটুট থাকায় অনেক সময়ই মেষপালকরা দলবল নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে। পাথরের দেয়াল

মানুষ-সমান উঁচু। তবু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে-আসা ক্ষুধার্ত চিতা বা সিংহ যে কখনও কখনও লাফিয়ে ভিতরে আসে না তা নয়।

যা হোক পূর্বে বর্ণিত ঘটনার দিন একদল মেষপালক দলবল নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিল। সকাল থেকে তাদের হাঁকাহাঁকি, কুড়ুলের শব্দ, ভেড়া-ছাগলের ডাক, ঘণ্টার শব্দ, গরু-মোষের হাম্বা রব, ও কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দে জায়গাটা মুখরিত হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত গেলে তারা 'মাড়া'র ভিতর ঢুকে ফটকের পাশে আগুন জ্বালাল, রাতের সামান্য খাবার খেল, ও একজনকে পাহারায় রেখে বিশ্রাম করতে করতে গল্প-গুজব করতে লাগল।

পাহাড়ি অঞ্চলের শীতের রাতের মতই সেদিনের রাতটাও ছিল পরিষ্কার, খটখটে, তারায় ভরা। বাতাস ছিল না। আবহাওয়া অতি সুন্দর; স্তব্ধতা যেন নৈঃশব্দ্যের চাইতেও গভীরতর। চারদিকে পবিত্র নিস্তব্ধতা—উৎকণ্ঠ পৃথিবীর কানে কানে কোন শুভ সংবাদ জানাবার জন্য আকাশ যেন নীচে নেমে এসেছে।

আলখাল্লায় শরীর জড়িয়ে পাহারাদার ফটকের সামনে হেটে বেড়াচ্ছে। মধ্যরাত ঘনিয়ে এল। কর্তব্যকর্ম শেষে এবার তার বিশ্রামের অবসর। আগুনের দিকে পা বাড়িয়েও সে থেমে গেল। চাঁদের আলোর মত একটা সাদা নরম আলো যেন তার চারি দিকে জ্বলে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। আলোটা ঘনতর হল; আগে দেখা যাচ্ছিল না এমন অনেক কিছু দৃষ্টিগোচর হল; সারা মাঠটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতেও তীক্ষ্ন একটা বাতাসের ঝাপ্টা তার উপর আছড়ে পড়ল। সে উপরের দিকে তাকাল; তারারা নিভে গেছে; আকাশ থেকে একটা আলো নেমে আসছে। দেখতে দেখতে সেটা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হতে লাগল। সভয়ে সে চীৎকার করে উঠল: "জাগো, জাগো!"

কুকুরগুলো লাফিয়ে উঠে ডাকতে ডাকতে ছুটতে লাগল।

ভেড়া-ছাগলগুলো হতচকিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল।

লোকজন সব অস্ত্র হাতে ছুটে এল।

একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "কি হল?"

পাহারাদার বলল, "ওই দেখ! আকাশটা জ্বলছে!"

হঠাৎ আলোটা অসহ্য রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তারা চোখ ঢেকে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। ভয়ে তাদের বুক শুকিয়ে গেল; মূর্ছাহত হয়ে তারা উপুড় হয়ে পড়ে গেল; হয় তো মারাই যেত যদি না একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠত:

"ভয় নেই!"

তারা কান পাতল।

"ভয় নেই : চেয়ে দেখ, তোমাদের জন্য, সকল মানুষের জন্য পরম আনন্দের শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছি।"

মনে মনে তারা বুঝল, এ নিশ্চয় দেবদূতের কণ্ঠস্বর।

দেবদূত বলতে লাগল : "তোমাদের মধ্যেই ডেভিড-এর শহরে আজকের দিনে জন্ম নিলেন পরিত্রাতা—তিনিই প্রভু খৃস্ট!"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ ; কথাগুলি তাদের মনের মধ্যে গেঁথে গেল।

কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, "লক্ষণও তোমাদের বলে দিচ্ছি। জাবনার পাত্রে দেখতে পাবে শিশুকে, কাপড়ের পুটুলিতে জড়িয়ে শুয়ে আছে।"

বার্তাবহ আর কিছু বলল না ; শুভ সংবাদ বলা হয়ে গেছে। তবু আরও কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করে রইল। তারপর যে আলোর কেন্দ্রে সে ছিল সেটা গোলাপী আভা ধরে কাঁপতে লাগল। তারপর অনেক সাদা পাখা ঝলমলিয়ে উঠল ; অনেক উজ্জ্বল মূর্তির আনাগোনা শুরু হল ; শোনা গেল বহু কণ্ঠের ঐক্যতান :

"মাথার উপরে ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি হোক, পৃথিবীতে নামুক শান্তি, আর মানুষ লাভ করুক শুভবুদ্ধি!"

একবার নয়, এ বাণী ধ্বনিত হল বহু বার।

তারপর সেই বার্তাবহ উপরের দিকে তাকাল, যেন কারও সম্মতি প্রার্থনা করল ; তার পাখা নড়ে উঠল ; ধীরে ধীরে সে পাখা মেলল ; পাখার উপরটা বরফের মত সাদা, আর নীচের দিকটা মুক্তোর মত নানা বর্ণে বিচিত্র। পাখা মেলে দিয়ে অনায়াস ভঙ্গীতে ভাসতে ভাসতে সে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল ; আলোটাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলে মেষপালকরা বোকার মত একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত একজন বলে উঠল, "ইনি নিশ্চয় মানুষের কাছে প্রভুর বার্তাবহ গ্যাব্রিয়েল।"

কেউ কোন কথা বলল না।

"প্রভু খৃস্ট জন্মগ্রহণ করেছেন ; তাই সে বলল না ?"

এতক্ষণে আর একজন কথা বলল, "তাই তো বলল।"

"সে তো আরও বলল, ওই অদূরে আমাদের বেথলেহেম-এ ডেভিড-এর শহরে, তাই না ? আর পুটুলিতে জড়ানো একটি শিশুর রূপে আমরা তাঁকে দেখতে পাব ?"

"তিনি শুয়ে থাকবেন জাবনার পাত্রে!"

প্রথম বক্তা আগুনের দিকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ ভেবে দৃঢ় সংকল্পের স্বরে বলল, "জাবনার পাত্র রয়েছে এ রকম মাত্র একটা জায়গাই বেথলেহেম-এ আছে ; সেটা পুরনো 'খান'-এর নিকটবর্তী গুহার মধ্যে। ভাইসব, চল

আমরা সেখানে যাই। পুরোহিত ও চিকিৎসকরা অনেক দিন ধরে খৃস্টের প্রতীক্ষায় আছে। এবার তিনি জন্ম নিয়েছেন; প্রভুই আমাদের বলে দিয়েছেন সেই নিশানা যা দেখে তাঁকে আমরা চিনতে পারব। চল, সেখানে গিয়ে তাঁর পূজা করিগে।"

"কিন্তু আমাদের ভেড়ার পাল!"

"তাদের কথা প্রভুই ভাববেন। তাড়াতাড়ি চল।"

সকলেই উঠে 'মাড়া' ছেড়ে চলে গেল।

গুহার দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বিনা অনুমতিতেই তারা ভিতরে ঢুকল।

জোসেফকে বলল, "আমরা এসেছি একটি শিশুর খোঁজে যে আজ রাতে জন্মেছে এবং পুটুলিতে জড়িয়ে জাবনার পাত্রে শুয়ে আছে।"

মুহূর্তের জন্য জোসেফ-এর মুখখানি কেঁপে উঠল; ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "শিশুটি এখানেই আছে।"

একটা জাবনার পাত্রে শিশু শুয়ে আছে। মেষ-পালকরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোন লক্ষণ তো নেই; এ যে অন্য যে কোন একটি নবজাতকেরই মত।

"এর মা কোথায়?" তারা জিজ্ঞাসা করল।

একটি স্ত্রীলোক শিশুকে নিয়ে মেরির কাছে গেল; সেও পাশেই শুয়ে ছিল। শিশুকে তার কোলে দিল। মেষপালকরা দু'জনকে মিলিয়ে দেখতে লাগল।

"ইনিই খৃস্ট!" অবশেষে একটি মেষপালক কথা বলল।

"খৃস্ট!" নতজানু হয়ে সকলে সমস্বরে বলে উঠল। একজন বার বার বলতে লাগল: "ইনিই প্রভু; তাঁর গৌরব স্বর্গে-মর্তে প্রচারিত হোক।"

সরল লোকগুলির মনে কোন সন্দেহ নেই। মায়ের অঞ্চল-প্রান্তে চুমো খেয়ে তারা আনন্দিত মনে চলে গেল। 'খান'-এ ফিরে গিয়ে সকলকে এ কথা বলল। শহরের ভিতর দিয়ে 'মাড়া'তে ফিরবার পথে তারা দেবদূতদের মন্ত্রটিই উচ্চারণ করতে লাগল: "মাথার উপরে ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি হোক, পৃথিবীতে নামুক শান্তি, আর মানুষ লাভ করুক শুভ বুদ্ধি!"

সেই গুহায় শিশুর জন্মের একাদশ দিনের অপরাহ্ন বেলায় সেই তিন বিজ্ঞজন শেকেম-এর পথ ধরে জেরুজালেম-এ এসে হাজির হল। ছোট নদী সেড্রন পার হবার পরে অনেক মানুষের সঙ্গে তাদের দেখা হল। তাদের দেখে সকলেরই মনে কৌতূহল জাগল।

"ইহুদীদের রাজা হয়ে যিনি জন্মেছেন তিনি কোথায়?"

এ প্রশ্ন শুনে এবং পথিক তিনজনের চেহারা দেখে সকলেই তাদের পিছন পিছন শহরে এসে পেঁছিল।

তিনটে বড় রাস্তা যেখানে এসে মিলেছে সেখানে জনৈক রোমক রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল।

মিশরীয় লোকটি সান্ত্রীকে বলল, "ইহুদীদের রাজা হয়ে যিনি জন্মেছেন তাঁর সন্ধানে অনেক দূরে থেকে আমরা এসেছি। তুমি কি বলতে পার তিনি কোথায় ?"

সৈনিকটি শিরস্ত্রাণের ঢাকনা তুলে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল। ডান দিকের ঘর থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে সেখানে বেশ ভিড় জমে গেছে। হাতের বর্শাটা ঘোরাতে ঘোরাতে অফিসারটি হাঁক দিল, "রাস্তা ছাড় !" অনিচ্ছাসত্ত্বেও জনতা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

অফিসার বালথাজারকে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই ?"

বালথাজার সেই একই জবাব দিল, 'ইহুদীদের রাজা হয়ে যিনি জন্মেছেন তিনি কোথায় ?"

"হেরোড ?" অফিসার বিচলিত ভাবে বলল।

"হেরোড তো রাজগি পেয়েছেন সিজার-এর কাছ থেকে ; হেরোড নয়।"

"ইহুদীদের আর কোন রাজা নেই।"

"কিন্তু তাঁর নক্ষত্রকে যে আমরা দেখেছি ; তাই তাঁকে পূজো করতে এসেছি।"

রোমক বলল, "তাহলে আরও এগিয়ে যান। আমি ইহুদী নই। মন্দিরের চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসা করুন, অথবা পুরোহিত হান্নাসকে জিজ্ঞাসা করুন, অথবা সব চাইতে ভাল হয় যদি স্বয়ং হেরোডকে জিজ্ঞাসা করেন। ইহুদীদের অন্য কোন রাজা থাকলে তিনিই তাকে খুঁজে বের করবেন।"

সেদিন অনেক রাতে তিন জ্ঞানীজন 'খান'-এর উঠোনে জেগেই শুয়েছিল। তিনটে পাথরে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা তারাদের ঝিকিমিকি দেখছিল আর ভাবছিল : জেরুজালেম-এ তারা পেঁচেছে ; তাঁর জন্মের খবরও জেনেছে ; শুধু বাকি তাঁকে খুঁজে পাওয়া। খুঁজে পাবে তো ? ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য যারা কান পেতে থাকে, তাদের চোখে ঘুম আসে না।

খিলানের নীচ দিয়ে এসে একটি লোক অন্ধকার উঠোনে দাঁড়াল। বলল, "আপনারা জাগুন। আমি আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছি, আপনাদের শান্তি

কামনা করছি, আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি ; আমার মনিব স্বয়ং রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের আমন্ত্রণ করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে ; সেখানে তিনি গোপনে আপনাদের সংগে কথা বলবেন।"

বালথাজার বলল, "রাজার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা ; আমরা তোমার সংগে যাব।"

তিন ভাই বিনা বাক্যব্যয়ে সংবাদদাতার সংগে এগিয়ে চলল। তারার অস্পষ্ট আলোয় অনেক পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, লোক-লস্কর পেরিয়ে তারা একটি সুউচ্চ প্রাসাদে প্রবেশ করল। হঠাৎ থেমে একটা খোলা দরজা দেখিয়ে লোকটি বলল, "ঢুকে যান। রাজা ওখানেই আছেন।"

বিনা আহ্বানে ভিতরে ঢুকে লম্বা কার্পেটের এক প্রান্তে তারা ষাষ্টাংগে শুয়ে পড়ল। রাজা একটি ঘণ্টায় হাত রাখল। পরিচারক এসে সিংহাসনের সামনে তিনটি টুল রেখে গেল। রাজা সাদরে বলল, "বসুন।" তারা আসন গ্রহণ করলে আবার বলল, "আজ অপরাহ্নে উত্তর ফটক থেকে সংবাদ পেয়েছি; বহু দূর দেশ থেকে তিনটি অপরিচিত মানুষ এখানে এসেছেন। আপনারাই কি সেই লোক?"

গ্রীক ও হিন্দুর কাছ থেকে ইংগিত পেয়ে মিশরী সশ্রদ্ধ সেলাম জানিয়ে বলল, "শক্তিমান হেরোড, ধূপের সুরভির মত আপনার খ্যাতি সারা জগতে পরিব্যপ্ত ; আমরা যদি সেই লোক না হতাম তাহলে আপনি আমাদের ডেকে পাঠাতেন না।"

কথা শুনে হেরোড হাত নাড়ল।

"আপনারা কে? কোথা হতে আসছেন? প্রত্যেকে নিজের নিজের কথা বলুন।"

একে একে তারা নিজেদের সব কথা নিবেদন করল। কিছুটা হতাশ হয়ে রাজা সরাসরি প্রশ্ন করল, "ফটকে কর্তব্যরত অফিসারকে আপনারা কি প্রশ্ন করেছিলেন?"

"আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইহুদীদের রাজা হয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি কোথায়?"

"এখন বুঝতে পারছি লোকজনের এত কৌতূহল কেন। আপনারা আমাকেও উত্তেজিত করে তুলেছেন। ইহুদীদের আর একজন রাজা আছে নাকি?"

মিশরী মোটেই ঘাবড়াল না।

"একটি নবজাতক আছেন।"

রাজার কালো মুখে একটা ব্যথার রেখা ফুটে উঠল, যেন একটা ভয়ংকর স্মৃতি ভেসে এল মনের পটে।

"আমাকে নয়, আমাকে নয়!" সে চেঁচিয়ে বলল।

সম্ভবত অনেক নিহত শিশুর ছায়ামূর্তি তার সামনে দেখা দিল। যাই হোক, সে বিহ্বলতা কাটিয়ে রাজা দৃঢ়স্বরে বলল, "সে নতুন রাজা কোথায়?"

"হে রাজন, সে প্রশ্ন তো আমরাই করতে চাই।"

"আপনারা আমাকে একটি আশ্চর্য খবর দিলেন—এ ধাঁধার সমাধান সলোমনেরও সাধ্যের অতীত। যা হোক, আপনারা আমাকে আরও খবর দিন, আমি আপনাদের রাজোচিত সম্মান দেব। এই নবজাতক সম্পর্কে যা কিছু জানেন সব আমাকে বলুন, তার অনুসন্ধানে আমিও আপনাদের সঙ্গী হব। তাকে পেলে আপনারা যা বলবেন তাই করব। তাকে জেরুজালেম-এ নিয়ে আসব, রাজ্য-পরিচালনা শেখাব, তার উন্নতি ও গৌরববৃদ্ধির জন্য সিজার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমি কথা দিচ্ছি, তার আর আমার মধ্যে কখনও ঈর্ষার স্থান হবে না। কিন্তু তার আগে আমাকে বলুন, অনেক সমুদ্র ও মরুভূমির ব্যবধান সত্ত্বেও আপনারা তিনজনই তার কথা জানলেন কেমন করে?"

বালথাজার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "হে রাজন, সত্য কথাই বলব। এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন।"

হেরোড চমকে উঠল।

"তাঁরই আদেশে আমরা এখানে এসেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, জগতের ত্রাণকর্তাকে খুঁজে বের করব, তাঁকে দেখব ও পূজা করব, তাঁর আবির্ভাবের সাক্ষী হব। পথ-নির্দেশ হিসাবে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি করে তারা দিয়েছেন।"

বলতে বলতে তিনজনই অভিভূত হয়ে পড়ল। হেরোড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে পর পর তাকাতে লাগল; সে আগের চাইতেও সন্দিগ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে।

"আপনারা আমার সঙ্গে তামাসা করছেন। নইলে আরও যা জানেন তা বলুন। নতুন রাজার আগমনের ফল কি হবে?"

"মানুষের মুক্তি।"

"কিসের হাত থেকে মুক্তি?"

"তাদের পাপের হাত থেকে।"

"কেমন করে?"

"ঈশ্বরের নির্দেশে—বিশ্বাস, ভালবাসা ও সৎকর্মে।"

"তাহলে"—হেরোড থামল; তার চোখ দেখে কেউ তার মনের ভাব বুঝতে পারবে না—"আপনারা খৃস্টের বার্তাবহ? এই তো?"

"হে রাজন, আমরা আপনার ভৃত্য।"

রাজা ঘণ্টা স্পর্শ করল। পরিচারক এল।

"উপহারগুলো নিয়ে এস।"

পরিচারক বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে অতিথিদের সামনে নতজানু হয়ে প্রত্যেককে দিল লাল-নীল কাপড়ের একটি বহির্বাস ও একটি সোনার কটিবন্ধ। প্রাচ্যদেশীয় প্রথামত তারা আভূমি নত হয়ে সে দান গ্রহণ করল।

হেরোড উঠে দাঁড়াল। বোঝা গেল রাজ-দর্শন শেষ হয়েছে। সিংহাসন থেকে নামতে নামতে সে বলল, "আমি বলছি, আপনারা বেথ্‌লেহেম-এ চলে যান, নবজাতকের অনুসন্ধান করুন; তার সন্ধান পেলে আবার এসে আমাকে জানাবেন, যাতে আমিও গিয়ে তাকে পূজা করতে পারি। পথে কেউ আপনাদের বাধা দেবে না। আপনাদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক।"

বহির্বাসে দেহ ঢেকে সে সভাকক্ষ থেকে চলে গেল।

রক্ষী এসে তিনজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এবং 'খান' পর্যন্ত পৌঁছে দিল। তখন গ্রীক বলল, "চল ভাই, আমরা বেথ্‌লেহেম-এ যাই।"

হিন্দু বলল' "ভাই চল!"

বাল্‌থাজার বলল, "তাই হোক। উটগুলোও তৈরি।"

উট-রক্ষককে উপহারাদি দিয়ে তারা উটের পিঠে চেপে বসল। জোপ্পা ফটক পেরিয়ে শুরু হল তাদের যাত্রা।

বেথ্‌লেহেম-এর পূর্বাকাশে পর্বতশিখরে ঊষার আবির্ভাব আসন্ন; কিন্তু উপত্যকার বুকে এখনও রাতের অন্ধকার। পুরনো 'খান'-এর ছাদে দাঁড়িয়ে শীতের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে চৌকিদার প্রথম জাগ্রত জীবনের শব্দ শুনবার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এমন সময় একটি আলোক-শিখা পাহাড় পেরিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রথমে ভাবল, সেটা কোন মানুষের হাতের মশাল; পরমুহূর্তে মনে হল একটা ধূমকেতু; কিন্তু উজ্জ্বলতা ক্রমেই বাড়তে বাড়তে সেটা দেখা দিল একটি নক্ষত্র হয়ে। ভীষন ভয় পেয়ে সে চীৎকার করে উঠল, আর সে চীৎকার শুনে বাড়ির সকলেই ছাদে উঠে এল। যারা ভীরু তারা মুখ ঢেকে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল; যারা সাহসী তারাও চোখ ঢেকে মাঝে মাঝে সভয়ে সেদিকে তাকাতে লাগল। ক্রমে পুরো 'খান'টাই দুঃসহ ঔজ্জ্বল্যে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করতে লাগল। যারা তখনও সাহস করে তাকাল তারা দেখতে পেল, যে-গুহার ভিতরে শিশু-ভগবানের জন্ম হয়েছে নক্ষত্রটি তার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক সেই সময়ে জ্ঞানীজনরা সেখানে উপস্থিত হয়ে উটের পিঠ থেকে নেমে

ভিতরে ঢুকবার জন্য হাঁক দিতে লাগল। পরিচারক কোন রকমে ভয়কে দূর করে হুড়কো তুলে দরজাটা খুলে দিল।

"এটা কি জুডিয়ার বেথ্‌লেহেম নয়?"

"না, এটা একটা 'খান'; শহর আরও এগিয়ে।"

"এখানে কি একটি নবজাত শিশু আছে?"

সকলে অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। কেউ কেউ বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলুন," গ্রীক অধীরভাবে বলল।

বাল্‌থাজার বলল, "আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলুন, কারণ তাঁর তারাকে দেখেই আমরা এসেছি, ঠিক যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের বাড়ির মাথায়। আমরা এসেছি তাঁকে পূজা করতে।"

হিন্দু দুই হাতে জোড় করে হাঁক দিল, "ঈশ্বর আছেন। ত্বরা করুন; ত্বরা করুন! ত্রাণকর্তাকে পেয়েছি। ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য!"

সকলেই ছাদ থেকে নেমে নবাগতদের পিছন পিছন চলতে লাগল। গুহার মাথার উপরে তারাটি তখনও জ্বলছে। নবাগতরা বাড়ির কাছে পৌঁছতেই আলোর বৃত্তটা উঠতে লাগল; তারা যখন দরজার কাছে গেল, আলোটা তখন আরও উপরে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগল; তারা ভিতরে ঢুকল, আর সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। তারই আলোয় নবাগতরা দেখতে পেল মাকে, আর তার কোলে জাগ্রত শিশু-ভগবানকে।

"শিশুটি কি আপনার?" বাল্‌থাজার মেরিকে জিজ্ঞাসা করল।

শিশুটিকে আলোর সামনে তুলে ধরে সে বলল, "এটি আমার ছেলে!"

নত হয়ে তারা তাঁকে পূজা করল।

অন্য সব শিশুর মতই একটি শিশু; মাথায় নেই আলোর বৃত্ত, নেই কোন মুকুট; মুখেও ফুটল না কোন বাণী। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লণ্ঠনের আলোর দিকে, তাদের দিকেও নয়।

একটু পরে তারা বেরিয়ে গেল এবং সোনা, ধূপ ও গন্ধদ্রব্যের উপহার এনে শিশু-ভগবানের সামনে রাখল।

এই কি সেই ত্রাণকর্তা যাঁকে দেখতে তারা এত দূর হতে এসেছে!

তবু দ্বিধাহীন প্রাণে তারা তাঁকে পূজা করল।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

এবার পাঠককে একুশটি বছর পার হতে হবে। তখন জুডিয়া-র চতুর্থ রাজকীয় শাসনকর্তা ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস-এর শাসনকাল চলছে।

ইতিমধ্যে জুডিয়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে—বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে। শিশু-ভগবানের জন্মগ্রহণের এক বছরের মধ্যেই মহান হেরোড-এর মৃত্যু হয়—সে মৃত্যু এতই শোচনীয় যে খৃস্টীয় জগতের বিশ্বাস, ঈশ্বরের ক্রোধ নেমেছিল তার উপরে। হেরোড নিজ রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করে তিন ছেলে অ্যান্টিপাস, ফিলিপ ও আর্কেলস-কে দিয়ে গেল; আর শেষোক্তকে করে গেল রাজা। তার সেই উইল সম্রাট অগাস্টাস সিজারের কাছে পাঠান হল তার সমর্থনের জন্য। সিজার রাজ্যের অংশীদারী ব্যবস্থা মেনে নিল, কিন্তু আর্কেলসকে রাজা হতে দিল না। শুধু তাই নয়; ন' বছর শাসনকার্য পরিচালনার পরে তাকে নির্বাসিত করা হল গল-এ।

সিজার জুডিয়াকে রোমের অধীনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত করল ও তাকে সিরিয়ার সংগে যুক্ত করে দিল। ফলে মাউন্ট জিয়ন-এ হেরোডের রাজপ্রসাদ থেকে একজন রাজার অধীনে পরিচালিত না হয়ে জুডিয়ার শাসনভার তুলে দেওয়া হল দ্বিতীয় শ্রেনীর অফিসার প্রকিউরেটর-এর হাতে; আর তাকেও রোমের রাজ-দরবারের সংগে যোগাযোগ রাখতে হল এণ্টিয়ক-এর সিরীয় সংঘের মাধ্যমে। প্রকিউরেটর-এর রাজধানীও জেরুজালেম থেকে উঠে গেল সিজারিয়াতে। আর যেটা সব চাইতে দুঃখের ও বেদনার কথা, সর্বাপেক্ষা ঘৃনিত সামারিয়াকে জুডিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

গ্র্যাটাস শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েই একটি নতুন কাজ করে বসল। হান্নাসকে প্রধান পুরোহিতের পদ থেকে সরিয়ে সে মর্যাদা দান করল ফেবুস-এর ছেলে ইশ্মায়েলকে।

এই পরিবর্তিত পরিবেশকে স্মরণ রেখে পাঠককে এবার যেতে হবে মাউন্ট জিয়ন-এর প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ের একটি প্রতপ্ত-দুপুর। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ।

সে সব কিছুকে উপেক্ষা করে দুটি কিশোর গভীর আলোচনায় মগ্ন। তাদের বয়স একজনের ঊনিশ, অপর জনের সতেরো।

দু'জনই সুন্দর। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে তারা দুই ভাই। দুজনেরই মাথার চুল ও চোখ কালো, মুখ গাঢ় বাদামি, আর আকৃতি বয়সানুপাতিক। বড়টির মাথা খোলা, পরনে ঢিলা ঘাগরা-জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল ও হাল্কা নীল রংয়ের একটা চাদর তার আসনের উপর পাতা। এ থেকেই বোঝা যায় সে রোমক। সে যদি মাঝে মাঝে উদ্ধত ভংগীতে তার সংগীর দিকে তাকিয়ে থাকে

এবং মর্যাদায় নীচু মনে করে তার সঙ্গে কথা বলে থাকে, সেজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে রোমের একটি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। প্রথম সিজার ও তার শত্রুদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় জনৈক মেসালা ছিল ব্রুটাস-এর বন্ধু। ফিলিপ্পির যুদ্ধের পরে সে পুনরায় বিজয়ীর সঙ্গে মিলিত হল। তবু পরবর্তীকালে অক্টেভিয়াস যখন সাম্রাজ্য দাবী করে বসল, মেসালা তখন তাকেই সমর্থন করল। অক্টেভিয়াস সম্রাট অগস্টাসরূপে শাসনভার গ্রহণ করে তার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে তাকে পুরস্কৃত করল। জুডিয়ার কর আদায় ও তার বিলি ব্যবস্থার ভার দিয়ে বৃদ্ধ মেসালার ছেলেকে সে জেরুজালেম পাঠিয়ে দিল। সেই থেকে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে একই রাজপ্রাসাদে থেকে সে ঐ চাকরি করে যাচ্ছে। যে যুবকটির কথা এইমাত্র বলা হল সে তারই ছেলে।

মেসালার সঙ্গীটি দেখতে অপেক্ষাকৃত ছোট; তার পরনে জেরুজালেম-এ প্রচলিত সাদা মিহি কাপড়ের পোষাক। এক টুকরো কাপড় দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা; সেটা হলুদ রশি দিয়ে বাঁধা। দেখলেই বোঝা যায় সে ইহুদী বংশের ছেলে। রোমক ছেলেটির রূপ কঠোর ও সুচারু, আর ইহুদি ছেলেটির রূপ ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের দ্যোতক।

ছেলেটি বলল, "তাহলে নতুন প্রকিউরেটর কাল আসছেন?"

"হ্যাঁ, আগামী কাল," মেসালা জবাব দিল।

"তোমাকে কে বলেছে?"

"কাল রাতে নতুন শাসনকর্তা ইশ্মায়েল—তোমরা যাকে প্রধান পুরোহিত বল—আমার বাবাকে কথাটা বলছিলেন।"

ইহুদী ছেলেটি অন্যমনস্কভাবে সামনের জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

"এই বাগানেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। প্রভুর আশীর্বাদ তোমার সঙ্গী হোক'—এই ছিল তোমার শেষ কথা। আমি বলেছিলাম, 'ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।' তোমার মনে পড়ে জুডা? সে আজ কতদিন হল বলতো?"

চোখ তুলে তাকিয়ে জুডা বলল, "পাঁচ বছর। বিদায়ের ক্ষণটি মনে পড়ে। তুমি রোম-এ চলে গেলে। তোমাকে যেতে দেখে আমি কেঁদেছিলাম, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসতাম। কত বছর পরে তুমি ফিরে এসেছ পণ্ডিত হয়ে রাজকীয় মর্যাদায়—আমি তোমাকে হিংসা করছি না; তবু-তবু—তুমি যদি আজও সেই মেসালাই থাকতে।"

রোমক হাসল।

"জুডা, তোমাকে কি আমি আঘাত করেছি?"

ইহুদী ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল, "পাঁচ বছরে আমিও কিছু কিছু

শিখেছি। গ্রেট কলেজ-এ পড়ে এটুকু বুঝেছি যে জুডিয়া আর সে জুডিয়া নেই। একটা স্বাধীন রাজ্য আর আজকের তুচ্ছ জুডিয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ। একজন সামারিটান-এর চাইতেও আমি নীচ বলেই দেশের প্রতি এই অসম্মানের প্রতিবাদ আমি করি নি। ইশমায়েল আইনত প্রধান পুরোহিত নয়; যতদিন হান্নাস্ বেঁচে আছেন ততদিন হতেও পারবে না।"

মেসালা তীক্ষ্ন হাসিতে ফেটে পড়ল।

"এতক্ষণে তোমাকে বুঝতে পারছি। তুমি বলতে চাইছ, ইশমায়েল এখানে জবরদস্তি বসেছেন। দেখ, সব মানুষ, সব জিনিস, এমন কি স্বর্গ-মর্তও বদলায়, শুধু বদলায় না একজন ইহুদী। তার কাছে এগনোও নেই, পিছনোও নেই; তার পূর্বপুরুষ যা ছিল, আজও সে তাই আছে। বালির উপরে একটা বৃত্ত আঁকছি—এই দেখ। এবার বল, একজন ইহুদীর জীবন-এর চাইতে বড় কিসে। একই চক্রে পরিক্রমণ—এখানে আব্রাহাম; ওখানে আইজাক ও জ্যাকব; আর মাঝখানে ঈশ্বর। আর এই বৃত্তটা—না, বৃত্তটা খুবই বড় হয়ে গেছে। আবার টানছি। বালির উপর বুড়ো আঙুলটা রেখে বাকি আঙুলগুলো চারদিকে ঘুরিয়ে দিল। "দেখ, এই বুড়ো আঙুলের নীচটা হল মন্দির, আর আঙুলের টানটা হল জুডিয়া। এই সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে কি কিছুই ভাল নেই? শিল্প! হেরোড বাড়ি-ঘর বানিয়ে ছিলেন বলে তাকে অভিশাপ দেওয়া হয়। চিত্র, ভাস্কর্য! সে সব দেখাও পাপ। কাব্য শুধু আছে পুজার বেদীতে। ধর্ম-সভার বাইরে তোমাদের মধ্যে কে কবে বক্তৃতা করেছে? যুদ্ধে তোমরা ছ'দিনে যা জয় কর সপ্তম দিনেই তাকে হারাও। এই তো তোমাদের সীমিত জীবন। তোমাকে দেখে যদি আমার হাসি পায় তো কে তাতে বাধা দেবে? ওঃ, প্রিয় জুডা, তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়!"

জুডা শান্ত ভাবে বলল, "এবার বিদায় নেওয়াই ভাল। না এলেই ভাল করতাম। চেয়েছিলাম একটি বন্ধুকে, পেলাম একটি—"

"রোমককে," মেসালা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

ইহুদীর হাত মুষ্টিবদ্ধ হল; তবু নিজেকে সংযত করে সে পা বাড়াল। মেসালা উঠে দাঁড়িয়ে চাদরটা তুলে নিয়ে কাঁধে উপর ফেলে তার পিছু নিল। তার পাশে পৌঁছে তার কাঁধেই হাত রেখে মেসালা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

"যখন ছোট ছিলাম তখন এই ভাবে—এই ভাবে হাতটা রেখে আমরা হাঁটতাম। চল; ফটক পর্যন্ত এইভাবেই চলি।"

জুডা এই অন্তরঙ্গতাটুকু মেনে নিল।

কয়েক গজ এগিয়ে রোমক আবার বলল, "এবার আমার কথা শোন, কারণ কথাগুলি তোমাকে নিয়ে। আমি তোমার উপকার করতে চাই—সত্যিকারের

শুভেচ্ছা নিয়েই তোমার কাজে লাগতে চাই। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে বলেছি, আমি সৈনিক হতে চাই। তুমিও কেন সৈনিক হও না? এই সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এস না?"

জুডা জবাব দিল না।

মেসালা বলতে লাগল, "বুদ্ধিমান হতে চেষ্টা কর। মোজেস ও গতানুগতিকতার বোকামি ছাড়। পরিস্থিতির মোকাবিলা কর। সবাইকে জিজ্ঞাসা কর, তারা বলবে রোমই তো জগৎ। জুডিয়ার কথা জিজ্ঞাসা কর, তারা বলবে, সে তো রোম-এর ইচ্ছাধীন।"

তারা ফটকে পেঁছে গেল। জুডা থামল, কাঁধ থেকে হাতটা আস্তে নামিয়ে দিল, মেসালার মুখোমুখি দাঁড়াল, তার চোখে জলের ফোঁটা কাঁপছে।

"আমি তোমাকে বুঝতে পারি, কারণ তুমি রোমক; তুমি আমাকে বুঝতে পার না—আমি ইস্রায়েলী। একদিন যে বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে ছিল তা আর ফিরে আসবে না—কোন দিন না, এ কথা বুঝিয়ে দিয়ে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। তাই বিদায়। আমার পূর্বপুরুষের ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন!"

মেসালা হাত বাড়াল; ইহুদী ফটক পেরিয়ে হেঁটে চলল। সে চলে গেলে রোমক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলে উঠল, "তাই হোক। প্রেমের দেবতার মৃত্যু হল, রণ-দেবতার জয় হোক!"

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে জুডা একটা দুর্গের মত বাড়ির পশ্চিম ফটকে এসে দাঁড়াল। ফটকের ছোট কাটা দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল। দরোয়ানের নীচু সেলামটা নিতেও ভুলে গেল।

একটা ঘরে ঢুকে দরজার পর্দাটা ফেলে দিতেই ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। আর একটু এগিয়ে একটা ডিভান-এর উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। মাথাটা রাখল দুটো হাতের উপর।

রাত হল। একটি স্ত্রীলোক তাকে ডাকতেই সে সাড়া দিল। ঘরে ঢুকে স্ত্রীলোকটি বলল, "সকলের খাওয়া হয়ে গেল, রাত হল, ছেলের কি এখনও ক্ষিধে পেল না?"

"না।"

"তোমার কি অসুখ করেছে?"

"আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"তোমার মা ডাকছেন।"

"মা কোথায়?"

"ছাদের উপরে, ঠাণ্ডা-ঘরে।"

সে উঠে বসল।

"ঠিক আছে। কিছু খাবার নিয়ে এস।"

স্ত্রীলোকটি চলে গেল। একটু পরেই খাবার নিয়ে ফিরে এল। কাঠের পাত্রে দুধ, পিঠে, রুটি, সিদ্ধ পাখি, মধু ও নুন। পাত্রের এক কোণে মদের গ্লাস ও একটা জ্বলন্ত পিতলের প্রদীপ।

সে আলোয় স্ত্রীলোকটিকে ভালভাবে দেখা গেল। বয়স পঞ্চাশ বছর; চামড়া কালো, চোখ কালো, তাতে মাতৃত্বের মাধুর্য মাখানো। একটা সাদা পাগড়িতে মাথাটা ঢাকা, শুধু কানের লতি দুটো দেখা যাচ্ছে—তুরপুণ দিয়ে কানের লতি ছিদ্র করা। সে একজন মিশরীয় ক্রীতদাসী; পঞ্চাশ বছরেও তার কপালে মুক্তি জোটে নি: মুক্তি পেলেও সে নিত না, কারণ এই ছেলেটি তার জীবন। শিশুকাল থেকেই সে তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, কোন দিন কাজ ছাড়তে পারে নি। তার ভালবাসার কাছে ছেলেটি কোন দিনই বড় হবে না।

খেতে খেতে ছেলেটি বলল, "মেসালাকে তোমার মনে আছে আমরাহ্? এক সময় রোজ আমাদের বাড়িতে আসত?"

"মনে আছে।"

"কয়েক বছর আগে সে রোমে গিয়েছিল; এখন ফিরে এসেছে। আজ তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

ছেলেটি বিরক্তিতে কেঁপে উঠল।

স্ত্রীলোকটি বলল, "আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে একটা কিছু ঘটেছে। মেসালাকে আমার কোন দিনই ভাল লাগত না। সব কথা খুলে বল।"

ছেলেটি চুপ করে গেল। অনেক বার প্রশ্ন করায় শুধু বলল, "সে অনেক বদলে গেছে; তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।"

আমরাহ্ খাবার পাত্র নিয়ে চলে গেল। ছেলেটিও ধীরে ধীরে ছাদে উঠে গেল।

তার পায়ের শব্দ শুনে ডিভানে হেলান দেওয়া অবস্থাতেই তার মা তাকে ডাকল, "জুডা, আয় বাবা!"

জুডা মার সামনে গিয়ে নতজানু হল। মা তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বুকে টেনে নিল।

ছেলের গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বলল, "আমার জুডা এখন বড় হয়েছে; তাকে ভুললে চলবে না যে একদিন তাকে মানুষ হতে হবে।"

"আমি মানুষ হতেই চাই মা, তুমি আমাকে পথ বলে দাও। তুমি তো বিধান জান মা—প্রত্যেক ইস্রায়েলীকেই কোন না কোন কাজ করতেই হবে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি কি কাজ

করব ? ভেড়া চরাব ? লাঙল চালাব ? করাত টানব ? না করণিক বা আইনজীবী হব ? আমি কি হব ? মাগো, সে কথা তুমিই বলে দাও।"

একটু থেমে সে আবার বলল, "আজ আমি মেসালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার কথাগুলি অসহ্য। আচ্ছা মা, একজন রোমক যা করতে পারে একজন ইস্রায়েলীর ছেলে তা করতে পারে না কেন ?"

মা বলল, "মেসালা কি বলেছে সব আমাকে খুলে বল।"

সবই সে বলল। বিশেষ করে বলল, ইহুদীদের প্রতি, তাদের রীতিনীতির প্রতি, তাদের একঘেয়ে জীবনযাত্রার প্রতি তার ঘৃণার কথা।

ভাল করে ভেবে মা বলল, "দেখ বাবা, একজন রোমক যখন ইস্রায়েলীদের অবজ্ঞার চোখে দেখে হাসে, তখন সে মিশরীয়, আসিরীয় ও ম্যাসিডোনীয়দের বোকামিরই পুনরাবৃত্তি করে ; আর যেহেতু সে বিদ্রূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, তাই তার ফলও হয় একই।"

তার কণ্ঠস্বর দৃঢ়তর হল।

"তোমার বন্ধু—অথবা তোমার প্রাক্তন বন্ধু—অভিযোগ করেছে যে আমাদের মধ্যে কোন কবি, শিল্পী বা যোদ্ধা জন্মে নি ; অর্থাৎ সে বলতে চায় যে আমাদের মধ্যে কোন মহৎ মানুষের আবির্ভাব হয় নি। এই প্রসঙ্গে আমাদের মহান পুরুষদের কথা আমি তোমাকে বলছি ; রোমের যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। আমাদের আছেন মোজেস, ওদের সিজার ; আমাদের ডেভিড, ওদের টারকুইন ; আছেন সিলা আর ম্যাকাবি ; ওদের অগাস্টাস, আমাদের সলোমন। বাস, তুলনা এখানেই শেষ। কিন্তু এবার ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের কথা ভাব—সেখানে আমরাই তো শ্রেষ্ঠ।"

মার ঠোঁটে ঘৃণার হাসি ফুটে উঠল।

"আর যদি জানতে চাও তুমি কি করবে, তাহলে বলি—প্রভুর সেবা কর, রোমের প্রভু নয়, ইস্রায়েল-এর প্রভু। আব্রাহাম-এর বংশধরের কাছে তাঁর পথে চলার চাইতে অধিক গৌরবের কিছু নেই।"

"তাহলে আমি সৈনিক হতে পারব ?" জুডা প্রশ্ন করল।

"কেন পারবে না ? মোজেস কি ঈশ্বরকে যোদ্ধা বলেন নি ?"

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হল না।

অবশেষে মা বলল, "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম ; কিন্তু তুমি সেবা করবে প্রভুর, সিজারের নয়।"

জুডার মন খুসিতে ভরে উঠল। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। মা উঠে গিয়ে তার মাথার নীচে কুশনটা দিয়ে দিল, একটা শাল দিয়ে তাকে ঢেকে দিল, তারপর পরম আদরে তাকে চুমো খেয়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ছোট বোনের গান শুনে জুডার ঘুম ভেঙে গেল। বোনটির নাম টির্জা।

"সুন্দর টির্জা, অতি সুন্দর;" সে সোৎসাহে বলল।

"গান ?" টির্জা প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ—আর গায়িকাও। ছোট বোনটিকে নিয়ে আমার গর্বের শেষ নেই। এত ভাল গান তুমি কি আরও জান ?"

"অনেক। কিন্তু সে সব এখন থাক। আমরাহ্ বলে পাঠিয়েছে, সে তোমার প্রাতরাশ নিয়ে আসছে ; তোমাকে আর নীচে নামতে হবে না।"

"তুমি কি বল টির্জা ?—আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

টির্জা অবাক হয়ে বলল, "চলে যাচ্ছে ? কবে ? কি জন্য ?"

সে হাসতে লাগল। "এক নিঃশ্বাসে তিনটি প্রশ্ন ! আচ্ছা লোক বটে তুমি। তুমি তো জান, আইন বলে যে প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে। আমি রোম-এ যাচ্ছি।"

"কিন্তু তোমাকে কি যেতেই হবে ? যদি ভাল ব্যবসায়ী হতে চাও, সে সব তো এখানে জেরুজালেম-এই শিখতে পার।"

"কিন্তু আমি ব্যবসার কথা ভাবছি না। আমি সৈনিক হতে চাই।"

"তুমি তো মারা পড়বে।" টির্জার চোখে জল এসে গেল।

"ঈশ্বরের যদি তাই ইচ্ছা হয় তো হবে। কিন্তু টির্জা, সব সৈনিকরাই কিছু মারা পড়ে না।"

টির্জা তবু ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

জুডা বুদ্ধিমানের মত বলতে লাগল, "যুদ্ধও একটা জীবিকা। সেটাকে ভাল ভাবে শিখতে হলেও বিদ্যালয়ে যেতে হয়, আর রোমক শিবিরের মত ভাল বিদ্যালয় আর কোথাও নেই।"

"কিন্তু তুমি তো রোম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।?"

"হ্যাঁ, করব। রোম-এর পক্ষে যুদ্ধ করব যদি বিনিময়ে সে আমাকে শেখায় কেমন করে একদিন তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে পারব।"

"তুমি কবে যাবে ?"

আমরাহ্‌র পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সে বলে উঠল, "স্-স্। আমার মনের কথা ওকে বলো না।"

আমরাহ্ প্রাতরাশ নিয়ে এসে সাজিয়ে দিল। ভাই-বোন প্রাতরাশের জন্য সবে জলের বাটিতে আঙুল ডুবিয়েছে এমন সময় একটা শব্দ কানে এল। তারা কান পাতল। বাড়ির উত্তর দিকের রাস্তায় সামরিক বাজনা বাজছে।

ডিভান থেকে লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে বাইরে যেতে যেতে জুডা বলল, "প্রিটোরিয়াম থেকে সৈন্য এসেছে ! আমি দেখতে যাচ্ছি।"

মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে ছাদের একেবারে পূর্ব-উত্তর কোণের টালির আলসের উপর ঝুঁকে সে নীচে তাকাল। টির্জা যে তার কাঁধে একটা হাত রেখে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে খেয়ালও তার নেই।

সেনাদলের মধ্যে একমাত্র অফিসারটিই অশ্বারোহণে চলেছে। তার মাথা খোলা; অন্যথায় পূর্ণ অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত।

লোকটি এখনও অনেক দূরে, তবু তাকে দেখেই লোকজনরা ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। আলসের উপর ঝুঁকে, বা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ঘুসি দেখাচ্ছে; চীৎকার করতে করতে তার পিছন পিছন চলেছে; সে যখন সেতুর নীচ দিয়ে যাচ্ছে তখন তার দিকে থুথু ফেলছে; মেয়েরা স্যাণ্ডেল ছুঁড়ে মারছে; কখনও তার গায়ে গিয়েও পড়ছে। সে আরও কাছে এলে চীৎকারটা স্পষ্ট শোনা গেল—"ডাকাত, অত্যাচারী, রোমক কুকুর! ইশ্মায়েল দূর হও! হান্নাসকে ফিরিয়ে দাও!"

ছেলেটি জানে যে, একমাত্র প্রধান সেনাপতিই প্রকাশ্যে মাথায় দ্রাক্ষা-লতার মালা পরতে পারে। সেই চিহ্ন দেখেই সে বুঝল যে এই অফিসারটি—ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস, জুডিয়ার নতুন প্রকিউরেটর!

রোমকটি তাদের বাড়ির কোণে উপস্থিত হতেই তাকে ভালভাবে দেখবার জন্য আরও ঝুঁকতে গিয়ে জুডো আলসের একটা ফাটা টালির উপর হাতটা রাখল। কিন্তু হাতের চাপটা বেশী হওয়ায় টালিটা খুলে পড়ল। যুবকটি আতংকে কেঁপে উঠল। টালিটাকে ধরে ফেলবার জন্য সে হাত বাড়াল। দেখে কিন্তু মনে হল, সে যেন ওটা ছুঁড়ে মারছে। ছেলেটির চেষ্টা বিফল হল—বরং হাতের ধাক্কা লেগে সেটা আরও জোরে দেয়ালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল। রক্ষী সৈনিকরা উপরে তাকাল; মহামান্য সেনাপতিও তাকাল; আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটন্ত টালিটা তাকে আঘাত করল; মরার মত সে আসন থেকে পড়ে গেল।

সশস্ত্র সেনাদল থেমে গেল; রক্ষীরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে বর্ম তুলে তাদের দলপতিকে বাঁচাতে চেষ্টা করল। অপর দিকে, সমবেত জনতা যারা ব্যাপারটা দেখেছিল তারা ধরে নিল যে ছেলেটি ইচ্ছা করেই এ কাজ করেছে, আর তাই তাকে বাহবা দিতে লাগল।

সব দেখেশুনে ছেলেটি তো হতভম্ব। এ ঘটনার ফলাফল ভেবে সে আতংকিত হল।

ম্লান মুখে আলসে থেকে সরে গিয়ে বলে উঠল, "টির্জা, টির্জা! এখন আমাদের কি হবে?"

মেয়েটি ঘটনাটি দেখে নি। তবু দাদার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে বলল, "কি হয়েছে? এ সবের অর্থ কি?"

"রোমক শাসনকর্তাকে আমি মেরে ফেলেছি। টালিটা তার উপর ছিটকে পড়েছে।"

"ওরা এখন কি করবে?"

বোনকে নিয়ে সে ঠাণ্ডা-ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছিল, এমন সময় নীচ থেকে প্রচণ্ড গোলমাল ও দরজা ভাঙবার শব্দ ভেসে এল। সৈন্যরা উত্তরের ফটকটা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। এবার তাকে ধরবে। এই ভয়ে প্রথম ভাবল পালিয়ে যাবে; কিন্তু কোথায় পালাবে? উড়ে যাওয়া ছাড়া পালাবার উপায় নেই। আতংকিত চোখে তাকিয়ে টির্জা তার হাত চেপে ধরল।

"ও জুডা, এ সবের অর্থ কি?"

চাকর-বাকরদের নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে—আর তার মা! যাদের কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেয়েছে তার মধ্যে কি মার কণ্ঠস্বরও ছিল? সে বলল, "তুমি এখানে অপেক্ষা কর টির্জা। আমি নীচে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি।"

মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরল। আর সেই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ভেসে এল তার মায়ের তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর। সে আর ইতস্ততঃ করল না।

"তাহলে চল, দুজনেই যাই।"

সিঁড়ির নীচে অনেক সৈন্যের ভিড়। অন্যরা খোলা তলোয়ার হাতে এ-ঘরে ও-ঘরে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় অনেকগুলি স্ত্রীলোক নতজানু হয়ে করুণা ভিক্ষা করছে। কিছুটা দূরে একটি স্ত্রীলোক সৈনিকের দৃঢ় মুষ্ঠি থেকে নিজেকে ছাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। তার পরিধেয় ছিঁড়ে গেছে; আলুথালু চুলে মুখ ঢাকা পড়েছে। এক লাফে জুডা তার কাছে ছুটে গেল—যেন পাখা মেলে উড়ে গেল—"মা! মা!" বলে চীৎকার করে ডাকল। স্ত্রীলোকটি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যাবে এমন সময় সৈনিকটি জোর করে তাকে সরিয়ে দিল। সেই সময় সে শুনতে পেল কে যেন জোর গলায় বলে উঠল:

"এই সেই!"

জুডা তাকাল; দেখল—মেসালা।

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত একটি দীর্ঘকার লোক বলল, "সে কি—এই খুনী? আরে, এ তো ছেলে মানুষ।"

মেসালা টেনে টেনে বলল, "হা ভগবান! বুড়ো না হলে বুঝি খুন করা যায় না? ওকে হাতে পেয়েছেন; ওই ওর মা; আর ওটা বোন। গোটা পরিবারকেই পেয়ে গেছেন।"

জুডা বলে উঠল, "ভাই মেসালা, ওদের বাঁচাও! ছোটবেলার কথা মনে করে ওদের বাঁচাও। আমি—জুডা—তোমাকে মিনতি করছি।"

মেসালা না শোনার ভান করল।

অফিসারকে বলল, "আমার আর কিছু করার নেই। রাজপথে এখন অনেক বেশী মজা। প্রেমের দেবতা উচ্ছন্নে যাক, রণ-দেবতার জয় হোক?"

এই কথা বলে সে চলে গেল। জুডা সবই বুঝল। তীব্র তিক্ততায় আকাশে মুখ তুলে বলল, "হে প্রভু, প্রতিশোধের লগ্ন যেদিন আসবে, সেদিন তুমি আমার হাত হয়ে তাকে আঘাত করো।"

"স্যার, এই আমার মা। ওকে ছেড়ে দিন। আমার বোনকেও ছেড়ে দিন। ঈশ্বর ন্যায়বান। করুণার বিনিময়ে তিনি করুণা করবেন।"

লোকটির দয়া হল। চীৎকার করে বলল, "মেয়েদের দুর্গে নিয়ে যাও! কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি করো না। পরে তাদের ডাকা হবে।" যারা জুডাকে ধরে ছিল তাদের বলল, "দড়ি এনে ওর হাত বেঁধে রাজপথে নিয়ে যাও। ওর শাস্তি তোলা রইল।"

মাকে ও টির্জাকে ধরে নিয়ে গেল। তাদের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে জুডা দুই হাতে মুখ ঢাকল। হয় তো তার চোখে জল ছিল, কিন্তু কেউ তা দেখে নি। মাথা তুলে যখন দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরল তার ঠোঁট দুখানি তখন কঠিন হয়ে উঠেছে। সেই মুহূর্তে সে কৈশোর পার হয়ে মানুষ হয়ে উঠল।

মা, মেয়ে ও পরিবারের সবাইকে উত্তরের ফটক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ধ্বংসস্তূপে পথ অবরুদ্ধ। ধীরে ধীরে প্রতিশোধের পরিপূর্ণ রূপটা জুডার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। পুরো বাড়িটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বাড়ির চতুঃ সীমানার মধ্যে কাউকে জীবিত রাখে নি। ভবিষ্যতে সারা জুডিয়ায় যদি কেউ কখনও রোমক শাসনকর্তাকে হত্যা করবার মত দুঃসাহসী হয়, তা হলে হুর-পরিবারের এই দুর্দশার কাহিনী তাকে সাবধান করে দেবে, আর তাদের বাসভবনের এই ধ্বংস-স্তূপ সে কাহিনীকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে।

একটি স্ত্রীলোক মাটিতে পড়ে ছিল। এবার সে হঠাৎ ছুটে গিয়ে জুডার দুই হাঁটু ধরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল।

জুডা বলল, "আম্‌রাহ্‌, ভাল মানুষ আম্‌রাহ্‌, ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুন; আমার সাধ্য নেই।"

স্ত্রীলোকটি নির্বাক।

ছেলেটি তার কানে কানে বলল, "তোমাকে বাঁচতে হবে আম্‌রাহ্‌; মা ও টির্জার জন্য বাঁচতে হবে। তারা ফিরে আসবে, আর—"

একটি সৈন্য তাকে টেনে নিল। স্ত্রীলোকটি তখন লাফিয়ে পড়ে ফটক পেরিয়ে শূন্য উঠোনের দিকে ছুটে গেল।

অফিসার চেঁচিয়ে বলল, "ওকে যেতে দাও। বাড়িটা আমরা সিল করে দিচ্ছি। ও না খেয়েই ওখানে মরবে।"

লোকজন কাজ শুরু করল। সে ফটকটা বন্ধ করে দিয়ে পশ্চিম দিকে গেল। সে ফটকটাও বন্ধ করে দিল। হুরদের প্রাসাদ চিরকালের মত অব্যবহার্য হয়ে পড়ল।

পরদিন একদল সৈনিক সেই পরিত্যক্ত প্রাসাদে পেঁছে তার ফটকগুলোকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিল; সব ফাঁকগুলোকে মোম দিয়ে পলস্তারা করে দিল; এবং এক পাশে পেরেক ঠুকে লাতিন ভাষায় লেখা একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিল:

"এই সম্পত্তির মালিক
স্বয়ং সম্রাট"

ঠিক তার পরদিন দুপুরবেলা দশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাদের অধিনায়ক দক্ষিণ দিক থেকে—অর্থাৎ জেরুজালেম-এর দিক থেকে নাজারেথ-এ প্রবেশ করল।

শিঙা ধ্বনিতে সৈন্যদলের আগমন-বার্তা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে কৌতূহলী নরনারী সেখানে এসে ভিড় করল।

অশ্বারোহীদের সঙ্গে ছিল একটি বন্দী। সেই সকলের কৌতূহলের বস্তু। খালি পা, খোলা মাথা, অর্ধ-উলঙ্গ, হাত দুটি পিছনে বাঁধা। তার কব্জিতে বাঁধা চামড়ার পেটিটা ঘোড়ায় গলায় পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তার পা কেটে গেছে; গভীর ক্লান্তিতে সে ঝুঁকে বসে আছে। গ্রামবাসীরা দেখল, সে বয়সে তরুণ।

অধিনায়ক থামল। তার লোকজনরাও ঘোড়া থেকে নামল। বন্দীটি হতভম্বের মত পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। কোন কথাই বলল না। যেন ক্লান্তির শেষ সীমায় পেঁছে গেছে। গ্রামবাসীরা তার কাছে এগিয়ে গেল। একেবারে ছেলে মানুষ দেখে তাদের দয়া হল, কিন্তু কোন রকম সাহায্য করতে সাহস হল না।

এমন সময় সেফোরিস-এর দিক থেকে একটি লোককে আসতে দেখে একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, "দেখ! ছুতোর জোসেফ আসছে।"

লোকটির সৌম্য শ্রদ্ধেয় চেহারা। বড় পাগড়ির পাশ দিয়ে পাতলা সাদা চুল ঝুলে পড়েছে; মোটা কাপড়ের ধূসর জামার উপর ছড়িয়ে পড়েছে ততোধিক সাদা দাড়ি। মাথায় কিছু ভারী যন্ত্রপাতি—যেমন একটা কুড়ুল, একখানা করাত, একটা ছুরি—নিয়ে সে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। মনে হল, অনেকটা পথ সে হেঁটে আসছে।

ভিড়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে সব দেখে জোসেফ বলল, "প্রভু তাকে রক্ষা করুন!"

জোসেফ-এর সংগে একটি যুবকও এসেছিল। ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ তার দিকে কারও নজর পড়ে নি। কাঁধের কুড়ুলটা নামিয়ে রেখে সে কুয়োর কাছে গিয়ে এক কলসি জল নিয়ে এল। রক্ষীরা কিছু বলবার আগেই সে বন্দীর কাছে ঝুঁকে পড়ে তাকে জল খেতে বলল।

কাঁধের উপর সাদর হাতের ছোঁয়া লেগে ভাগ্যহীন জুডা জেগে উঠল; চোখ মেলে যে মুখ সে দেখল জীবনে কোন দিন আর সে মুখকে ভুলল না—তার মত বয়সেরই একটি ছেলের মুখ; উজ্জ্বল বাদামি রঙের কেশগুচ্ছের ছায়া পড়েছে মুখে; দুটি গাঢ় নীল চোখ ভালবাসায় ও শুভবুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সে চোখের দিকে তাকিয়ে অনেক দুঃখ-নির্যাতনে তিক্ত-হৃদয় ইহুদীর মন গলে গেল—বুঝি বা সে ফিরে পেল একটি শিশুর মন। কলসি ঠোঁটে ঠেকিয়ে সে আকণ্ঠ জল পান করল।

নবাগত যুবকটি কলসি নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। কুড়ুল কাঁধে নিয়ে রাব্বি জোসেফ-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অধিনায়ক ও গ্রামবাসী—সকলেরই চোখ তখন তার দিকে।

দু'জনই চলে গেল। আর এইভাবে জুডো ও মেরির পুত্রের মধ্যে হল প্রথম সাক্ষাৎ ও বিদায়।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

সেপ্টেম্বরের এক শীতার্ত সকালে নেপলস্ থেকে মাইল কয়েক দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিসেনাম শহর থেকে একটি জাহাজ যাত্রা শুরু করল। জাহাজটার নাম "অ্যাস্ট্রিয়া", আর যাত্রীদের একজন হল মহানান্য ট্রিবিউন কুইন্টাস অরিয়াস।

বেলা দুপুর নাগাদ জাহাজটা পীস্টাস-এর উপকূল দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। পশ্চিমের হাওয়া লেগেছে পালে। জাহাজের প্রধান যাত্রী অরিয়াস তাতে খুসি। কেবিনের পাটাতন থেকে সে সকলের উপর সতর্ক নজর রেখে চলেছে; অন্য সকলের নজরও রয়েছে তার উপর। সব কিছুই সে দেখছে, কিন্তু তার বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে দাঁড়িদের উপর।

যে সব ক্রীতদাস জাহাজে দাঁড় টানে তাদের কোন নামের প্রয়োজন হয় না। যার যার বসবার বেঞ্চিতে যে নম্বরটা লেখা থাকে সেটাই তার পরিচয়। এই

মহাপুরুষটির তীক্ষ্ম দৃষ্টি নানা নম্বরের উপর ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ষাট নম্বরে গিয়ে থামল।

ষাট নম্বরের বেঞ্চটা পাটাতন থেকে একটু উঁচু, আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে। মাথার উপরকার ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে কিছুটা আলো এসে পড়ায় ষাট নম্বর দাঁড়ির চেহারাটা ট্রিবিউনের চোখে মোটামুটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। খাড়া চেহারা, অন্য সহকর্মীদের মতই কোমরে একখণ্ড পট্টি ছাড়া সম্পূর্ণ উলংগ। দাঁড়িটি যুবক, বয়স কুড়ির বেশী নয়।"

ট্রিবিউন নিজের মনেই বলল, "হা ভগবান, লোকটাকে দেখে ভাল লাগছে। তার সম্পর্কে আরও খোঁজ খবর নিতে হবে।

ঠিক সেই সময় দাঁড়িটি মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল।

"একজন ইহুদী। একেবারে বালক।"

ট্রিবিউনের দৃষ্টি তার উপর স্থিরনিবদ্ধ দেখে ক্রীতদাসটির বড় বড় চোখ আরও বড় হয়ে উঠল—ভুরু পর্যন্ত রক্ত উঠে এল—হাতের দাঁড় থেমে গেল। সংগে সংগে মেট-এর হাতুড়ির শব্দ হল; দাঁড়ি চমকে উঠে মুখটা ফিরিয়ে নিল; ধমক খেয়ে আবার দাঁড় ফেলল। আবার যখন ট্রিবিউনের দিকে তাকাল তখন সবিস্ময়ে দেখল—ট্রিবিউন তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

ইতিমধ্যে জাহাজটা মেসিনা যোজকে ঢুকে সেই নামের শহরটাকেও পার হয়ে গেল। এট্‌নার আকাশে কালো মেঘের ছায়াকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

তারপর থেকে অরিয়াস যতবার তার কেবিনের পাটাতনে এসেছে ততবারই সেই যুবক দাঁড়িটিকে ভাল করে লক্ষ্য করেছে, আর মনে মনে বলেছে, "ছোকরার মনের জোর আছে। ইহুদী তো বর্বর নয়। ওর সম্পর্কে আরও জানতে হবে।"

যাত্রার চতুর্থ দিনে "অ্যাস্ট্রিয়া" আইয়োনীয় সাগরের বুকে ভেসে চলেছে। আকাশ পরিষ্কার। যেন সমস্ত দেবতার শুভেচ্ছা নিয়ে বাতাস বইছে।

জাহাজের পিছনের গলুইতে দাঁড়িয়ে আছে অরিয়াস। চোখ তুলে দেখল, ষাট নম্বরের দাঁড়ি এগিয়ে আসছে।

"মেট বলল যে আপনি মহান অরিয়াস, আর আপনার ইচ্ছা যে আমি এখানে আপনার সংগে দেখা করি। আমি এসেছি।"

"মেট আমাকে বলেছে, তুমি তার শ্রেষ্ঠ দাঁড়ি।"

"মেট খুব দয়ালু," দাঁড়ি জবাব দিল।

"তুমি কি অনেক দিন এ কাজ করছ?"

"প্রায় তিন বছর।"

"দাঁড় টানছ?"

"একটা দিনের জন্যও রেহাই নেই।"

"কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ইহুদী।"

"আমার বাবা ছিলেন জেরুজালেমে-এর রাজপুত্র, আর বণিক হিসাবে সমুদ্র-পথে তিনি অনেক ঘুরেছেন। মহান অগাস্টাস-এর অতিথিশালায় তিনি সসম্মানে অভ্যর্থিত হতেন।"

"তার নাম ?"

"ইথামার, হুর-বংশের লোক।"

ট্রিবিউন সবিস্ময়ে হাত তুলল।

"হুর-বংশের সন্তান—তুমি ?"

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল :

"তুমি এখানে এলে কেমন করে ?"

জুডা মাথা নীচু করল, তার বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে ট্রিবিউনের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, "প্রকিউরেটর ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাসকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগের ফলে।"

অরিয়াস শক্ত গলায় প্রশ্ন করল, "তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার কর ?"

"সর্বশক্তিমান জিহোভা-র নাম নিয়ে বলছি, আমি নির্দোষ।"

ট্রিবিউন বিচলিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি বিচার হয় নি ?"

"না।"

রোমক ভদ্রলোক সবিস্ময়ে মাথা তুলল।

"কোন বিচার নয়—সাক্ষী নয় ! কে দিয়েছিল দণ্ডাদেশ ?"

"দড়ি দিয়ে বেঁধে তারা আমাকে টানতে টানতে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। কোন লোক ছিল না। কেউ কিছু বলল না। পরদিন সৈন্যরা আমাকে সাগর-তীরে নিয়ে গেল। সেদিন থেকেই আমি জাহাজের ক্রীতদাস।"

"নিজের স্বপক্ষে তোমার কি বলবার আছে ?"

খোলা টালির দুর্ঘটনার কথা জুডা তাকে বলল।

অরিয়াস গভীর আগ্রহের সঙ্গে সব শুনল। তারপর ভাবতে লাগল; এর কথা যদি সত্য হয় তাহলে তো এ সম্পূর্ণ নির্দোষ ; অথচ কী প্রচণ্ড অন্ধ আক্রোশ এর উপরে খাটানো হয়েছে। একটা দুর্ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত করতে একটা পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে !

এই বোধহয় প্রথম যে স্বয়ং ট্রিবিউন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইতস্তত করতে লাগল। তার হাতে প্রভূত ক্ষমতা। জাহাজের সে সর্বময় কর্তা। ছেলেটির কথায় তার মনে করুণা জেগেছে। তার কথায় সে বিশ্বাস করছে। তবু, তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। বরং তাড়া আছে সাইথেরা যাবার, আর

সেজন্য এই শ্রেষ্ঠ দাঁড়িকে হাতছাড়া করা যায় না। অপেক্ষাই করা যাক। হয় তো আরও কিছু তথ্য জানা যাবে। সেই যে রাজপুত্র বেন-হুর সে বিষয়ে অন্তত নিশ্চিত হওয়া যাবে। ক্রীতদাসরা সাধারণতই মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে।

আরিয়াস বলল, "এখন তুমি যাও। আমাদের মধ্যে যে কথা হল তার উপরে বেশী ভরসা করো না। যাও!"

বেন-হুর আবার তার বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। পাখির গানের মত একটা আশার সুর বেজেছে তার কানে। সে পাখিকে সে দেখতে পাচ্ছে না; তার গানও শুনতে পাচ্ছে না। তবু তার মন বলছে, পাখিটা আছে।

মনের খুসিতে সে প্রার্থনা জানাল, "হে ঈশ্বর! যে ইস্রায়েলীদের তুমি এত ভালবাস আমি তো তাদেরই সন্তান! আমি মিনতি করছি, তুমি আমার সহায় হও!"

সাইথেরা দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অ্যান্টিমোনা উপসাগরে একশ' জাহাজ এক জায়গায় জড় হল। একটা পুরো দিন ট্রিবিউন জাহাজগুলো পরীক্ষা করল। তারপর নৌবহর ছেড়ে দিল।

কিছু দূর যেতেই উত্তর দিক থেকে একটা জাহাজকে আসতে দেখা গেল। একটা মালবাহী জাহাজ; এসেছে বাইজাণ্টিয়াম থেকে। তার বড় কর্তার কাছ থেকে আরিয়াস প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য জানতে পারল।

আসলে এই নৌ-বহর নিয়ে আরিয়াস চলেছে একদল জলদস্যুর মোকাবিলা করতে। জলদস্যুরা এসেছে সুদূর ইউক্সাইন উপকূল থেকে। তাদের হাতে পুরো ষাটটি জাহাজ; সবগুলিই সমর-সম্ভার ও খাদ্যবস্তুতে সুসজ্জিত। তাদের দলপতি একজন গ্রীক; নাবিকরাও সকলেই গ্রীক। প্রচণ্ডভাবে তারা লুটতরাজ করে চলেছে। ফলে শুধু যে সাগর-বক্ষেই আতংক ছড়িয়েছে তাই নয়, শহরগুলোও রাত্রিবেলায় ফটক বন্ধ করে প্রাচীরের ভিতরে চলে যায়। ফলে লোকজন চলাচল প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। আর এই সংকট-পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেই আরিয়াস এগিয়ে চলেছে একশ' জাহাজের নৌ-বহর নিয়ে।

জলদস্যুরা এখন কোথায় আছে?

প্রশ্নটা আরিয়াস-এর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তার জবাবও সে পেয়ে গেল।

হেফিস্টিয়া লুঠ করে শত্রুরা থেসালির দিয়ে এগিয়ে যায়। সর্বশেষ খবর হল, তারা ইউবিয়া ও হেলাস-এর মধ্যবর্তী উপসাগরীয় অঞ্চলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এই সব খবর জেনে নিয়ে আরিয়াস তার নিজের রণ-কৌশল স্থির করতে বসল। সব দিক বিবেচনা করে সে বুঝতে পারল যে জলদস্যুরা এখন

থার্মোপিলির নীচে কোন স্থানে আছে। এই সুযোগ। উত্তর ও দক্ষিণ দু'দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলতে হবে। আর তা করতে হলে আর একটি ঘণ্টাও নষ্ট করা চলবে না।

পঞ্চাশটি জাহাজ নিয়ে অরিয়াস স্বয়ং চলল উপসাগরের ভিতরের দিকে, আর বাকি বহরকে পাঠিয়ে দিল সমুদ্রের দিকে, যাতে তারা সেদিক থেকে দ্রুত শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এদিকে বেন-হুর যথারীতি তার বেঞ্চিতে বসে আছে। প্রতি ছ'ঘণ্টা অন্তর ছুটি মিলছে। তাছাড়া অ্যাণ্টিমোনা উপসাগরে একটা দিনের বিশ্রামের ফলে সে বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। ফলে দাঁড় ফেলতে কোন কষ্ট হচ্ছে না, আর মেটও কোন খুঁত ধরতে পারছে না।

সূর্য অস্ত গেল। কেবিনের শেষ আলোক-রশ্মিও মিলিয়ে গেল। জাহাজ তখনও উত্তর মুখেই চলেছে। রাত হল। তবু বেন-হুর পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন বুঝতে পারল না। এমন সময় ডেক-এর উপর থেকে ধূপের গন্ধ ভেসে এল।

বেন-হুর ভাবল; "ট্রিবিউন প্রার্থনায় বসেছেন। তাহলে কি যুদ্ধ আসন্ন?"

সে চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখল।

শেষ পর্যন্ত সে যখন দেখতে পেল, ট্রিবিউন পাটাতনের উপর উঠে এসেছে, বর্ম-চর্ম পরছে; শিরস্ত্রাণ ও ঢাল বের করছে, তখন এই সব প্রস্তুতির অর্থ বুঝতে তার দেরী হল না। যুদ্ধ আসন্ন।

দাঁড়িদের বেঁধে রাখবার জন্য প্রতিটি বেঞ্চিতে ভারী আংটাসহ একটা শিকল থাকে। বিপদ দেখা দিলে যাতে কেউ পালাতে না পারে সেজন্য মেট গুণে গুণে সকলের পায়েই সেই আংটা পরাতে লাগল।

প্রথমে এক নম্বর। লোহার কড়াটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল। সকলের শেষে ষাট নম্বর। হতাশায় স্তব্ধ হয়ে বেন-হুর পা বাড়িয়ে দিল। তখন ট্রিবিউন একটু কেঁপে উঠে বসল—ইসারায় মেটকে ডাকল।

ইহুদীটির মনে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দিল। মহাপুরুষটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। এবার যখন সে দাঁড়টা জলে ফেলল তখন তার দিককার সমস্ত জাহাজটাই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কী কথাবার্তা হচ্ছে কিছুই সে শুনতে পাচ্ছে না। শিকলটা তখনও বেঞ্চটার গায়ে ঝুলেই রয়েছে। মেট তার নিজের জায়গায় গিয়ে ঘণ্টাটাকে সজোরে বাজাতে লাগল। আর সেও সীসের হাতলটা বুকে ঠেকিয়ে এত জোরে চাপ দিল যে সেটা বেঁকে গিয়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম হল।

তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মেট ট্রিবিউনকে বলল, "কী গায়ের জোর!"

ট্রিবিউন জবাব দিল, "আর কী মনের জোর। শিকল ছাড়াই সে ভাল আছে। তাকে আর কখনও শিকল পরিও না।"

এই কথা বলে সে পুনরায় কোচে হেলান দিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জাহাজটা এগিয়ে চলল। শান্ত জলে শুধু দাঁড়ের ওঠা-পড়ার শব্দ। যাদের এখন ছুটি তারা ঘুমিয়ে পড়েছে—অরিয়াস তার জায়গায়, নাবিকরা মেঝেতে।

চারদিক আঁধারে ঢাকা। "অ্যাস্ট্রিয়া" আপন মনে চলেছে। এমন সময় একটি লোক ডেক থেকে নেমে পাটাতনের উপর অরিয়াস-এর কাছে এগিয়ে গেল। তাকে ঘুম থেকে জাগাল। অরিয়াস উঠে দাঁড়াল, শিরস্ত্রাণ মাথায় দিল, হাতে নিল তলোয়ার ও ঢাল, প্রধান নাবিকের দিকে এগিয়ে গেল।

"জলদস্যুরা এসে পড়েছে। ওঠ, প্রস্তুত হও।" এই কথা বলে শান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সারা জাহাজটাই যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। জেগে উঠল প্রতিটি মানুষ। নাবিকরা অস্ত্র তুলে নিল হাতে, যেন তারা সবাই পেশাদারী সৈনিক। তীর ও বর্শা এনে স্তূপীকৃত করা হল ডেক-এর উপর। প্রস্তুত রাখা হল তেলের ট্যাংক ও আগুনে বোমা। বাড়তি লণ্ঠনগুলো জেবলে দেওয়া হল। বাল্তি বাল্তি জল ভরে রাখা হল। যে সব দাঁড়ি-মাল্লাদের তখন ছুটি ছিল তারাও ডেক-এর উপর এসে হাজির হল। ভাগ্যক্রমে বেন-হুরও তাদের মধ্যে ছিল।

এক সঙ্গে অনেকগুলো জাহাজ চালাবার মত শব্দ এসে লাগল বেন-হুরের কানে। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে "অ্যাস্ট্রিয়া" কেঁপে উঠল। বেন-হুর বুঝতে পারল, আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। তার রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল।

শুরু হল তুমুল আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ। হৈ-হল্লা-হট্টগোল। জাহাজ কাঁপছে। আগুন ও ধোঁয়ায় সব কিছু আচ্ছন্ন। এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একটা মৃতদেহ এসে পড়ল বেন-হুরের কাছে। লোকটি শত্রু-পক্ষের। এখানে এল কেমন করে? কেউ কি কঠোর হাতে অন্য জাহাজ থেকে টেনে এনেছে? না কি শত্রুরা হানা দিয়েছে "অ্যাস্ট্রিয়া"-র বুকে? সেখানেই চলেছে যুদ্ধ? তরুণ ইহুদীর বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তাহলে তো অরিয়াস-এর জীবনও বিপন্ন। যদি তার মৃত্যু হয়! ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। তার এত আশা, এত স্বপ্ন সবই কি শুধুই আশা—শুধুই স্বপ্ন? মা ও বোন—বাড়ি—ঘর—পবিত্র ভূমি—কিছুই কি আর দেখা হবে না?

না, এ হতে পারে না—অরিয়াস মরতে পারে না। জাহাজের চির-ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে না হয় তার সঙ্গেই মৃত্যুকে বরণ করব।

এক লাফে বেন-হুর কয়েকটা সিঁড়ি উঠে গেল। সেখান থেকেই সে দেখতে পেল, আগুনের ছোঁয়ায় আকাশ রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে, চারদিকে অনেক জাহাজের জড়াজড়ি, সাগরের বুক ভাঙা জাহাজ ও অন্য ভগ্নস্তূপে বোঝাই। এমন সময় তার পায়ের নীচের সিঁড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সেও ছিটকে নীচে পড়ে গেল। কিন্তু কোথায় পড়ল? জাহাজের পাটাতনটাই যে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। বেন-হুরকে ঘিরে তখন শুধু ফেনায়িত উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি আর চাপ-চাপ অন্ধকার।

সাগর-তরঙ্গে অসহায়ের মত ভাসতে ভাসতে, ডুবতে ডুবতে এক সময় সে একটা ভাসমান তক্তা পেয়ে গেল। এক নিঃশ্বাসে অনেকখানি বাতাস ফুসফুসে ভরে নিয়ে, চুল ও ভুরুর উপর থেকে জলকে সরিয়ে এক লাফে তক্তাটার উপরে উঠে বসে সে চারদিকে তাকাল।

ধোঁয়ার জাল স্বচ্ছ কুয়াসার মত সমুদ্রের উপর ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে অগ্নিদগ্ধ জাহাজের অংশগুলি ঝলমল করছে। যুদ্ধ কি এখনও চলছে? কোন্ পক্ষ জয়ী হয়েছে? সন্ধানী আলোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে চারদিক খুঁজতে লাগল।

তার কানে এল, দ্রুত তালে দাঁড় পড়ছে। একটা জাহাজ তার দিকে এগিয়ে আসছে। উঁচু গলুইটাকে আরও উঁচু দেখাচ্ছে। নীচে সমুদ্রের সফেন তরঙ্গ। কে জানে এটা কাদের জাহাজ? জলদস্যুদের কি?

তক্তাটাকে ঠেলে দিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে গেল। প্রতিটি সেকেণ্ড মূল্যবান—আধ সেকেণ্ডে নির্ধারিত হতে পারে জীবন-মরণ।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার মাত্র হাত দুই দূরে একটি শিরস্ত্রাণ সোনালি আভায় ঝিকমিক করে উঠল। তারপরেই দেখা গেল দু'খানি হাত। আঙুলগুলি ছড়ানো। শিরস্ত্রাণ সমেত মাথাটা আবার ভেসে উঠল। আবার দু'খানি হাত। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে একটি মানুষ। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, চোখ দুটো খোলা, কিন্তু দৃষ্টিহীন, ডুবন্ত মানুষের মৃত্যু-পাণ্ডুরতা সারা মুখে—কী বীভৎস দৃশ্য। বেন-হুর কিন্তু আনন্দে চীৎকার করে উঠল। মুখটা আবার ডুবে যাবার আগেই যে চেনটা দিয়ে শিরস্ত্রাণটা থুতনির সঙ্গে আটকানো ছিল সেটাকে চেপে ধরে বেন-হুর একটানে লোকটিকে তক্তার উপর তুলে নিল।

লোকটি ট্রিবিউন অরিয়াস।

অন্ধকারে তাদের দুজনকে ফেলে রেখেই দাঁড় ফেলে জাহাজটা চলে গেল।

ধীরে ধীরে ভোর হল।

জলে ডোবার সব যন্ত্রণাকে কাটিয়ে এক সময় অরিয়াস-এর মুখে কথা ফুটল।

সব কথা শুনে সে বলল, "বুঝতে পারছি, যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করছে। তুমি আমার জন্য যা করেছ তাও বুঝতে পারছি। সত্য কথা বলতে কি, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। খোলাখুলিভাবেই এ কথা আমি স্বীকার করছি ; ভাগ্যে যাই থাক, আমার ধন্যবাদ তুমি পেয়েছ। যদি বাঁচি, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব ; তোমার বাড়িতে, তোমার প্রিয়জনদের কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দেব ; অথবা তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি যেতে পারবে। শুনতে পাচ্ছ ?"

"না শুনে উপায় কি। দূরে একটা জাহাজ আসছে !"

"কোন্ দিক থেকে ?"

"উত্তর দিক থেকে।"

"বাইরেটা দেখে বলতে পার কাদের জাহাজ ?"

"না। আমি কাজ করি দাঁড়ে।"

"জাহাজে নিশান আছে ?"

"দেখতে পাচ্ছি না।"

অরিয়াস গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

অবশেষে বলল, "এখনও কি এই দিকেই আসছে ?"

"হ্যাঁ।"

"যদি রোমক জাহাজ হয়, মাস্তুলের মাথায় একটা শিরস্ত্রাণ থাকবে।"

"তাহলে আনন্দ করুন। শিরস্ত্রাণ দেখতে পাচ্ছি।"

অরিয়াস তথাপি নিশ্চিন্ত হতে পারল না। বেন-হুর একাগ্র দৃষ্টিতে জাহাজটাকে দেখতে লাগল।

"জাহাজটা সরে যাচ্ছে।"

"কোন্ দিকে ?"

"আমাদের ডান দিকে একটা পরিত্যক্ত জাহাজ রয়েছে, সেই দিকে। জাহাজটার গায়ে গিয়ে ভিড়েছে। ঐ দেখুন, ওই জাহাজে ওরা উঠে যাচ্ছে।"

চোখ মেলে সে দিকে তাকিয়ে অরিয়াস-এর মুখটা খুসি হয়ে উঠল। বেন-হুরকে বলল, "আমি যেমন আমার দেবতাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তেমনই তুমিও ধন্যবাদ জানাও তোমার ঈশ্বরকে। জলদস্যু অন্য জাহাজকে ধ্বংসই করে, কখনও উদ্ধার করে না। এই কাজ থেকে আর মাস্তুলের শিরস্ত্রাণ দেখেই আমি রোমককে চিনতে পেরেছি। আমার জয় হয়েছে। ভাগ্য আমাদের পরিত্যাগ করে নি। আমরা বেঁচেছি। হাত তোল—ওদের ডাক—তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এস। এবার আমি হব 'ডিউয়ামভির,' আর তুমি—তোমার বাবাকে আমি চিনতাম—ভালবাসতাম। তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি হবে আমার ছেলে

তক্তার উপর দাঁড়িয়ে জুড়া হাত তুলে ইসারায় জাহাজের লোকজনদের ডাকল। দ্রুত এগিয়ে এসে তারা তাদের জাহাজে তুলে নিল।

অভিযান শেষ হল। বিজয়-গৌরবে নৌ-বহর মিজেনাম-এ ফিরে এল। সেখানে মহাসমারোহে আরিয়াসকে অভ্যর্থনা জানান হল। সেও সকলকে সবিস্তারে জানাল তার উদ্ধারের কাহিনী, শোনাল বেন-হুরের সাহসিকতার কথা। তারপর বেন-হুরকে কাছে ডেকে সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "বন্ধুগণ, এই আমার পুত্র ও উত্তরাধিকারী; আজ হতে সে যেমন আমার সম্পত্তি লাভ করবে, তেমনই আমার নামেই হবে তার পরিচয়। আমার মিনতি, আপনারা আমাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনই ভাবে তাকেও ভালবাসবেন।"

যত সত্বর সম্ভব আনুষ্ঠানিকভাবে ও এই দত্তক গ্রহণ পর্ব সমাধা হল। আর এই ভাবেই সাহসী রোমক বেন-হুরকে দেওয়া তার কথা রাখল, তাকে পরিচিত করে দিল রাজকীয় জগতে।

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

এ কাহিনীর যবনিকা আবার যখন উঠল তখন সময় জুলাই মাস, সন খৃষ্টীয় ২৯ সাল; স্থান—প্রাচ্যের রাণী ও পৃথিবীতে রোমের পরেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নগরী এণ্টিয়ক।

অনেক নীল দরিয়া পার হয়ে বেন-হুরের বাণিজ্য-জাহাজ সবেমাত্র নোঙর করেছে অরেণ্টেস নদীর মোহনায়। এই পাঁচ বছরে তরুণ বেন-হুর পরিপূর্ণ যৌবনে উন্নীত হয়েছে। তার সুদর্শন দেহ-কান্তি হয়েছে আরও রমনীয়।

পরদিন ভোর না হতেই বেন-হুর শহরের প্রান্তে অবস্থিত সাইমনাইডিস পরিবারের বাসভবনে উপস্থিত হল। সাইমনাইডিস মস্ত বড় ধনী। অনেকগুলি বাণিজ্য-জাহাজের মালিক। সাত সাগরের বুকে চলে তার ব্যবসা-বাণিজ্য।

সাহসের সংগেই বেন এই অপরিচিত বাড়িতে ঢুকে গেল।

প্রবেশ-পথের দু'পাশেই মাল-গুদাম। নানা রকম পণ্য-দ্রব্যে বোঝাই। এত ভোরেও লোকজন কাজকর্ম শুরু করেছে। এক জায়গায় কিছু লোক করাত ও হাতুড়ি নিয়ে জাহাজে মাল পাঠাবার উপযুক্ত কাঠের বাক্স তৈরি করছে। সেই সব সারিবদ্ধ মালপত্রের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এত যার সোনা-দানা, এত যার নাম-ডাক, এও কি সম্ভব যে সেই মানুষ একদিন ছিল তার বাবার ক্রীতদাস!

অবশেষে একটি লোকের সংগে দেখা হল।

"আপনার কি চাই ?"

"বণিক সাইমনাইডিস-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

অনেক পথ পার হয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে তারা ছাদের বাগানে পড়ল। দু'পাশে অজস্র পারসিক গোলাপ ফুটে আছে। তার আতর-সুরভিতে শ্বাস টেনে বেন লোকটির পিছন পিছন এগিয়ে চলল।

একটা অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে আধ-খোলা পর্দার সামনে এসে তারা দাঁড়াল। লোকটি হাঁক দিয়ে বলল :

"একজন অপরিচিত লোক কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে জবাব এল, "ঈশ্বরের নামে তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।"

ভিতরকার নরম আলোয় দুটি লোক বসে আছে—একজন হেলান দিয়ে শুয়ে আছে উঁচু-পিঠ, চওড়া-হাতল, নানা কুশানে সজ্জিত একটা চেয়ারে, আর একটি বাড়ন্ত বয়সের তরুণী বসে আছে আর একখানি চেয়ারে পিঠ দিয়ে। প্রথম দৃষ্টিতেই বেন-হুরের কপাল আরক্ত হয়ে উঠল। দুজনই এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে।

"আপনি যদি ইহুদী বণিক সাইমনাইডিস হন তাহলে আমাদের পিতা আব্রাহামের ঈশ্বর আপনাকে শান্তি দিন, আর—আপনাকেও।"

শেষের কথাটি সে বলল তরুণীটিকে লক্ষ্য করে।

অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় লোকটি জবাব দিল, "আমিই সাইমনাইডিস, জন্মসূত্রে ইহুদী। আপনাকে প্রত্যভিবাদন জানাই। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ?"

বেন হুর আশা করেছিল একটি স্বাস্থ্যপুষ্ট মানুষকে দেখতে পাবে; কিন্তু এ যেন একটি আকৃতিহীন মাংসপিণ্ড রেশমী রাজ-পোষাকে শরীরটাকে ঢেকে কুশনের মধ্যে ডুবে আছে। শুধু রাজমুকুটশোভিত মাথাটা জ্বল্-জ্বল্ করছে। পাতা-কাটা পাকা চুল ছড়িয়ে পড়েছে সাদা ভুরুর উপর; তাতে উজ্জ্বল কালো চোখ দুটিকে আরও কালো দেখাচ্ছে। মুখখানা রক্তহীন, বলিরেখায় আকীর্ণ। খোলা হাতটা চিৎ করে বেন-হুর তার দিকে এগিয়ে দিল।

"আমি জুডা, জেরুজালেম-এর রাজা হুর-বংশের প্রধান স্বর্গত ইথামার-এর ছেলে।"

"জেরুজালেম রাজবংশের যে কোন লোক আমার ভবনে চির-স্বাগত। এস্তার, যুবককে একটি আসন দাও।"

পাশেই একটা 'অটোমান' ছিল। সেটাকে এগিয়ে দিয়ে তরুণী বলল, "দয়া করে বসুন।"

দুজনের চোখে চোখ মিলল।

আসনে না বসেই বেন-হুর সসম্ভ্রমে বলল, "প্রভু সাইমনাইডিস যেন আমাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে না করেন। গতকাল নদীপথে আসতে আসতে শুনেছি, আপনি আমার বাবাকে চিনতেন।"

"রাজা হুরকে আমি চিনতাম। অনেক সাগর ও মরুভূমি পেরিয়ে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু—আপনি বসুন। এস্তার, যুবকটিকে পানীয় পরিবেশন কর। নেহেমিয়া-র কাছে শুনেছি, জেরুজালেম-এর অর্ধেক অংশের রাজা হুর-এর একটি ছেলে ছিল। হুরদের বংশ প্রাচীন—খুবই প্রাচীন!"

কথার শেষে এস্তার একটি পূর্ণ পান-পাত্র নিয়ে বেন-হুরের সামনে দাঁড়াল। আস্তে তরুণীটির হাত ছুঁয়ে সে পান-পাত্র ফিরিয়ে দিল। আবার তাদের চোখাচোখি হল। তরুণীটি ছোটখাট, কিন্তু পরম রমনীয়া—সুন্দর মুখ, কালো চোখ, নরম চাউনি। হুর সোচ্চারে বলে উঠল, "না; আপনার বাবা—উনি আপনার বাবা তো?"

"আমি সাইমনাইডিস-এর মেয়ে এস্তার," সে জবাব দিল।

"সুন্দরী এস্তার, আমার সব কথা শুনলে এই সুপানীয় গ্রহণ করতে বিলম্ব করার জন্য আপনার বাবা আমার প্রতি বিরূপ হবেন না। আশা করি, আপনিও বিরূপ হবেন না। দয়া করে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন।"

দুজনই যেন এক সঙ্গে বণিকের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

বেন-হুর দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, "সাইমনাইডিস! মৃত্যুকালে আমার বাবার একটি বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল। তারও ছিল আপনারই নাম। আমি শুনেছি, আপনিই সেই লোক!"

রাজ-পোষাকের নীচে কুণ্ঠিত বাহু দুখানি হঠাৎ কেঁপে উঠল। সরু হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হল। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে সাইমনাইডিস নিরুত্তাপ গলায় বলল, "রাজা হুর-এর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলবার আগে আপনি কে সে প্রমাণ আমাকে দেখান। সে সব কি লিখিতভাবে আছে? না মুখেই বলবেন?"

অতি সহজ দাবী, তর্কাতীত। বেন-হুরের মুখ লাল হয়ে উঠল। দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ হল। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

সাইমনাইডিস চেপে ধরল, "প্রমাণ, প্রমাণ চাই! সেগুলো আমার সামনে রাখুন—আমার হাতে দিন!"

বেন-হুর তবু কোন কথা বলল না। এ কথা সে আগে ভাবে নি; কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, তিন বছর জাহাজের জীবনযাত্রার পরে তার সব পরিচয় ধুয়ে-মুছে গেছে; মা ও বোন নেই; কোন মানুষের স্মৃতিতে সে আজ

আর বেঁচে নেই। নিজেকে আজ বড় নিঃসঙ্গ, বড় একাকি, মনে হতে লাগল।

অবশেষে সে বলল, "প্রভু সাইমনাইডিস, কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। শুধু আমার কাহিনী আপনাকে বলতে পারি। কিন্তু তাতে কি লাভ? আপনার সন্দেহ তাতে তো দূর হবে না।

বণিক মর্মর-মূর্তির মত বসে রইল ; মুখে একটি কথা নেই।

জুড়া আবার বলতে লাগল, "হে সাইমনাইডিস, আমার সব দাবী তুলে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। আর কখনও আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না। শুধু একটি কথা বলে যাই, আপনাকে আবার পূর্ব-ক্রীতদাসত্বে ফিরিয়ে দিতে, অথবা আপনার সম্পদের হিসাব নিতে আমি আসি নি। যা আপনার পরিশ্রম ও প্রতিভার ফল, তা আপনারই থাকবে। তার কোন অংশেরই কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার দ্বিতীয় পিতা মহান কুইন্টাস তার শেষ সমুদ্রযাত্রার আগে আমাকেই তার উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন। সুতরাং যদি ভবিষ্যতে কখনও আমার কথা আপনার মনে হয় তাহলে এই কথাই মনে করবেন যে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম আমার মা ও বোন টির্জার খবর জানতে। বলুন; তাদের কথা আপনি কি জানেন?

এস্তার-এর দুই গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে ; কিন্তু লোকটি অবিচলিত কণ্ঠে বলল, "আগেই বলেছি রাজপুত্র বেন-হুরকে আমি চিনতাম। তার পরিবারের দুর্ভাগ্যের কথাও আমি শুনেছি। শুধু তাই নয়, তাদের খোঁজ নিতে অনেক পরিশ্রমও করেছি, কিন্তু—আপনাকে বলবার মত কিছুই জানতে পারি নি। তারা হারিয়ে গেছে।"

বেন-হুর আর্তনাদ করে উঠল। অনেক কষ্টে বলল, "তাহলে—সে আশাও নির্মূল হল! হতাশা আমার নিত্যসংগী। আমার এই অনধিকার প্রবেশ ক্ষমা করবেন। আপনাকে যদি বিরক্ত করে থাকি, আমার দুঃখের কথা ভেবে তা ক্ষমা করবেন। আজ আমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্য—প্রতিশোধ। বিদায়।"

পর্দার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ।"

"আপনি শান্তিলাভ করুন", বণিক বলল।

বেন-হুর বেরিয়ে যাবার সংগে সংগেই সাইমনাইডিস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠল; চোখের দৃষ্টি হল উজ্জ্বলতর। সানন্দ কণ্ঠে বলল, "এস্তার, ঘণ্টাটা বাজাও—শিগ্‌গির!"

ঘণ্টা বাজাতেই দেয়ালের একাংশ ফাঁক হয়ে গেল। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে একটি লোক বণিকের সামনে এসে অর্ধ-সেলামে তাকে অভিবাদন করল।

"মালুচ, কাছে এস—চেয়ারের কাছে। তোমাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি; সূর্য যদি বা পরাজিত হয়, তুমি কিন্তু সে কাজে পরাজিত হয়ো না। শোন। একটি যুবক সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে—লম্বা, সুদর্শন, ইস্রায়েলীদের মত পোষাক। ছায়ার মত তার পিছু নেবে। সে কে, কি করে, কার সঙ্গে মেলামেশা করে—এ সব বিষয়ে প্রতি রাত্রে আমাকে খবর দেবে। তার কোন কথাবার্তা যদি শুনতে পাও, প্রতিটি অক্ষর আমাকে জানাবে। বুঝেছ? চলে যাও! দাঁড়াও, সে যদি শহর ছেড়ে চলে যায়, তুমিও যাবে—কিন্তু মনে রেখ মালুচ, যাবে বন্ধুর মত। তোমার সঙ্গে যদি কখনও কথা হয়, অবস্থা বুঝে জবাব দেবে; কিন্তু সাবধান, আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি সে কথা ঘুণাক্ষরেও বলবে না। যাও—দ্রুত চলে যাও।"

লোকটি আগের মতই সেলাম জানিয়ে চলে গেল। সাইমনাইডিস দুই হাত ঘসতে ঘসতে হেসে উঠল। বলল, "এস্তার, যুবকটি যখন কথা বলছিল তখন, আমার মনে হল, সে তোমাকে জয় করে নিয়েছে।"

চোখ নামিয়ে সে জবাব দিল, "সত্যি বলছি বাবা, তার কথায় আমি বিশ্বাস করেছি।"

"তাহলে তোমার চোখে সেই রাজা হুর-এর হারানো ছেলে?"

"যদি না হয়—" তরুণী ইতস্তত করল।

"যদি না হয়, তাহলে কি এস্তার?"

"আমি জানি না বাবা; তবে যুবকটি যদি সত্যি যুবরাজ না হয় তাহলে বলতে হবে এর আগে মিথ্যা কখনও সত্যের ভূমিকায় এত ভাল অভিনয় করে নি।"

খুসি হয়ে বণিক বলল, "একটি দুঃখের কাহিনী তোমাকে বলছি, শোন। …হিন্নোম উপত্যকার একটি কবরখানায় আমার জন্ম হয়। বাবা-মা ছিল জন্ম-দাসদাসী। রাজার বাগানে ডুমুর ও দ্রাক্ষালতার দেখাশুনা করত। ছেলেবেলায় আমিও তাদের সাহায্য করতাম। তারাই আমাকে বেচে দিয়েছিল রাজা হুর-এর কাছে। বাগান থেকে নিয়ে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার মাল-গুদামে। সেখানেই বড় হতে লাগলাম। সেখানে ছ'বছর কাজ করবার পরে সপ্তম বছরে মোজেস-এর বিধান অনুসারে আমি মুক্তি পেলাম।"

এস্তার ধীরে ধীরে হাততালি দিল। প্রশ্ন করল, "আর আমার মা?"

"সবই বলব এস্তার, ধৈর্য ধর। মনিবের কাছে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাকে ভালবেসে তার কাছেই চাকরি করতে চাইলাম। আরও সাত বছর মাইনের বিনিময়ে তার কাছে কাজ করলাম। সেই সময় মনিবের হয়ে সমুদ্রপথে জাহাজে চেপে এবং স্থলপথে সুদূর সুসা

ও পার্সিপোলিস ছাড়িয়ে রেশমের দেশে দেশে অনেক বাণিজ্য করে বেড়ালাম। পার হলাম অনেক ঝড়-বিপদ। মনিবের জন্য বয়ে আনলাম প্রচুর লাভের ধনরত্ন, আর নিজের জন্য সংগ্রহ করলাম প্রচুর অভিজ্ঞতা।...একদিন জেরুজালেমে তার বাসভবনের অতিথিশালায় থাকবার সময়ই প্রথম দেখলাম তোমার মাকে ; তাকে ভালবাসলাম, হৃদয় দিলাম, বিয়ের অনুমতি চাইলাম রাজা হুর-এর কাছে। মনিব বললেন, সে জন্ম-দাসী; তবে আমার সুখের জন্য তিনি তাকে মুক্তি দেবেন। তোমার মা আমাকে ভালবাসল, কিন্তু মনিবকে ছাড়তে চাইল না। বারে বারে তাকে অনেক মিনতি করলাম, অনেক বোঝালাম। কিন্তু তার ঐ এক কথা : সে আমার স্ত্রী হতে রাজী, কিন্তু আমাকেও তার সঙ্গে দাস হয়ে থাকতে হবে। নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম। দেখ এস্তার, এখানে দেখ।"

বাঁ কানের লতিটা সে টেনে বের করল।

"তুরপুণের দাগটা দেখতে পাচ্ছ কি ?"

"দেখেছি বাবা ; আমার মাকে তুমি কত ভালই বাসতে !"

বণিক বলতে লাগল, "সমুদ্রে ডুবে মনিবের মৃত্যু হল। আমার জীবনের সেই প্রথম দুঃখ। ততদিনে আমি তার প্রধান নায়েব হয়ে বসেছি। তার বিষয়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব আমার তত্ত্বাবধানেই চলত। তার বিধবার আমলেও সেই ব্যবস্থাই বলবৎ রইল। আমিও কাজের মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিলাম। লাভের উপর লাভ হতে লাগল ; ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠল। দশ বছর পার হয়ে গেল—তারপর নামল আঘাত—প্রোকিউরেটর গ্র্যাটাস-এর সেই দুর্ঘটনা। কিন্তু রোমকরা রটিয়ে দিল হত্যা বলে, আর সেই অছিলায় রোমের অনুমতিক্রমে বিধবা ও পুত্র-কন্যার অগাধ সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে নিল। সেখানেই থামল না। পুরো পরিবারটিকেই নিশ্চিহ্ন করে দিল। মানুষের স্মৃতি থেকে তারা এমন ভাবে মুছে গেল যেন সমুদ্র এসে সকলের আগোচরে তাদের গ্রাস করে ফেলেছে। আমরা জানতেও পারলাম না তারা কি ভাবে মারা গেছে—বা সত্যি সত্যি মারা গেছে কি না।"

এস্তার-এর দুই চোখে অশ্রুর মুক্তো।

"তোমার মনটা বড় নরম এস্তার, ঠিক তোমার মায়ের মত। তারপর শোন। খবর শুনে জেরুজালেম-এ ফিরে এলাম, কিন্তু প্রধান ফটকেই আমাকে গ্রেপ্তার করে এণ্টনিয়া দুর্গের অন্ধকার কক্ষে বন্দী করা হল। কারণ কিছুই বুঝলাম না। শেষে স্বয়ং গ্র্যাটাস এসে হুর-বংশের সব টাকা-পয়সা আমার কাছে দাবী করল। তখন তো আমার নামেই সব ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তাই গ্র্যাটাস আমাকে তার হুকুম মত সব কিছুতে সই করতে বলল। আমি আপত্তি করলাম। শুরু হল নির্যাতন। কিন্তু আমি অটল রইলাম। শেষ পর্যন্ত

সে আমাকে ছেড়ে দিল। ফিরে এলাম। নতুন করে বাণিজ্য শুরু করলাম—জেরুজালেমের রাজা হুর-এর পরিবর্তে এণ্টিয়ক-এর সাইমনাইডিস-এর নামে। তুমি তো জান এস্তার, তারপর থেকে কী প্রভুত উন্নতি আমার হয়েছে—প্রভুর আমলের লাখ-লাখ টাকা আমার হাতে যেন যাদুকরের ছোঁয়া লেগে দিনে দিনে বেড়েছে। তুমি আরও জান, তিন বছর পরে সিজারিয়াতে যাবার পথে গ্র্যাটাস দ্বিতীয় বার আমাকে আটক করে এবং তার সুবিধামতভাবে আমার স্বীকারোক্তি আদায় করতে চেষ্টা করে, দুঃসহ নির্যাতন চালায়। কিন্তু আমাকে টলাতে পারে না। এই ভগ্নদেহ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার জন্য ভেবে ভেবে দুঃখে শোকে আমার র্যাচেল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ঈশ্বরের কৃপায় আমি বেঁচে রইলাম। স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যের অনুমতি-পত্র নিয়ে এলাম। আর আজ—মেঘের রথে চড়ে যিনি আকাশ বিহার করেন তাঁর কৃপায়—নায়েব থাকা কালে আমার হাতে যা ছিল আজ তা এত বেশী গুণ বেড়েছে যা পেলে স্বয়ং সীজারও ধনবান হবেন।"

সাইমনাইডিস সগর্বে মাথা তুলল। দুজনের চোখে চোখ পড়ল। একে অন্যের মনের কথাও বুঝল। চোখ না নামিয়েই সে প্রশ্ন করল, "এস্তার, এ সম্পদ নিয়ে আমি কি করব?"

নিম্নস্বরে এস্তার জবাব দিল, "বাবা, প্রকৃত মালিক তো তা নিতেই এসেছিল।"

"আর তুমি, আমার মা; তোমাকে কি আমি ভিখারিণী করে যাব?" পরক্ষণেই কি ভেবে নিয়ে সে আবার বলল, "এবার শোন, কেন আজ সকালে আমি হেসে উঠেছিলাম। যুবকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল, ঠিক যেন তার বাবার যৌবনের প্রতিমূর্তি। মন চেয়েছিল তাকে অভিবাদন জানাতে। মনে হল, আমার কষ্টের দিন শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে সব পরিশ্রমের পালা। অনেক কষ্টে কান্নাকে বুকের মধ্যে চেপে রাখলাম। ইচ্ছা হল, হাত ধরে নিয়ে কত অর্থ আমি জমিয়েছি তাকে দেখাই, বলি, 'দেখ, এ সবই তোমার। আমি তোমার ভৃত্য, মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছি।' হয়তো বলেই ফেলতাম এস্তার, কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনটি চিন্তা এসে আমাকে বাধা দিল। সে যে আমার মনিবের ছেলে সেটা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে—এটাই প্রথম চিন্তা; যদি তাই হয়, তাহলে তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে; ধনীর গৃহে যারা জন্ম গ্রহণ করে তাদের অনেকের হাতেই যে সম্পত্তি হয়ে ওঠে অভিশাপের লীলা ভূমি।"

"সে তো চলে গেছে বাবা। আর কি আসবে?"

"আহা, বিশ্বস্ত মালুচ তার সঙ্গে রয়েছে। সময় হলেই তাকে নিয়ে আসবে।"

"সে কবে বাবা ?"

"দেরী হবে না—হবে না। সে জানে তার সব সাক্ষী মৃত। কিন্তু সে যদি সত্যি আমার মনিবের ছেলে হয় তাহলে অন্তত একজন জীবিত আছে যে তাকে চিনতে ভুল করবে না।"

"তার মা কি ?"

"না মা; সে সাক্ষীকে তার সামনেই হাজির করব। কিন্তু ততদিন সব কিছু ঈশ্বরের হাতেই তোলা থাক। আমি বড় শ্রান্ত। আবিমেলেচকে ডাক।"

বেন-হুরের সামনে একটা সাইপ্রেস-গাছের বন। তার ছায়ায় চলতে চলতে সে ভেরীর আওয়াজ শুনতে পেল। পরক্ষণেই ঘাসের উপর একজন দেশীয় লোককে শুয়ে থাকতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনিও কি আমার পথেই যাচ্ছেন ?"

"আমি যাচ্ছি স্টেডিয়ামের দিকে।"

"স্টেডিয়াম !"

"হ্যাঁ। যে ভেরীর আওয়াজ শুনলেন ওটা প্রতিযোগীদের উদ্দেশেই বাজানো হল। ওই শুনুন ! রথের চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।"

বেন-হুর কান পেতে শুনল, তারপর লোকটির কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমি ডিউয়াম্‌ভির অরিয়াস-এর ছেলে। আপনি ?"

"আমি মালুচ, এণ্টিয়ক-এর বণিক।"

"ভেরীর আওয়াজ ও চাকার শব্দ শুনে আমিও উত্তেজনা বোধ করছি। এ ব্যাপারে আমারও কিছুটা দক্ষতা আছে। চলুন, এগিয়ে যাই।"

বন পার হয়েই একটা মাঠ—স্টেডিয়ামের মত করে সাজানো। বর্শা পুতে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে প্রতিযোগিতার জায়গা ঠিক করা হয়েছে। দর্শকদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিড় ঠেলে দুজনে সেখানে গিয়ে বসল।

বেন-হুর একে একে রথ গুলো গুনল—মোট ন'টা। প্রত্যেক রথে চারটে করে ঘোড়া। প্রথম আটটা রথ এগিয়ে গেল, কোনটা হেঁটে, কোনটা দুল্‌কি চালে। কিন্তু শেষ রথটা এল জোর কদমে। দর্শকরা হৈ-চৈ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলো হকচাকিয়ে গোলমাল শুরু করে দিল। দর্শক-আসন থেকে একটা তীব্র চীৎকার শোনা গেল। ঘাড় ফিরিয়ে বেন-হুর দেখল, একটি আধ-বুড়ো লোক তার আসনে উঠে দাঁড়িয়েছে, দুই হাত মুঠো করে ছুঁড়ছে, দুটি চোখ যেন জ্বলছে; লম্বা পাকা দাড়ি রাগে কাঁপছে। তাকে দেখে আশপাশের দর্শকরা হাসছে।

"অন্তত ওর পাকা দাড়িকে তো সম্মান করা উচিত। লোকটি কে ?" বেন-হুর জানতে চাইল।

"মরুভূমি অঞ্চলের একজন মস্ত বড়লোক; অনেক উট ও ঘোড়ার মালিক; নাম শেখ ইল্ডেরিম।"

অনেক চেষ্টা করেও রথের চালক ঘোড়াগুলোকে বাগে আনতে পারছিল না, আর শেখ ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। সে চীৎকার করে চালককে গালাগালি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শেখের লোকজনরা এগিয়ে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে শান্ত করল।

ঠিক সেই সময় দূরে আর একটা রথ দেখা দিল। তার মাঝখানের দুটো ঘোড়া কালো; আর পাশে দুটো ঘোড়া বরফ-সাদা। রথ এগিয়ে আসতেই সমবেত দর্শক সহর্ষ অভিনন্দনে সোচ্চার হয়ে উঠল। তার কারণও ছিল। কী অপরূপ কারুকার্য-করা দুটি চাকা; মাঝখানে পেতলের উপর হাঁ-করা বাঘের মুখ আঁকা; সারা গায়ে স্বর্ণ-খচিত লতাপাতা শোভিত।

বেন-হুর সাগ্রহে রথের দিকে তাকাল। কে এই রথী? সহসা তার বিস্মিত দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হল—স্মৃতির পাতা খুলে গেল—রথী স্বয়ং মেসালা!

প্রতিযোগিতার মহলা শেষ হয়ে গেল। স্টেডিয়ামের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বেন-হুর শুনতে পেল, একটি আরব চীৎকার করে বলছে:

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষরা—শুনুন! শেখ ইল্ডেরিম ঘোষণা করেছেন—চারটি প্রিয় ঘোড়া নিয়ে তিনি প্রতিযোগিতায় এসেছেন। তিনি একজন শক্তিমান চালক চাইছেন। রথ চালিয়ে যে তাকে খুসি করতে পারবে তাকে তিনি প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেবেন।"

বেন-হুর দাঁড়াল। একবার ঘোষকের দিকে, একবার শেখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "মালুচ, এবার কোথায় যাওয়া হবে?"

"কাস্টালিয়াতে।"

"ওহো! কাস্টালিয়া! সেই পৃথিবীবিখ্যাত ঝর্ণা! চলুন।"

কিছুদূর এগিয়ে রাস্তাটা নীচে নেমে গেছে। ডানদিকে একটা ধূসর খাড়া পাহাড়, বাঁয়ে সতেজ বনভূমিসমন্বিত প্রান্তর, আর তারই মাঝখানে বিখ্যাত কাস্টালিয়া ঝর্ণা।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে বেন-হুর দেখতে পেল, পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে মিষ্টি স্বাদের একটা তীব্র জলধারা কালো পাথরের একটা মস্ত বড় পাত্রে ছিটকে পড়ে সফেন তরঙ্গে যেন টগবগ করে ফুটছে আর পরমুহূর্তেই নীচেকার ফাটল দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সেই পাত্রটির পাশে পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে বসে আছে একটি পুরোহিত—বৃদ্ধ, দাড়িওয়ালা, মুখময় বলিরেখা; মাথায় টুপি। সে সব শুনছে, সব দেখছে, কিন্তু একটি কথাও বলছে না। মাঝে মাঝে কোন দর্শক মুদ্রাসমেত একটা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঈষৎ পলক ফেলে সে মুদ্রাটা নিচ্ছে, আর বিনিময়ে লোকটিকে দিচ্ছে প্যাপিরাস গাছের

একটা পাত্র। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে পাতাটিকে পাত্রের জলে ডুবিয়ে ভিজে পাতাটাকে সূর্যের আলোয় মেলে ধরছে, আর তার বুকে ফুটে উঠছে একটি বিচিত্র কবিতা। বেন-হুরের ইচ্ছা হল এই দৈববাণীর ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবে, কিন্তু তার আগেই সে দেখতে পেল প্রান্তর পার হয়ে আরও একটি দল এগিয়ে আসছে।

প্রথমে দেখতে পেল একটা উট। যেমন লম্বা, তেমনই সাদা। একজন অশ্বারোহী সেটাকে চালিয়ে নিয়ে আসছে। উটের পিঠে হাওদা—বেশ বড় আর লাল-সোনালি সুতোয় তৈরি। সঙ্গে বর্শাধারী আরও দুজন অশ্বারোহী।

হাওদার নীচে বসে আছে কারা ঐ পুরুষ ও নারী? সকলেই তাদের অভিবাদন জানাল।

ঠিক সেই মুহূর্তে চাকার ঘর্ঘর শব্দ ও ধাবমান অশ্বের দ্রুত ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। সমবেত ভয়ার্ত জনতা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। মালুচও ছুটতে ছুটতে বেন-হুরকে বলল, "এই রোমকটা দেখছি আমাদের সকলকেই পায়ের তলায় পিষে মারতে চায়। তাকিয়ে দেখুন!"

সেদিকে তাকিয়ে বেন-হুর দেখল, মেসালা তার চার ঘোড়ার রথ চালিয়ে দিয়েছে জনতাকে লক্ষ্য করে। জনতা সরে যাওয়ায় উটটা একেবারে তার সামনে পড়ে গেছে। ইথিওপীয় চাকরটি ভয়ে হাত মোচড়াচ্ছে। হাওদার মধ্যে বৃদ্ধ পুরুষটি পালাবার ইচ্ছা থাকলেও বার্ধক্যের অক্ষমতা ও মর্যাদা-বোধের জন্য পালাতে পারল না। স্ত্রীলোকটির পক্ষেও আত্মরক্ষার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। বেন-হুর ছুটে তাদের সামনে গিয়ে চীৎকার করে বলল, "থাম! দেখছ না কোথায় যাচ্ছ! পিছনে হটে যাও, পিছনে!"

যেন মজা পেয়েছে এমনিভাবে রথারোহী হাসতে লাগল। উপায়ান্তর না দেখে বেন-হুর লাফিয়ে পড়ে মাঝখানের ঘোড়া দুটোকে চেপে ধরল। প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে বলল, "রোমক কুত্তা! তোর কি জীবনের ভয় নেই?"

ঘোড়া দুটো হঠাৎ ঘুরে গেল। ঘুরে গেল শকট-দণ্ডটাও। ফলে রথটাও উল্টে গেল। মেসালা কোন রকমে পড়ে যাওয়া থেকে রেহাই পেল, কিন্তু তার সঙ্গী মার্টিলাস একতাল কাদার মত মাটিতে ছিটকে পড়ল। বিপদ কেটে গেছে দেখে আশেপাশের দর্শকরা ঠাট্টার সুরে হেসে উঠল।

তখন প্রকাশ পেল রোমকটির অতুলনীয় ধৃষ্টতা। রথ থেকে নেমে সে উটের দিকে এগিয়ে গেল। বেন-হুরকে একবার দেখে নিয়ে বৃদ্ধ ও স্ত্রী-লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, "ক্ষমা—আমি আপনাদের দুজনের কাছেই ক্ষমা চাইছি। শপথ করে বলছি, আপনাদের দুজনকে এবং আপনাদের উটটিকে

আমি দেখতে পাই নি।" তারপর স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "হে অপরিচিতা, তুমি যত সুন্দরী ততই নিষ্ঠুরা। এপোলো যদি তোমাকে সরিয়ে না নেয়, তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে।"

সংগী মার্টলাস ততক্ষণে ঘোড়াগুলিকে শান্ত করেছে দেখে মেসালা রথে চড়ে চলে গেল। স্ত্রীলোকটি তার গমন-পথের দিকেই তাকিয়ে রইল।

উটটিও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। বৃদ্ধ লোকটি বলল, "এদিকে এস তো।"

বেন-হুর সসম্ভ্রমে তার দিকে এগিয়ে গেল।

"লোকটাকে আজ উচিত শিক্ষা দিয়েছ। এক ঈশ্বরের নামে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বালথাজার, মিশরের লোক। ডফনে গ্রামের ওপারে যে বড় তাল-বাগান আছে সেইখানে শিবির ফেলেছেন মহান শেখ ইল্ডেরিম। আমরা তারই অতিথি। সেখানেই আমাদের খোঁজ নিও। সেখানে তোমার জন্য পান-আহারের ব্যবস্থা থাকবে।"

তাদের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে বেন-হুর দেখতে পেল, কিছুটা দূরে চলেছে মেসালা—আগের মতই খুসি ও নির্বিকার, মুখে বিদ্রূপের হাসি।

সাইমনাইডিস তার চিরসংগী চেয়ারটায় বসে আছে। পাশে আছে মেয়ে এস্তার। ঘরে ঢুকল মালুচ।

চেয়ারের কাছে এগিয়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "প্রভুর শান্তি হোক। শান্তি হোক মা-জননীরও।"

"যুবকটির খবর কি মালুচ?"

সহজ সরলভাবে মালুচ সারা দিনের ঘটনা নিবেদন করল। সব শুনে বৃদ্ধ খুসি মনে বলল, "ধন্যবাদ মালুচ, তোমার কাজ খুব ভালভাবেই করেছ। এবার তার পরিচয় কি জেনেছ বল।"

"সে একজন ইস্রায়েলী, জুডার বংশজাত।"

"তুমি নিশ্চিত জান?"

"নিশ্চিত।"

"কথায় বা কাজে তার মনের ভাব কিছু বুঝতে পেরেছ?"

"তার প্রথম লক্ষ্য—মা ও বোনের খোঁজ করা। তারপরই তার ক্ষোভ রোমের বিরুদ্ধে; আর যেহেতু তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার সংগে মেসালা জড়িত সেজন্য বর্তমানে তার প্রধান লক্ষ্য তাকে পর্যুদস্ত করা। ঝর্ণার ধারে তার একটা সুযোগ সে পেয়েছিল, কিন্তু জায়গাটা যথেষ্ট প্রকাশ্য নয় বলেই সে সরে দাঁড়াল।"

সাইমনাইডিস চিন্তিত মুখে বলল, "মেসালা প্রভাবশালী লোক।"

"তা ঠিক ; তবে তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ঘটবে সার্কাস-এ —প্রতিযোগিতায়।"

"আচ্ছা !—তাহলে ?"

"অরিয়াস-এর ছেলেই জিতবে।"

"কেমন করে বুঝলে ?"

মালুচ হেসে বলল, "তার কথা শুনে বুঝেছি। তাছাড়া; তার সারা মুখে দেখেছি রোমক-বিদ্বেষের অগ্নিশিখা।"

"ঠিক আছে মালুচ। এখন আহারাদি কর গে। তাল-বাগানে যাবার জন্য প্রস্তুত থেকো। আসন্ন প্রতিযোগিতায় যুবকটিকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। সকালে এস। ইল্ডেরিমকে একটা চিঠি দিয়ে দেব।" তারপর আপন মনেই বলল, "হয় তো আমি নিজেও সার্কাস-এ যাব।"

মালুচ চলে যাবার পরে সাইমনাইডিস অনেকটা দুধ খেল। ফলে একটু সতেজ বোধ করল। মেয়ের দিকে ফিরে বলতে লাগল, "এস্তার, ঈশ্বর আমার প্রতি সদয়, খুবই সদয়। রহস্যের আবরণেই তিনি থাকেন, তবু কখনও কখনও মনে হয় তাঁকে যেন দেখতে পাচ্ছি, তাঁর কথা বুঝতে পারছি। আমি বুড়ো হয়েছি মা, এবার তো চলে যেতেই হবে; কিন্তু জীবনের এই শেষ প্রহরে যখন সব আশাই নির্মূল হতে বসেছিল তখন যেন তিনি নতুন করে এক আশার বাণী পাঠিয়েছেন। সমস্ত পৃথিবীতে যে নবজন্মের লগ্ন সমাগত আমি যেন তারই অংশীদার হতে চলেছি।"

এস্তার বাবার কাছে আরও ঘন হয়ে বসল। বৃদ্ধ বলতে লাগল; "রাজা জন্ম লাভ করেছেন। বালথাজার বলেছে, তিনি যখন ছিলেন মায়ের কোলে শিশুটি তখন সে তাঁকে দেখেছে; উপহার দিয়ে তাঁকে পূজা করেছে। ইল্ডেরিম বলেছে, সাতাশ বছর আগে এক ডিসেম্বর মাসে বালথাজার তার সঙ্গীদের নিয়ে এসেছিল তার শিবিরে হেরোড-এর হাত থেকে লুকিয়ে বাঁচবার জন্য। সুতরাং তাঁর আবির্ভাবের আর দেরী থাকতে পারে না। আজ রাতে বা কালই তা হতে পারে। ইস্রায়েলের পবিত্র পূর্বপুরুষগণ; এ চিন্তায়ও কী সুখ! রাজা যেদিন আসবেন সেদিন তাঁরও তো চাই অর্থবল ও জনবল, কারণ তিনি যেই হোন; তিনিইও তো আসবেন মানুষেরই রূপে, তোমার-আমার মতই মানুষ হয়ে। আর অর্থ পেলেই চাই লোকজন, রক্ষক, এবং লোকজন হলেই চাই তাদের পরিচালক নেতা। তবে—তবেই ভেবে দেখ—আমার সামনে কি দেখতে পাচ্ছ না প্রশস্ত পথ ?—দেখতে পাচ্ছ না আমাদের যুবক মনিব সেই পথ ধরে ছুটে চলেছে ?—আর—আর তার পরেই আমার মেয়ের সুখের দিনের শুরু।"

তাল-বাগানে শেখ ইল্ডেরিম-এর রাজকীয় শিবিরে নৈশ ভোজনের আয়োজন হয়েছে।

এই বিদেশেও শেখের রাজপাট খুব একটা ছোট নয়। একদিকে বড় বড় তিনটে তাঁবু—একটা তার নিজের, একটা অতিথিবর্গের, অপরটি তার স্ত্রী ও তার সঙ্গিনীদের। অপরদিকে বাকি ছ'টা কি আটটা ছোট ছোট তাঁবুতে থাকে চাকর-বাকররা ও যে সব উপজাতীয় লোকজনদের দেহরক্ষী হিসাবে নিয়ে আসা হয়েছে তারা।

ইল্ডেরিম ও বেন-হুর বসে গল্প করছিল, এমন সময় বাল্‌থাজারকে এনে একটা ডিভানে বসিয়ে দেওয়া হল। দুজনই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করল। একটা ঢিলে কালো জোব্বায় বাল্‌থাজার-এর শরীরটা জড়ানো। দুর্বল পদক্ষেপে খুব ধীরে ধীরে সতর্কভাবে একখানা লাঠি ও চাকরের উপর ভর দিয়ে চলাফেরা করে।

বেন-হুরের কাঁধে হাত রেখে শেখ বলল, "বাল্‌থাজার, ইনিই সেই অতিথি যিনি আজ সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে আহার করবেন। আমি একে কথা দিয়েছি, আগামী কাল প্রতিযোগিতার মহলার সময় আমার ঘোড়াগুলি একে দেব। যদি সব কিছু ভালভাবে চলে তাহলে আসন্ন সার্কাস-এ তিনিই ঘোড়াগুলিকে নিয়ে দৌড়বেন।"

মিশরীয় বৃদ্ধ যুবকটির দিকে তাকাল, বিস্মিত হয়ে আবারও তাকাল, একটু ইতস্তত করতে লাগল। ইল্ডেরিম বলল, "ভাল পরিচয়-পত্র নিয়েই ইনি এসেছেন। মহান রোমক নাবিক অরিয়াস-এর ছেলে বলেই তাকে জানবেন, যদিও সে ইস্রায়েলী বলেই নিজের পরিচয় দিয়েছে, আর তার কথা আমি বিশ্বাস করেছি।"

বাল্‌থাজার এবার কথা বলল, "উদার শেখ, আজ আমার জীবন বিপন্ন হয়েছিল এবং হয় তো মারাই যেতাম যদি ঠিক এরই মত দেখতে একটি যুবক—জানি না সে এই একই লোক কি না—এগিয়ে এসে আমাকে না বাঁচাত।" তারপর বেন-হুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমিই কি সেই লোক নও ?"

বিনীতভাবে বেন-হুর জবাব দিল, "এতটা বলতে পারি না। তবে কাস্টালিয়া ঝর্ণার পাশে একটি উদ্ধত রোমকের ঘোড়া যখন আপনার উটের দিকে ছুটে যাচ্ছিল তখন আমিই সেগুলিকে থামিয়েছিলাম।"

শেখ বেন-হুরকে বলল, "সে কি! এর চাইতে বড় প্রশংসা-পত্র কিছু হতে পারত না জেনেও আপনি এ বিষয়ে কিছুই আমাকে বলেন নি। আমি কি একজন সত্যিকারের আরব নই ? হাজার হাজার আরবের আমি কি শেখ নই ? ইনি কি আমার অতিথি নন ? আর আমার অতিথির জন্য ভাল-মন্দ করা কি

আমার জন্যই করা নয়? এ কাজের পুরস্কার আপনি এখানে ছাড়া আর কোথায় পাবেন? আমার হাত ছাড়া সে পুরস্কার আর কে দেবে?"

তার কণ্ঠস্বর ক্রমেই তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর হতে লাগল। একটু থেমে সে বলল, "এবার চলুন, খাদ্য প্রস্তুত।"

বেন-হুর হাত বাড়িয়ে বালথাজারকে ধরে টেবিলে বসিয়ে দিল। প্রাচ্য প্রথায় তিনজন খেতে বসল—একজন আরব, একজন ইহুদী ও একজন মিশরীয়, সকলেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

॥ পঞ্চম পর্ব ॥

দু'জন সভাসদ মেসালার ঘরে ঢুকে তার হাত থেকে প্রত্যেকেই একখানি করে সরকারী খাম নিল। প্রতিটি খামই সিল-করা ও একই চিঠির দুই প্রস্থ। খামের মধ্যে আছে বর্তমানে সিজারিয়ার অধিবাসী প্রকিউরেটার ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাসকে লিখিত একখানি চিঠি। খামের চিঠি যে খুবই জরুরী সেটা সহজেই অনুমেয়, কারণ দুজন সভাসদের একজন যাবে স্থলপথে, অপর জন জলপথে, আর দুজনকেই নির্দেশ দেওয়া হল যাত্রাপথ যথা সম্ভব ত্বরান্বিত করতে।

এই চিঠির বিবরণ পাঠকের পক্ষে একান্ত জ্ঞাতব্য মনে করেই নীচে তার মর্মার্থ দেওয়া হল :

মেসালা লিখছে গ্র্যাটাসকে : একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা আপনাকে লিখছি। জেরুজালেমের যুবরাজ বেন-হুরকে আপনার নিশ্চয় মনে আছে। আপনার স্মৃতি যদি কম-জোর হয়ে থাকে তাহলে কপালের কাটা দাগটা হয় তো আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আপনার জীবননাশের চেষ্টার শাস্তি হিসাবে গোটা পরিবারকে আটক করে দণ্ডিত করা হয়েছিল, আর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এ কথা বলতে আজ আর কোন লজ্জার কারণ নেই যে সেই সম্পত্তি আমরা দু'জনই ভাগাভাগি করে ভোগ দখল করে চলেছি। পরিবারের সকলকে নিশ্চিত অথচ স্বাভাবিক মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবার পরিকল্পনাই সেদিন আমরা নিয়েছিলাম। দুষ্কৃত-কারীর মা ও বোন সম্পর্কে কি ব্যবস্থা আপনি নিয়েছিলেন সেটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে; তবু আজও তারা বেঁচে আছে কি না জানতে ইচ্ছা করে। অপর দিকে আপনার স্মরণার্থে জানিয়ে দিতে চাই যে প্রকৃত অপরাধীকে জাহাজের ক্রীতদাস করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।...এবার আসল কথাটি বলি। গত রাতে রোম থেকে সদ্য আগত একটি দলের ভোজসভায় প্রধান হিসাবে

উপস্থিত থেকে একটি আশ্চর্য কাহিনী শুনে এসেছি। আপনি জানেন, কন্সাল ম্যাক্সেণ্টিয়াস পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান উপলক্ষ্যে আজ এখানে আসবে। তার সঙ্গে যারা অভিযানে যোগ দেবে তাদের মধ্যে আছে পরলোকগত ডিউয়াম্‌ভির কুইণ্টাস অরিয়াস-এর দত্তকপুত্র। আর কী আশ্চর্য! ডিউয়াম্‌ভির-এর যে পুত্র ও উত্তরাধিকারীর কথা আমি বলছি সে কিন্তু আসলে সেই বেন-হুর জাহাজের দাঁড় টানতে টানতে পাঁচ বছর আগেই যার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। বুঝতেই পারছেন, এখন আমার সমূহ বিপদ—কিসের বিপদ সেটা আপনাকে বলাই বাহুল্য। এই বেন-হুর ছিল আমার ছোটবেলায় খেলার সাথী; কিন্তু আজ তার জীবনের একমাত্র চিন্তা—প্রতিহিংসা: দেশের জন্য, মায়ের জন্য, বোনের জন্য, নিজের জন্য, হারানো সম্পত্তির জন্য প্রতিহিংসা। জীবনের মূল্য ব্যতীত সে প্রতিহিংসা তৃপ্ত হবে না।…এই ইহুদীটিকে গতকাল আমি দেখেছি বিখ্যাত কাস্টালিয়া ঝর্ণার ধারে। আমার স্থির বিশ্বাস এই মুহূর্তে তাকে পাওয়া যাবে তাল-বনে বিশ্বাসঘাতক শেখ ইল্ডেরিম-এর শিবিরে। আমাদের শক্ত মুষ্টির বাইরে এই শেখ আর বেশী দিন থাকতে পারবে না। ম্যাক্সেণ্টিয়াস যদি প্রথম পদক্ষেপ এই আরবকে জাহাজে চাপিয়ে রোমে পাঠিয়ে দেয় তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।…এই ইহুদীটিকে নিয়ে কি করা হবে সেটা আপনিই ভেবে দেখবেন। তবে এ কথা খাঁটি সত্য যে মানুষের যে কোন কাজেই তিনটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল—স্থান, কাল ও কর্তা। আর যদি এটাকেই উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন তাহলে আপনার এই প্রিয় বন্ধুটির হাতে সে কাজের ভার দিতে কোন রকম দ্বিধা করবেন না।

সভাসদ দু'জন যখন চিঠি নিয়ে মেসালার বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে গেল, সেই সময়ই বেন-হুর হ্রদের জলে স্নান সেরে প্রাতরাশ শেষ করে স্বল্পবাসে সজ্জিত হয়ে ইল্ডেরিম-এর শিবিরে ঢুকল।

ডিভানে বসেই শেখ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, "ঘোড়া তৈরি, আমিও তৈরি। আপনি?"

"আমিও তৈরি।"

ইল্ডেরিম হাততালি দিল।

"এখনই ঘোড়া এসে পড়বে। আপনি বসুন।"

"ঘোড়া কি রথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে?"

"না।"

বেন-হুর বলল, "তাহলে সে কাজটা আমাকেই করতে দিন। আরবি ঘোড়াগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া দরকার। দেখুন শেখ, আমাকে তাদের নাম জানতে হবে, যাতে নাম ধরে ডাকতে পারি। তাদের মেজাজ

বুঝে আমাকে চলতে হবে ; বেয়াড়াপনা করলে বকতে হবে, শান্ত হলে আদর করতে হবে। চাকররা বরং ঘোড়ার সাজগুলো এনে দিক।"

"আর রথ ?" শেখ প্রশ্ন করল।

"আজ রথ চাই না। তার বদলে বরং পাঁচ নম্বর ঘোড়া এনে দিক। অন্য ঘোড়ার মত সেটারও পিঠে কোন সাজ থাকবে না।

ইল্ডেরিম অবাক হয়ে একটি চাকরকে ডেকে বলল, "চারটে ঘোড়ার জন্য সাজ আনতে বল, আর সাইরিয়াস-এর জন্য আনুক শুধু লাগাম।

বেন-হুর নিজের হাতে ঘোড়াগুলোকে সাজ পরাল। শিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে মুখে লাগাম এঁটে দিল। বলল, "এবার সাইরিয়াসকে আন।"

একলাফে সে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। কোন আরবও বোধ হয় এর চাইতে ভালভাবে সওয়ার হতে পারত না।

"এবার লাগামগুলো দাও।"

আলাদা-আলাদা করে লাগামগুলো তার হাতে তুলে দেওয়া হলে সে বলল, "শেখ সাহেব, আমি তৈরি। আমাকে মাঠ পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন লোক দিন, আর জল নিয়ে কিছু লোককে পাঠান।"

যাত্রা শুরু হল। ঘোড়াগুলো কোন রকম গোলমাল করল না। নবাগত সওয়ারকে তারা যেন বুঝতে পেরেছে। হাল্কা চালে চলতে শুরু করল। আর সবই ঠিক আছে, শুধু রথের বদলে বেন-হুর বসেছে সাইরিয়াস-এর পিঠে। খুসি মনে শেখও শিবিরের সব লোকজন নিয়ে চলল তাদের পিছনে পিছনে।

দৌড় শুরু হল। প্রথমে সামনা-সামনি, তারপর চক্রাকারে। প্রথমে হেঁটে, তারপর দুলকি চালে, আর তারপরে জোর কদমে। দৌড়ের চক্রটা কমতে কমতে ক্রমেই ছোট হতে লাগল। এই ভাবে অনুশীলন চলল একটি পুরো ঘণ্টা।

ঘোড়া থামিয়ে শেখের কাছে এসে বেন-হুর বলল, "ধন্যবাদ শেখ ইল্ডেরিম। আর একটু অনুশীলন করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বড় ভাল আপনার ঘোড়াগুলি। যেমন সুন্দর, তেমনই তেজী।"

একটু পরেই মালুচ সেখানে এসে হাজির হল। সুযোগ মত বলল, "শেখ সাহেব, বণিক সাইমনাইডিস-এর কাছ থেকে খবর বয়ে এনেছি।"

আরবটি উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, "সাইমনাইডিস! আ! খুব ভাল। 'আবন্দন' তার সব শত্রু নিপাত করুন।"

মালুচ বলল, "এই চিঠি তিনি পাঠিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, প্রাপ্তিমাত্রই পড়তে হবে।"

সেখানে দাঁড়িয়েই খামের সিল ভেঙে ভাল কাপড়ে জড়ানো দুখানি চিঠি বের করে ইল্ডেরিম পড়তে লাগল।

[১ নং চিঠি]

সাইমনাইডিস লিখছে শেখ ইল্ডেরিমকে : কুশল প্রশ্নাদির পরে অরিয়াস-এর দত্তক-পুত্রের কথা উল্লেখ করে বলেছে, তার যদি কোন রকম সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শেখ যেন অবশ্য তা করেন, কারণ যুবকটি তার খুবই প্রিয়পাত্র। দরকার হলে তার জন্য যে কোন রকম ক্ষতিপূরণ করতেও সাইমনাইডিস রাজী থাকবে। তারপর দলবলসহ শেখদের সকলকে সার্কাস-এ খেলার দিন উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ করে জানিয়েছে যে; সকলের জন্যই আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[২ নং চিঠি]

হে বন্ধু, প্রচুর অভিজ্ঞতা থেকে আপনাকে একটা কথা লিখছি। অ-রোমক যে সমস্ত লোকের অর্থ ও মালপত্র প্রচুর আছে তাদের সতর্ক হবার মত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি—অসীম ক্ষমতার অধিকারী কোন পদস্থ রোমক কর্মচারীর আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে। আজই আসছেন কন্সাল ম্যাক্সেণ্টিয়াস। অতএব সাবধান!

আর একটা কথা। আপনার বিরুদ্ধে এমন একটি ষড়যন্ত্র চলছে যার প্রতিপক্ষ স্বয়ং হেরোড; তার রাজ্যে আপনার প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। সুতরাং সজাগ থাকবেন। এণ্টিয়ক থেকে দক্ষিণমুখী রাজপথে আপনার যে সব রক্ষী আছে আজ সকালেই তাদের কাছে নির্দেশ পাঠান, এখান থেকে বহির্গামী বা আগমনকারী যে কোন পত্র-বাহককে যেন তল্লাসী করা হয়, আর তাদের কাছে যদি আপনার সম্পর্কিত কোন চিঠিপত্র পাওয়া যায় তাহলে তা যেন অবশ্য আপনাকে দেখানো হয়।

কোন রকম দ্বিধা করবেন না। চিঠি পড়েই পুড়িয়ে ফেলবেন। হে আমার বন্ধু; আপনার বন্ধু…সাইমনাইডিস।

চিঠি দুখানি দ্বিতীয়বার পড়ে কাপড়ের মধ্যে মুড়ে ইল্ডেরিম কোমরে গুঁজে রাখল।

শেখ বেন-হুরের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। সে আসতেই দু'জনে একটা ডিভানে বসল। একটা খাম খুলে ইল্ডেরিম বলল; "অরিয়াস-পুত্র, দেখুন তো, আপনাদের লাতিন ভাষার এই চিঠিটা একবার পড়ে দিন তো।"

চিঠিটা বেন-হুরের হাতে দিল। সেও সহজ ভাবেই পড়তে শুরু করল। "মেসালা লিখছে গ্র্যাটাসকে!" সে থেমে গেল। অজ্ঞাত আশংকায় তার বুকের রক্ত চল্‌কে উঠল। সেটা লক্ষ্য করে ইল্ডেরিম বলল, "আমি কিন্তু অপেক্ষা করে আছি।"

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বেন-হুর আবার পড়তে শুরু করল। বলাই নিষ্প্রয়োজন যে এই চিঠিখানি প্যাটাসকে লিখিত দুখানি চিঠিরই অন্যতম।

পড়তে পড়তে বেন-হুরের কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। নিজেকে সংযত রাখবার জন্য দু'বার সে থামল। তার এই যন্ত্রণা লক্ষ্য করে শেখ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "অরিয়াস-পুত্র, এবার আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। চিঠিটা আপনি মনে মনেই পড়ুন। তারপর মনের জোর ফিরে পেলে আমাকে ডেকে পাঠাবেন; আমি এসে সব শুনব।"

শেখ তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। বেন-হুর আবার পড়তে লাগল, "দুষ্কৃতকারীর মা ও বোন সম্পর্কে কি ব্যবস্থা আপনি নিয়েছিলেন সেটা নিশ্চয় আপনার মনে আছে; তবু আজও তারা বেঁচে আছে কি না জানতে ইচ্ছা করে।" বেন-হুর চমকে উঠল। জায়গাটা বার বার পড়ল। তারপর বলে উঠল, "তারা মরে নি; মরলে সে নিশ্চয় সে কথা শুনত।"

চিঠিটা আগাগোড়া আর একবার পড়ে সে শেখকে ডেকে পাঠাল। শান্ত গলায় বলতে লাগল, "এর আগে আমার জীবনের ইতিহাস আপনাকে বলি নি। কিন্তু এখন আপনাকে সব কথা খুলে বলতে আমি বাধ্য। বিশেষত যখন জানতে পেরেছি যে একই শত্রু আমাদের দুজনেরই বিরুদ্ধে হাত তুলেছে; তাই আমাদেরও এক যোগে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।"

বেন-হুর চিঠির সেই অংশটা পড়তে লাগল: "ম্যাক্সেণ্টিয়াস যদি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই আরবকে জাহাজে চাপিয়ে রোমে পাঠিয়ে দেয় তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।"

"রোমে! আমাকে! আমি দশ হাজার বর্শাধারী অশ্বারোহীর মালিক শেখ ইল্ডেরিম—আমাকে রোমে পাঠাবে!"

সে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। দুই হাত সামনে বাড়াল। আঙুলগুলি বাজপাখির নখের মত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। সাপের চোখের মত জ্বলছে দুটি চোখ।

"হে ঈশ্বর! কবে এ স্পর্ধার অবসান হবে? আমি স্বাধীন মানুষ: আমার লোকজনরা সবাই স্বাধীন। তবু আমাদের ক্রীতদাস হয়ে মরতে হবে? অথবা প্রভুর পায়ের তলায় কুঁকড়ে পড়ে থাকা কুকুরের মত বাঁচতে হবে? চাবুকের ভয়ে তার হাত চাটতে হবে: আঃ! আবার যদি যুবক হতে পারতাম! বিশ বছর—দশ বছর—পাঁচ বছর বয়সও যদি ঝেড়ে ফেলতে পারতাম!"

দাঁত কড়মড় করতে করতে সে দুই হাত ছুঁড়তে লাগল। পরমুহূর্তে কি মনে হতেই সে ছুটে গেল বেন-হুরের কাছে। সজোরে তারা কাঁধটা চেপে ধরে বলে উঠল, "অরিয়াস-পুত্র; আমি যদি আপনার মত হতাম—এমনই যুবক,

শক্তিমান, রণকুশল ; আপনারই মত আমার বুকের মধ্যেও যদি সেই প্রতিহিংসার আগুন জ্বলত যা ঘৃণাকেও করে মহৎ—এই মুহূর্তে দূর হয়ে যাক তোমার ও আমার যত ছদ্মবেশ ! তুমিই হুর-পুত্র, আমি বলছি তুমিই হুর-পুত্র—"

সে নাম শুনে বেন-হুরের সব রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেল। বিস্মিত, বিমূঢ় হয়ে সে আরবের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বৃদ্ধ লোকটি ঝড়ের বেগে বলে যেতে লাগল, "হুর-পুত্র, আমি বলছি, তোমার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার অর্ধেকও যদি আমার প্রতি করা হত, দুঃসহ স্মৃতির জ্বালা যদি তোমার মত আমাকে তাড়া করে ফিরত, তাহলে চুপ করে থাকতাম না, থাকতে পারতাম না। পৃথিবীর যেখানে যত ক্ষোভ জমে আছে তাকে আমার নিজের ক্ষোভের সঙ্গে যোগ করে আমি প্রতিহিংসায় মেতে উঠতাম। দেশে দেশে আগুন ছড়িয়ে বেড়াতাম। যে কোন মুক্তি-যুদ্ধের সামিল হতাম, রোমের বিরুদ্ধে যে কোন সংগ্রামে অংশীদার হতাম। যা কিছু রোমক সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতাম, অস্ত্রে বিদ্ধ করতাম প্রতিটি জীবিত রোমককে। আঃ! আমার চোখে ঘুম থাকত না। আমি—আমি—"

হাঁপাতে হাঁপাতে শেখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। অনেক বছর পরে অন্যের মুখে যুবকটি তার নিজের নাম শুনতে পেল। অন্তত একটি মানুষ তাকে চেনে, আর সে মানুষ মরুভূমি থেকে সদ্য আগত এক আরব।

"শেখ সাহেব, এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন ?"

"সব রাজপথে আমার লোক আছে। একজন পত্র-বাহকের কাছ থেকে তারাই এটা উদ্ধার করেছে। কিন্তু—আমার জবাব কিন্তু এখনও পাই নি।"

বেন-হুর বলল, "আপনি যা যা বলেছেন সবই আমি করব—অবশ্য যতদূর সাধ্যে কুলোয়। এত কাল ধরে—দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে প্রতিহিংসার স্বপ্নই তো আমি দেখেছি। রোমে এসেছি প্রতিহিংসার পাঠ নিতে। সব বড় বড় শিক্ষক ও অধ্যাপকের কাছে আমি গিয়েছি—দর্শন বা অলংকারশাস্ত্র পাঠের জন্য নয়, শিখতে গিয়েছি রণ-কৌশল। গিয়েছি গ্যাডিয়েটরদের কাছে, সার্কাস-এর বিজয়ী বীরদের কাছে ; তারাই আমার আসল শিক্ষক। শেখ সাহেব, আমি সৈনিক হতে পেরেছি, কিন্তু আমার স্বপ্নকে সফল করতে হলে আমাকে হতে হবে নায়ক। আর সেই আশা নিয়েই পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে যোগ দিয়েছি। এ যুদ্ধের অবসানে যদি সুস্থ দেহে বেঁচে থাকি, তখন আমি হব রোমক শিক্ষায় পারদর্শী রোমের শত্রু, তখন হবে রোমের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ। এই আমার জবাব।"

ইন্ডেরিম তার কাঁধে হাত রেখে তাকে চুম্বন করে গভীর আবেগের সঙ্গে বলল, "হুর-পুত্র, তোমার ঈশ্বর যদি তোমার প্রতি করুণা না করেন, তাহলে

বুঝতে হবে তিনি মৃত। আমার শুধু একটি কথা, একটি শপথ, আমার হাত রইল তোমার হাতে—আর সেই সঙ্গে রইল আমার লোকলস্কর, ঘোড়া, উট, ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য মরুভূমি। বাস। আবার দেখা হবে।"

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে শেখ দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে গেল।

রাত হল। শিবিরের দরজায় একা বসে আছে বেন-হুর। ইল্ডেরিম এখনও ফেরে নি।

ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হল মালুচ। অভিবাদন জানিয়ে বলল, "শেখ ইল্ডেরিম আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার সঙ্গে শহরে চলুন। তিনি অপেক্ষা করছেন।"

বেন-হুর কোন প্রশ্ন করল না। দুজনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সাইমনাইডিস-এর বাসভবনের ফটকে এসে তারা ঘোড়া থেকে নামল। বেন-হুর একাকি ভিতরে ঢুকল।

তিনটি প্রাণী তার দিকে তাকিয়ে আছে—সাইমনাইডিস, ইল্ডেরিম ও এস্তার। বেন-হুর পর পর তাদের দেখতে লাগল। তার মনে অনেক প্রশ্ন: আমার সঙ্গে এদের কি কাজ? এরা বন্ধু, না শত্রু?

"হুর-পুত্র—"

অতিথি বক্তার দিকে তাকাল।

ধীরে ধীরে প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়ে সাইমনাইডিস বলল, "হুর-পুত্র, আমাদের পূর্বপুরুষদের যিনি ঈশ্বর তিনি আপনাকে শান্তি দিন—এই আমার কামনা।"

বেন-হুর বলল, "সাইমনাইডিস, আপনার এ কামনা আমি মাথা পেতে নিলাম। ছেলের মতই সেই কামনা আমি আপানাকেও ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

সাইমনাইডিস মাথা নুইয়ে সে দান গ্রহণ করল। তারপর বলল, "মা এস্তার, কাগজগুলি এনে দাও।"

এস্তার দেয়ালের তাক থেকে এক বাণ্ডিল প্যাপিরাস-পাতা এনে বাবার হাতে দিল। প্রথম পাতাটা খুলে সাইমনাইডিস বলল, "রোমকদের হাত থেকে আপনার বাবার যে অর্থ আমি বাঁচাতে পেরেছিলাম, এই তার হিসাব। সম্পত্তি কিছুই রক্ষা করা যায় নি, শুধু বানিজ্যসূত্রে রোম, আলেকজান্দ্রিয়া, দামাস্কাস, কার্থেজ, ভ্যালেন্সিয়া ও অন্যত্র থেকে যে অর্থ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তার মোট পরিমান ইহুদী সিকায় এক শ' বিশ ট্যালেণ্ট।"

সে পাতাটা এস্তারকে দিয়ে সে আর একটা পাতা তুলে নিল। "এই একশ' বিশ ট্যালেণ্ট হাতে নিয়ে ব্যবসা শুরু করে আমি মোট যা লাভ করেছি এতে তারই হিসাব লেখা আছে। মোট লাভ হয়েছে পাঁচ শ' তিপ্পান্ন ট্যালেণ্ট।

সুতরাং আপনার বাবার কাছ থেকে পাওয়া মূলধনের সঙ্গে এই লভ্যাংশ যোগ করলে মোট যে ছ'শ' তিয়াত্তর ট্যালেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে তার সবটারই মালিক আপনি, আর তার ফলে হে হুর-পুত্র, আপনি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী। আর এই ধন-সম্পত্তি নিয়ে আপনি করতে পারেন না এমন কোন কাজেই নেই।"

পাতার বাণ্ডিল হাতে নিয়ে বেন-হুর উঠে দাঁড়াল। নিজেকে সংযত করে বলতে লাগল, "প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বরকে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন নি। তারপর ধন্যবাদ জানাই আপনাকে সাইমনাইডিস, আপনার প্রভুভক্তি অন্য সকলের নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করে মানব-চরিত্রকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আপনি বলেছেন, 'আমি করতে পারি না এমন কোন কাজ নেই।' তাই হবে। আপনি সাক্ষী থাকুন শেখ ইল্‌ডেরিম। আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনবেন—মনে রাখবেন। আর এস্তার, তুমিও শোন।"

পাতার বাণ্ডিলসহ হাতটা সাইমনাইডিস-এর দিকে বাড়িয়ে সে বলল, "এই কাগজপত্রে যত কিছু হিসাব লেখা আছে—জাহাজ, বাড়িঘর, মালপত্র, উট, ঘোড়া, নগদ অর্থ—সব কিছু আমি আপনাকেই ফিরিয়ে দিলাম সাইমনাইডিস; আজ থেকে এ সব কিছুরই মালিক আপনি।"

এস্তারের চোখের জলে হাসির ঝিলিক। ইল্‌ডেরিম দ্রুত দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল; তার চোখে অশ্রুর বিন্দু চিকচিক করছে। সাইমনাইডিস শান্ত, গম্ভীর।

"সব কিছুরই মালিক আপনি, কিন্তু একটি ব্যতিক্রম আছে, আছে একটি শর্ত।"

শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাসে কান পাতল।

"আমার বাবার এক শ' বিশ ট্যালেণ্ট আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন, এবং আমার যথাসর্বস্বের মতই আপনার যথাসর্বস্ব পণ করে আমার মা ও বোনকে খুঁজে বের করবার কাজে আপনি আমার সঙ্গে যোগ দেবেন।"

সাইমনাইডিস অভিভূত হয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে বলল, "জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরেও যেমন আপনার বাবার সেবা করেছি, আপনার বেলায়ও তার অন্যথা ঘটবে না; কিন্তু যে ব্যতিক্রমের কথা আপনি বলছেন সেটা টিকবে না।"

আর একটা পাতা হাতে নিয়ে সে বলল, "সব হিসাব আপনি এখনও দেখেন নি। এটা নিয়ে পড়ুন—জোরে পড়ুন।"

বেন-হুর পাতাটা নিয়ে পড়তে লাগল।

"সম্পত্তির নায়েব সাইমনাইডিস কর্তৃক প্রস্তুত হুর-পরিবারের ভৃত্য-তালিকা।

১। মিশরদেশিনী আমরাহ্, জেরুজালেমের প্রাসাদ-রক্ষিণী।

২। সাইমনাইডিস, এণ্টিয়ক-এর নায়েব।

৩। এস্তার, সাইমনাইডিস-এর কন্যা।"

কি যেন ভেবে নিয়ে বেন-হুর বলল, "ছ'শ' ট্যালেণ্টের যে মালিক সে অবশ্যই ধনী, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে; কিন্তু যে মন সে অর্থ জমিয়েছে এবং তারপরেও অকলংক রয়েছে তার পরিমাপ তো অর্থে হয় না, সম্পত্তিতে হয় না। হে সাইমনাইডিস, ওগো সুন্দরী এস্তার, কোন ভয় নেই; শেখ ইণ্ডেরিম সাক্ষী, যে মুহূর্তে ঘোষিত হয়েছে যে আপনারা আমার ভৃত্য, সেই মুহূর্তে আমি ঘোষণা করছি আপনাদের মুক্তি। আর এই ঘোষণা আমি লিখিতভাবেই করব। তাই কি যথেষ্ট নয়?"

সাইমনাইডিস বলল, "হুর-পুত্র, দাসত্বের গুরুভারকে আপনি হাল্কা করেছেন। কিন্তু একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। এমন কিছু কাজ আছে যা আপনিও করতে পারেন না, যেমন আপনি পারেন না আইনত আমাদের মুক্তি দিতে। আমি আপনাদের চিরজীবনের দাস, কারণ আপনার বাবার সংগে একদিন আমি এ বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম, আর আমার কানে তুরপুণের দাগ এখনও আছে।"

"ওটাও কি আবার বাবা করেছিলেন?"

সাইমনাইডিস সংগে সংগে বলে উঠল, "তাঁর কাজের বিচার করবেন না। আমার প্রার্থনা মতই তিনি আমাকে এ ধরনের দাস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য আমার মনে কোন অনুতাপ নেই। আমার এই মেয়েটির জননী রাচেল-এর জন্যই এ মূল্য আমি স্বেচ্ছায় দিয়েছিলাম, কারণ তার সমপর্যায়ভুক্ত না হলে রাচেল কিছুতেই আমার স্ত্রী হত না।"

"তিনি কি ছিলেন চিরজীবনের দাসী?"

"ঠিক তাই।"

ব্যর্থ বাসনার বেদনায় বেন-হুর ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তারপর হঠাৎ থেমে বলল, "সাইমনাইডিস, আপনি আমাকে সৎ পরামর্শ দিন। সত্যকে দেখতে ও সৎ কাজ করতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আইনের চোখে আমার কাছে আপনি যা, বাস্তবে ও কাজে আপনার কাছেও আমি তাই হব। চিরদিন আপনার দাস হয়ে থাকব।"

সাইমনাইডিস-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বলল, "আমার স্বর্গত প্রভুর প্রিয় পুত্র, আপনার জন্য আমি সব করব, সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার সেবা করব। শুধু আমি যা আছি সেটাই আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করুন।"

"বলুন।"

"নায়েব হিসাবে সব সম্পত্তির দায় আমার উপরেই ন্যস্ত থাকবে।"

"তাই হবে। লিখে দিতে হবে কি ?"

"আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। আপনার বাবার বেলায় তাই ছিল; তাই ছেলের কাছ থেকে তার বেশী আমি চাই না।" তারপর মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "এস্তার, রাচেল-এর মেয়ে, এবার তোমার কথা বল।"

এস্তারের মুখ লজ্জার রাঙা হয়ে উঠল। বেন-হুরের কাছে গিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, "আমার মায়ের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আজ মা নেই; আমাকে আমার বাবার কাছে থাকতে দিন মনিব "

বেন-হুর হাতখানি ধরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, "মিষ্টি মেয়েটি, তোমার যেমন ইচ্ছা তাই হবে।"

সাইমনাইডিস মুখ তুলে তাকাল। শান্তভাবে বলল, "এস্তার, রাত অনেক হল। হাতে অনেক কাজ। কাজেই খাবার আনতে বল।"

এস্তার ঘণ্টা বাজাল। আহার্য ও পানীয় নিয়ে এল ভৃত্য। এস্তার পরিবেশন করতে লাগল।

প্রতিযোগিতার আগের দিন বিকেল। বেন-হুর ও ইল্ডেরিম ঘোড়ায় চড়ে তাল-বাগান থেকে শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে মালুচ-এর সঙ্গে দেখা হল।

মালুচ বলল, "অরিয়াস-পুত্র, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। মেসালার মুখোমুখি হবার পথে আর কোন বাধা নেই। সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। সম্পাদক নিজে আমাকে বলেছেন।"

"ধন্যবাদ মালুচ", বেন-হুর বলল।

মালুচ আবার বলল, "আপনার নিশান সাদা, মেসালার লাল- সোনালি মেশানো। তার ফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। ছোকরারা পথে পথে সাদা ফিতে ফেরি করে বেড়াচ্ছে; কাল শহরের প্রতিটি আরব ও ইহুদী সে ফিতে জামায় পড়বে। সার্কাসে দেখতে পাবেন, গ্যালারিতে সাদা ও লাল সমান-সমান।"

"গ্যালারিতে বটে, কিন্তু পোর্টা পম্পি-র উপরকার আসনে নয়।"

"না; সেখানে লাল ও সোনালিরই প্রাধান্য থাকবে। কিন্তু আমরা যদি জিততে পারি, তাহলে হোমরা-চোমরারা না জানি কি কাঁপাই কাঁপতে থাকবে!"

মহাখুসি হয়ে মালুচ অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

"আরে, এটা কি ?"

ইল্ডেরিম আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। তার হাতে একটা বিজ্ঞপ্তি।

"পড়ুন," বেন-হুর বলল।

"না ; তুমি পড় ।"

বেন-হুর পড়তে লাগল। প্রতিযোগিতার কার্য-সূচীর বিস্তারিত বিবরণ। লেখাগুলির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে বেন-হুর শেষের দিকে গিয়ে থামল। সেখানে লেখা আছে প্রতিযোগীদের পরিচয় ও বিবরণ। মোট ছ'জন প্রতিযোগী। ১। করিন্থিয়ার লিসিপ্পাস—হলুদ নিশান ; ২। রোমের মেসালা—লাল-সোনালি নিশান ; ৩। এথেন্সের ক্লিওথেস—সবুজ নিশান ; ৪। বাইজেন্টিয়ামের ডিসিয়ুস—কালো নিশান ; ৫। সিডোনিয়ার অ্যাড্‌মিটাস—নীল নিশান ; ৬। মরুভূমির শেখ ইল্ডেরিম-এর ঘোড়া, চালক ইহুদী বেন-হুর—সাদা নিশান।

চালক ইহুদী বেন-হুর !

আরিয়াস-এর বদলে এ নাম কেন ?

বেন-হুর ইল্ডেরিম-এর দিকে তাকাল। দু'জনের একই ধারনা—এর পিছনে আছে মেসালার হাত !

এন্টিয়ক-এর সার্কাস নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

মধ্যরাত্রে সবগুলি প্রবেশ-পথ খুলে দেওয়া হল। বাইরে সমবেত বিপুল জনতা প্রচণ্ড বেগে ভিতরে ঢুকে যে যেখানে পারল স্থান করে নিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্প বা বর্শাধারী সেনাদল ছাড়া কার সাধ্য তাদের সেখান থেকে হটায়। সারাটা রাত তারা বেঞ্চিতে বসে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কাটাল ; সেখানেই প্রাতরাশ সারল ; খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক পাও নড়ল না।

যাদের আসন সংরক্ষিত ছিল সেই সব উঁচু দরের লোকেরা সকালের দিকে একে একে এসে হাজির হল। অনেকের সঙ্গেই এল উর্দিপরা অনুচর ও চাকর। দিনের দ্বিতীয় ঘণ্টার মধ্যেই সংখ্যাতীত মানুষের দল জলস্রোতের মত সেখানে ধেয়ে এল। সার্কাস লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

পূবদিকে পোর্টা পম্পি ফটকে বাজনা বেজে উঠল। ফটক দিয়ে প্রবেশ করল শোভাযাত্রা। সম্পাদক ও নগর-কর্তৃপক্ষ, পুরস্কারদাতাগণ, মানুষের মাথায় অথবা চার চাকার সুসজ্জিত গাড়িতে দেবতাবৃন্দ, তারপর প্রতিযোগীর দল—দৌড়, কুস্তি, লাফ, মুষ্টিযুদ্ধ, বা রথ-চালনা অনুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পোষাক।

চার ঘোড়ার রথগুলি যখন একের পর এক চক্রাকারে পরিক্রমা করতে লাগল তখন জনতার সে কী উল্লাস-ধ্বনি। যেন একসঙ্গে সহস্র মেঘের গর্জন।

"মেসালা ! মেসালা !"

"বেন-হুর ! বেন-হুর !"

বেলা তিনটে নাগাদ অন্য সব খেলা শেষ হয়ে শুরু হল রথের দৌড়। প্রতি রথের চারটি ঘোড়া বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে লাগল।

এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়। শুরু হল ছ'পাক। গতি বাড়তে লাগল। প্রতিযোগীদের বুকের রক্ত ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে। মানুষ ও পশু—সকলেই বুঝতে পারছ জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত লগ্ন ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

প্রতিযোগী মোট ছ'জন। কিন্তু সমবেত জনতার দৃষ্টি দুজনের উপর সীমাবন্ধ, একজন রোমক, একজন ইহুদী। দর্শকরা তাদের উপর বাজি ধরছে—এক ট্যালেন্ট, পাঁচ ট্যালেন্ট, দশ ট্যালেন্ট।

সকলের আগে ছুটে চলেছে দুজন—মেসালা আগে, তার ঠিক পিছনে বেন-হুর। ঠিক সেই মুহূর্তে মেসালা যেই বাঁকটা ঘুরছে অমনি বেন-হুর পাশ কাটিয়ে সোজা তার পাশে গিয়ে হাজির হল। মেসালার রথের বাইরের চাকার ঠিক পাশে বেন-হুরের রথের ভিতরের চাকাটা পেঁছে গেল। সকলেই সেটা দেখতে পেল। তারপরই একটা প্রচণ্ড শব্দ। সারা সার্কাস যেন কেঁপে উঠল। রোমক রথটা পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। চক্রদণ্ডটা বার বার মাটিতে আছড়ে পড়ল। রথটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। হাতের লাগামে জড়িয়ে গিয়ে মেসালার দেহটা সজোরে মাটিতে ছিটকে পড়ল।

বেন-হুর লক্ষ্যে পেঁছে গেল।

তারই জয় হয়েছে।

কন্সাল উঠে দাঁড়াল। জনতা চীৎকারে ফেটে পড়ছে। সম্পাদক আসন থেকে নেমে এসে বিজয়ীকে মুকুট পরিয়ে দিল।

নদীর ওপারে অপেক্ষা করছে বেন-হুর ও ইল্ডেরিম। প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাওয়ায় শেখের দলবল শিবির তুলে অনেক আগেই যাত্রা করেছে মরুভূমির উদ্দেশে। মাঝ রাতে তারাও যাত্রা শুরু করবে।

শেখ মহাখুসি। নানা রাজকীয় উপহার দিতে সে আগ্রহী, কিন্তু বেন-হুর কিছুই নিতে রাজী নয়; শত্রুকে যে পর্যুদস্ত করতে পেরেছে তাতেই সে খুসি।

দুজনের কথাবার্তার মাঝখানেই দু'জন বার্তাবহ এসে হাজির হল—একজন মালুচ, অপরজন অপরিচিত।

মালুচ বলল, "মনিব সাইমনাইডিস আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।"

"এথেনীয় রথ-চালকের অবস্থা কেমন?" বেন-হুর জিজ্ঞাসা করল।

"এথেনীয় যুবক ক্লিন্থেস মারা গেছে। তার রথটাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।"

"মারা গেছে!" বেন-হুর আর্তনাদ করে উঠল। "আর মেসালা?"

শেখ বলল, "রোমকদের কপাল ভাল। সে নিশ্চয় বেঁচে গেছে। কি বল?"

"তা ঠিক শেখ সাহেব, জীবনে বেঁচে গেছে; তবে সারা জীবন তাকে অপরের বোঝা হয়ে থাকতে হবে। ডাক্তার বলেছে, সে বেঁচে যাবে, তবে আর কখনও হাঁটতে পারবে না।"

বেন-হুর নীরবে আকাশের দিকে তাকাল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা ছবি: সাইমনাইডিস-এর মত চেয়ার-সর্বস্ব হয়ে বেঁচে আছে মেসালা; তার মতই চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে চলাফেরা করছে। ভাল মানুষ বৃদ্ধ এ কষ্ট নীরবে সহ্য করছে, কিন্তু ঐ উদ্ধত গর্বিত যুবক কি তা পারবে?

হাত ঘসতে ঘসতে ইল্ডেরিম বলল, "এবার আমাদের যাত্রা করতে হবে। সাইমনাইডিস বাণিজ্য ভালই চালাবেন। আমাদের সুদিন আসন্ন। ঘোড়া আনতে বলি।"

মালুচ বলল, "একটু অপেক্ষা করুন। আমার সংগী আপনার সংগে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"কী আশ্চর্য! ওর কথা যে ভুলেই গিয়েছিলাম।"

সংগী ছেলেটি এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে নীচু হয়ে বলল, "শেখ সাহেবের সুপরিচিত বাল্‌থাজারের কন্যা আইরাস অনুরোধ জানিয়েছেন, তিনি যেন যুবক বেন-হুরকে জানিয়ে দেন যে তার পিতা বাল্‌থাজার আপাতত ইডার্নী-র প্রাসাদে বাস করছেন আর আগামীকাল চতুর্থ ঘণ্টার পরে তিনি সেখানেই যুবক বেন-হুরের সংগে মিলিত হতে চান।"

শেখ বেন-হুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি করবে?"

"আপনার অনুমতি হলে মিশর-কুমারীর সংগে আমি দেখা করব।"

ইল্ডেরিম হেসে বলল, "যৌবনের জয়যাত্রা অব্যাহত হোক।"

বেন-হুর বলল, "যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন তাকে বলো, আমি বেন-হুর আগামীকাল দুপুরে তার সংগে ইডার্নীর প্রাসাদে দেখা করব।"

বার্তাবহ চলে গেল। মাঝরাতে ইল্ডেরিমও যাত্রা করল। বেন-হুরের জন্য একটা ঘোড়া ও একজন পথ-প্রদর্শক রেখে গেল।

পরদিন একটু বেলা হতেই বেন-হুর বেরিয়ে পড়ল ইডার্নী প্রাসাদের উদ্দেশে। সুন্দরী মিশর-কুমারীর সংগে দেখা করতে হবে।

ইডার্নী প্রাসাদের দীর্ঘ বারান্দা পার হয়ে সে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সংগে সংগে অবাক কাণ্ড। কোন শব্দ হল না, খুট করে চাবি ঘুরল না, হাত বা পায়ের শব্দ কানে এল না, নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। আর রূপকথার রাজপুরীর মত অপরূপ সাজে সজ্জিত রোমক বাস-ভবনের একটি বহিঃপ্রকোষ্ঠ দেখা দিল তার সামনে।

সুন্দরী দর্শনের আশায় খুসিমনে বেন-হুর ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। যত দেখে ততই মোহিত হয়। দু'বার, তিন বার সে ঘুরে বেড়াল। তবু কারও দেখা নেই। প্রাসাদ যেন কবরের মত স্তব্ধ।

সহসা একটা আশংকা তার বুকের মধ্যে শির শির করে উঠল। এ কি কোন ষড়যন্ত্র? কার? মেসালার?

ঘরটির ডাইনে ও বাঁয়ে অনেকগুলি দরজা। কিন্তু সব বন্ধ। ধাক্কা দিল। কোন দরজা এতটুকু কাঁপল না।

তবে কি সে বন্দী? কিন্তু কেন? কে বন্দী করল?

আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। বেন-হুর ধৈর্য না হারিয়ে ঘরের এক কোণে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটা পায়ের শব্দে সে চমকে উঠল। সে কি এল! পায়ের শব্দ ভারী ও কর্কশ। নিঃশব্দে এগিয়ে সে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়াল।

দুজন আগন্তুক ঘরে ঢুকল। দুজনই দীর্ঘকায়, খাটো পোষাক পরা; একজন অত্যন্ত দৃঢ় দেহী। বেন-হুর তাকে চিনতে পারল। তার নাম নর্থম্যান; সার্কাসের খেলায় মুষ্টি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সে মুকুট লাভ করেছিল। বহু যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত মুখে হিংস্র প্রকৃতি সুপরিস্ফুট। তার ব্যায়াম-পুষ্ঠ দেহ ও হার্কিউলিস-এর মত চওড়া কাঁধ দেখে বেন-হুরের শিরায় শিরায় রক্ত বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে এল। দুই ভাড়াটে গুণ্ডা যে তাকেই খুন করতে এসেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নর্থম্যান-এর সংগীটি যুবক, কৃষ্ণকায়, মাথার চুল কালো, দেখতে সম্পূর্ণ ইহুদীর মত। দুজনেরই পরণে মুষ্টিযোদ্ধার স্বল্পবাস। কোন সন্দেহ নেই যে ষড়যন্ত্রের জাল পেতে তাকে ধরা হয়েছে। সাহায্যের কোন আশা নেই। এই নির্জন প্রকোষ্ঠে তাকে আজ মরতে হবে।

কোমরের বহিরাবরণ খুলে সে মাথার ঢাকনা ও সাদা আলখাল্লাও খুলে ফেলল। একটিমাত্র তলবাস পরিহিত অবস্থায় তখন তাকে দুই শত্রুর মতই দেখাচ্ছে। দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে সে একটা থামে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ল।

তারা এগিয়ে আসতেই সে বলে উঠল; "দাঁড়াও। একটা কথা।"

তারা থামল। "একটা কথা! বেশ, বল।"

"তোমরা আমাকে খুন করতে এসেছ।"

"ঠিক কথা।"

"তাহলে তোমার সংগী একাকী আমার সংগে লড়ুক। দেখ, কেমন করে আমি তাকে ঠাণ্ডা করি।"

তাই স্থির হল। দুজন লড়ে গেল। তারা যখন পরস্পরকে জাড়িয়ে ধরল, তখন তাদের আলাদা করে চেনা মুস্কিল হল। যেন দুই ভাই।

দেখতে না দেখতে বেন-হুর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে সজোরে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল। ভাড়াটে গুণ্ডা ছিটকে পড়ে গেল। একটা আর্তনাদও উচ্চারণ করতে পারল না। তার দেহ স্তব্ধ হয়ে গেল।

বেন-হুর থর্ড নর্থম্যান-এর দিকে তাকাল।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সে তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে। বলল, "এটা তো আমার প্যাঁচ। রোমের আখড়ায় দশটি বছর এ প্যাঁচ আমি শিখেছি। তুমি তো ইহুদী নও। কে তুমি ?"

"ডিউয়াম্‌ভির অরিয়াসকে চেন ?"

"কুইন্টাস অরিয়াস ? বিলক্ষণ, তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"

"তার একটি ছেলে ছিল।"

থর্ড বলল, "ছিল। তাকে আমি চিনতাম। সে গ্ল্যাডিয়েটরদের রাজা হতে পারত। স্বয়ং সীজার তার পৃষ্ঠপোষক হতে চেয়েছিলেন। এইমাত্র যে প্যাঁচ তুমি খেললে সেটাও আমি তাকে শিখিয়েছিলাম।"

"আমিই অরিয়াস-এর সেই ছেলে।"

এগিয়ে এসে থর্ড তাকে ভাল করে দেখল। তার পর হো-হো করে হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিল। "হা, হা, হা। তিনি আমাকে বলেছিলেন এখানে দেখতে পাব একটা ইহুদীকে—একটা ইহুদী কুত্তাকে—যাকে খুন করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।"

তার হাতটা ধরে বেন-হুর জিজ্ঞাসা করল, "কে বলেছে এ কথা ?"

"তিনি—মেসালা—হা, হা, হা!"

"কখন বলেছে ?"

"কালে রাতে।"

"আমি শুনেছিলাম সে আহত হয়েছে।"

"জীবনে তিনি আর কখনও উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে তিনি আমাকে হুকুম করেছিলেন।"

বেন-হুরের মনে একটা আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলল, "থর্ড, আমাকে খুন করার জন্য মেসালা তোমাকে কি দিত ?"

"এক হাজার 'সেস্তেরতাই'।"

"এখনও তুমি তাই পাবে; আমি যা বলি তাই কর, ওর সঙ্গে আরও তিন হাজার যোগ করে দেব।"

অতিরিক্ত চার হাজারে রফা হল। বেন-হুর বলল, "অথচ যে কাজের জন্য তোমাকে টাকাটা দেব তাতে তোমার হাতে রক্তের দাগটি পর্যন্ত লাগবে না। এবার বল তো, তোমার এই বন্ধুটি কি দেখতে আমার মত নয় ?"

"আমার তো মনে হচ্ছে যেন একই গাছের দুটি আপেল।"

"আচ্ছা, আমি যদি এই পোষাকেই থাকি, আর ওকে পরিয়ে দিই আমার পোষাক, এবং তারপরে ওকে এখানে রেখে আমরা দু'জন চলে যাই, তাহলে আমি খুন হয়েছি এ-কথা বলে তুমি কি মেসালার কাছ থেকেও তোমার প্রাপ্য 'সেস্তেরতাই' হাতিয়ে নিতে পারবে না ?"

থর্ড হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল।

"হা, হা, হা। এত সহজে কেউ কখনও পাঁচ হাজার 'সেস্তেরতাই' উপায় করেছে! গ্রেট সার্কাস-এর পাশে একটা মদের দোকান খুলে দেব!—রক্ত নয়, শুধু একটা মিথ্যা কথা বললেই হল! অরিয়াস-পুত্র, চলে চল। যদি কখনও রোমে আস, নর্থম্যান থর্ড-এর মদের দোকানে আসতে ভুলে যেয়ো না। ইরমিন-এর দাঁড়ির দিব্য, সীজারের কাছ থেকে ধার করে আনতে হলেও সব সেরা মদই তোমাকে দেব!"

তারা কর-মর্দন করল। বেন-হুর মৃত মুষ্টিযোদ্ধাকে তার পোষাক পরিয়ে সেখানে ফেলে রাখল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে দু'জন দুদিকে চলে গেল।

সেদিন রাতে সাইমনাইডিস-এর বাসভবনে গিয়ে বেন-হুর ইডার্নী প্রাসাদের সব ঘটনা তাকে খুলে বলল। সব শুনে বৃদ্ধ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। এ রহস্য যদি ধরা না পড়ে, তাহলে মেসালা ও গ্র্যাটাস আপনার মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসংশয় হবে, আর আপনিও নিশ্চিন্ত মনে জেরুজালেমে ফিরে গিয়ে হারানো প্রিয়জনদের খোঁজ করতে পারবেন।"

বিদায়ের সময় সাইমনাইডিস ছাদের উপর তার চেয়ারে বসে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। এস্তার বেন-হুরকে এগিয়ে দিতে সিঁড়ি পর্যন্ত গেল।

"এস্তার, মাকে যদি খুঁজে পাই, তাহলে তোমাকেও জেরুজালেমে নিয়ে যাব; সেখানে তুমি টির্জার বোন হয়ে থাকবে।"

এই কথা বলে সে এস্তারকে চুম্বন করল। তারপর নদী পেরিয়ে ইল্ডেরিম-এর পরিত্যক্ত আস্তানায় গিয়ে শেখের দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হল।

সেই রাতেই ভাড়াটে গুণ্ডার দেহটা কবর দেওয়া হল এবং মেসালার নির্দেশক্রমে একজন বার্তাবহ ছুটে গেল গ্র্যাটাস-এর কাছে—বেন-হুরের নিশ্চিত মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে।

আর অচিরেই সার্কাস ম্যাক্সিমাস-এর কাছে একটা মদের দোকান খুলে তাতে সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হল : নর্থম্যান থর্ড।

॥ ষষ্ঠ পর্ব ॥

যে রাতে শেখ ইল্ডেরিম-এর সঙ্গে মরুভূমিতে যাবার উদ্দেশ্যে বেন-হুর এণ্টিয়ক ত্যাগ করেছিল তার ত্রিশ দিন পরে আবার এই কাহিনীর যবনিকা উঠল।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে—ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পণ্টিয়াস পাইলেট। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই পরিবর্তন সাধন করতে সম্রাটের দক্ষিণহস্তস্বরূপ সেজানুস-এর হাতে পাঁচ ট্যালেণ্ট রোমক মুদ্রা তুলে দিয়েছিল সাইমানাইডিস; উদ্দেশ্য ছিল, বেন-হুর যাতে নির্বিঘ্নে জেরুজালেম-এ গিয়ে তার প্রিয়জনের অনুসন্ধান চালাতে পারে।

খুব খারাপ লোকও অনেক সময় কিছু ভাল কাজ করে থাকে। পাইলেটও করল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই সে হুকুম দিল, জুডিয়ার সব কারাগার পরিদর্শন করতে হবে এবং বন্দীদের অপরাধ উল্লেখ করে তাদের একটি পূর্ণ তালিকা পাঠাতে হবে। ফল হল বিস্ময়কর। কোন রকম অভিযোগ না থাকায় শত শত লোককে মুক্তি দেওয়া হল; এমন অনেক লোকের সন্ধান পাওয়া গেল যাদের অনেক কাল আগেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল; আর সব চাইতে অবাক কাণ্ড, এমন সব ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষের খোঁজ পাওয়া গেল যাদের কথা জনসাধারণ তো জানতই না, এমন কি কারা-কর্তৃপক্ষও বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। জেরুজালেম-এর তেমনই একটি ভূগর্ভস্থ কারা-কক্ষ এবার আমাদের আলোচনার বিষয়।

একটা ভারী চাবির গোছা বাজাতে বাজাতে একটি লোক ট্রিবিউন-এর দরজায় এসে দাঁড়াল। ট্রিবিউন বলল, "ও হো জেসিয়াস, ভিতরে এস।"

ভিতরে ঢুকে জেসিয়াস বলল, "মহামান্য ট্রিবিউন, আট বছর আগে ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস আমাকে এই দুর্গের কারা-রক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন। কারা-কক্ষের সংখ্যা অনুযায়ী সংখ্যার ছাপ-মারা এই চাবির গোছা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এগুলো যেন কখনও হাতছাড়া না করি। তারপর একটা কাগজ টেবিলের উপর মেলে ধরে বললেন, 'এটা কারাকক্ষের মানচিত্র। এই যে ৫নং কক্ষটা দেখছ এখানে তিনটি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বন্দী আছে। রাষ্ট্রের পক্ষে তারা বিপজ্জনক। তাই তাদের অন্ধ ও বোবা করে দিয়ে এখানে আজীবন আটক রাখা হয়েছে। এক পাশের দেয়ালে চাকতি দিয়ে ঢাকা একটা গর্ত দেখতে পাবে। তার ভিতর দিয়ে এদের জন্য শুধু খাদ্য ও পানীয় পাঠাবে। বুঝতে পেরেছ? আর একটা কথা কখনও যেন ভুল না হয়। কোন অবস্থাতেই এই কক্ষের দরজা কখনও খুলবে না; কাউকে ঢুকতেও দেবে না, বের হতেও

দেবে না ; এমন কি তুমি নিজেও কখনও ঢুকবে না।' আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'যদি তারা মরে যায় ?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ঐ ঘরই হবে তাদের কবর। মরবার জন্যই তাদের ওখানে রাখা হয়েছে। ওই ঘরটা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত।' এই কথাগুলি বলে তিনি আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।"

তারপর জামার ভিতর থেকে একখানা জীর্ণ হলদেটে কাগজ বের করে সে আবার বলল, "এই সেই মানচিত্র, ঠিক যেমনটি গ্র্যাটাস আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা সঠিক মানচিত্র নয়। এতে দেখানো আছে পাঁচটি ঘর; কিন্তু আসলে ঘর আছে ছটি।"

"ছ'টি, বল কি ?"

"সব কথা শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। ৫নং ঘরের হতভাগ্য বন্দীরা এতদিন কি করে বেঁচে আছে দেখবার জন্য গতকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম। তালায় চাবি ঘুরল না। একটু ধাক্কা দিতে মরচে-ধরা কব্জা ভেঙে গিয়ে দরজাটা খুলে পড়ে গেল। ভিতরে ঢুকে দেখতে পেলাম, সেখানে আছে একটিমাত্র মানুষ—বৃদ্ধ, অন্ধ, জিহ্বাহীন, উলঙ্গ। মাথার চুল জটা হয়ে কোমর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। চামড়া কাগজের মত হলদে। দুটি হাত বাড়াতেই দেখলাম নখগুলো সব পাখির নখরের মত বেঁকে কুঁকড়ে গেছে। তার সঙ্গীরা কোথায় জানতে চাইলাম। সে মাথা নাড়তে লাগল। ঘরটা ভাল করে খুঁজলাম। মেঝে ও দেয়াল শুকনো। তিনজনের দুজন যদি মারা গিয়েও থাকে তাহলে তাদের হাড় তো থাকবে। বন্দীটি বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারল। সাগ্রহে আমার হাত ধরে দেয়ালের আর একটা গর্তের কাছে আমাকে নিয়ে গেল। গর্তের কাছে মুখটা রেখে জন্তুর মত চীৎকার করে উঠল। একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন ফিরে এল। অবাক হয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ডাকলাম, 'হেই, কে আছ !' কোন জবাব এল না। আবার ডাকলাম। কে যেন সাড়া দিল, 'ঈশ্বরের জয় হোক !' আরও আশ্চর্য ট্রিবিউন, সে কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের। প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কে ?' জবাব এল, 'ইস্রায়েলের এক নারী, কন্যাসহ এখানে কবরস্থ হয়ে আছি। শীঘ্র বাঁচাও, নইলে আমরা মরে যাব।' তাদের ধৈর্য ধরতে বলে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

ট্রিবিউন উঠে দাঁড়াল। বলল, "তুমি ঠিক বলেছ জেসিয়ুস। মানচিত্রটা ধোঁকা, তিনজন বন্দীর কাহিনীও তাই। দেখা যাচ্ছে, ভ্যালেরিয়াস গ্র্যাটাস অপেক্ষা ভাল মানুষও রোমে আছে।"

কারারক্ষী বলল, "হ্যাঁ। বন্দীর কাছ থেকেই জেনেছি, খাদ্য ও পানীয় সে যা পেত তার থেকেই নিয়মিত সে ঐ স্ত্রীলোক দুটিকে পাঠিয়ে দিত।"

ট্রিবিউন বলল, "আর দেরী নয়। স্ত্রীলোক দুটিকে উদ্ধার করতে হবে।" একজন করণিককে ডেকে বলল, "আমি সেখানে যাচ্ছি; কয়েকজন শ্রমিককে

যন্ত্রপাতিসহ পাঠিয়ে দাও। দেয়াল ভেঙে ফেলতে হবে। তাড়াতাড়ি কর।"

পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এই হতভাগিনীরা কারা; আর মনে মনে বলেছেন, "এতদিনে বেন-হুরের মা ও বোন টির্জার খোঁজ পাওয়া গেল!"

ঠিক তাই।

ট্রিবিউনের নির্দেশে ৫নং ঘরের পিছনের দেয়ালটা ভেঙে ফেলা হল। মশালের আলোয় দু'তিনটি লোকের সঙ্গে ভিতরে ঢুকল ট্রিবিউন। কিন্তু এগিয়ে যেতে পারল না। তাকে দেখেই স্ত্রীলোক দুটি আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল। এক কোণে লুকিয়ে পড়ে একজন বলে উঠল, "কাছে এস না—আমরা অচ্ছুৎ, অচ্ছুৎ!" মা ও মেয়ে দুজনই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।

ট্রিবিউন সভয়ে শিউরে উঠল। বলল, "ঠিক আছে। ওখান থেকেই বল তোমাদের নাম কি, তোমরা কারা, কে তোমাদের এখানে রেখেছে, আর কেনই বা রেখেছে।"

ট্রিবিউন সব কথা শুনল। একজন মশালধারীকে পাশে ডেকে এনে কথাগুলি হুবহু লিখে নিল। তাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় আনবার হুকুম দিল।

বৃদ্ধা বলল, "হে উদার রোমক, সেই সঙ্গে কিছু পোষাক ও পরিষ্কার জলের ব্যবস্থাও করে দিন।"

ট্রিবিউন বলল, "সব ব্যবস্থাই হবে। হয় তো আপনাদের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন। আজ রাতেই দুর্গের বাইরে নিয়ে আপনাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। বিদায়।"

মাঝ রাতে মা ও মেয়ে রাজপথে এসে দাঁড়াল। তারকাখচিত আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। নিজের মনেই প্রশ্ন করল, "এর পরে কি? কোথায় যাব?"

এদিকে বেন-হুর যখন শহরে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তার ইচ্ছা ছিল রাতটা কোন খান-এ কাটিয়ে দেবে। কিন্তু কেন কে জানে নিজের বাড়ির দিকে পা না চালিয়ে সে থাকতে পারল না।

পুরনো বাড়ির উত্তর ফটকের সামনে এসে সে দাঁড়াল। ফটক সিল করবার মোমের দাগ এখনও সুস্পষ্ট। বিজ্ঞপ্তিটা এখনও টাঙানো রয়েছে:

এই সম্পত্তির মালিক
স্বয়ং সম্রাট

সাইমনাইডিস-এর কাছে সে শুনেছে, বুড়ি আমরাহ্ এই বাড়িতেই আছে। এতদিন পর্যন্ত সেই তাকে খাবার-দাবার পাঠিয়েছে। সে কি আগেকার মতই

দরজায় টোকা দেবে ? একটা পাথর তুলে নিয়ে তিনবার দরজার উপর ঠুকল। কোন সাড়া নেই। সেখান থেকে পশ্চিম ফটকে গেল। পশ্চিম থেকে দক্ষিণে। কোন সাড়াশব্দ নেই। বিফল মনোরথ হয়ে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দীর্ঘ পথ-ভ্রমনের ক্লান্তিতে বেন-হুর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই সময় এণ্টোনিয়া দুর্গের দিক থেকে দুটি স্ত্রীলোক ভীত, সতর্ক পদক্ষেপে হুরদের বাস-ভবনের দিকে এগিয়ে এল।

একজন বলল, "টির্জা, এই তো সেই বাড়ি!"

সেদিকে তাকিয়ে মায়ের হাত ধরে টির্জা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মা কাঁপা গলায় বলল, "এগিয়ে চল মা। সকাল হলেই ওরা আমাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দেবে, আর কোন দিন ঢুকতে দেবে না। আমরা যে কুষ্ঠ রোগী।"

মেয়ের হাত ধরে সে দ্রুত এগিয়ে চলল।

দক্ষিণ দিকটায় চাঁদের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে। হঠাৎ মা বলে উঠল, "চুপ! কে যেন সিঁড়িতে শুয়ে আছে। লোকটি ঘুমিয়ে আছে। চল, আমরা ঘুরে যাই।"

সেই মুহূর্তে লোকটি অস্থিরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখের উপর থেকে রুমালটা সরিয়ে নিল। তার দিকে তাকিয়ে মা চমকে উঠল। আবার তাকাল। দুই হাত এক করে নীরব প্রার্থনায় আকাশের দিকে তাকাল। তারপর টির্জার কানে কানে বলল, "ঈশ্বর আছেন—এই তো আমার ছেলে—তোমার ভাই!"

"আমার ভাই—জুডা?"

টির্জা হাঁটু ভেঙে বসে তাকে চুম্বন করতে উদ্যত হতেই মা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরল। ফিস্ ফিস্ করে বলল, "না, না, এ জন্মে নয়, এ জন্মে নয়। অচ্ছুৎ। আমরা অচ্ছুৎ!"

ভীতা হরিণীর মত মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে তারা রাস্তাটা পার হয়ে গেল। সেখানে দেয়ালের আড়ালে হাঁটু ভেঙে বসে দুজনে ছেলেটির দিকেই তাকিয়ে রইল। কিসের আশায় কে জানে।

একটু পরেই আর একটি স্ত্রীলোক বাড়িটার মোড় ঘুরে সেখানে হাজির হল। দেয়ালের আড়াল থেকে দুজনই তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। ছোটখাট চেহারা, সামনে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে, মাথা ভর্তি পাকা চুল, হাতে এক ঝুড়ি ফলমূল।

একটি লোককে সিঁড়িতে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েও হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘুমন্ত লোকটির মুখের উপর। মৃদু স্বরে কি যেন বলে বুড়ি ভাল করে চোখ মুছে নিয়ে আবার তাকাল। ধীরে ধীরে সেখানে

বসল। চারদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে মাথা নীচু করে তার হাতটা তুলে সাদরে চুমো খেল।

চমকে জেগে উঠে বেন-হুর হাতটা সরিয়ে নিয়েই বলে উঠল, "আমরাহ্ ! আমরাহ্ তুমি ?"

বুড়ি কোন কথা বলল না। তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। তার হাত ছাড়িয়ে অশ্রুসিক্ত মুখখানি ধরে বেন-হুর তাকে চুমো খেল। বলল, "মা—টির্জা—তাদের কথা বল আমরাহ্, তাদের কথা বল।"

আমরাহ্ শুধুই কাঁদতে লাগল।

টির্জা এগিয়ে যাচ্ছিল। তার হাত ধরে মা বলল, "যেয়ো না। অচ্ছুৎ, অচ্ছুৎ!"

মা ও মেয়ে দূর থেকে দেখল বেন-হুরের হাত ধরে আমরাহ্ বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। মা ও মেয়ে সেখানেই ধুলোয় গড়িয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে লোকজন তাদের দেখতে পেয়ে পাথর ছুঁড়ে শহর থেকে তাড়িয়ে দিল। "পালা, পালা! তোরা তো মরার সামিল; মরার দেশে চলে যা!"

সেই অভিশাপ কানে নিয়েই তারা পথে নামল।

হিব্রু-তে তিশ্রি, ইংরেজিতে অক্টোবর মাসের পয়লা তারিখ সকালে বেন-হুরের ঘুম ভাঙল একটি খান-এর শয্যায়। তার সারা মন বিরক্ত—তিক্ত। মালুচ-এর সহায়তায় ট্রিবিউনের কাছ থেকে দুটি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকের কথা সে শুনেছে। তার লিখিত জবাববন্দী থেকে সবই জেনেছে। কিন্তু আজ কোথায় তার মা ও বোন ? কি দশা তাদের হয়েছে ?

ক্রুদ্ধ, আশাহীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ মন নিয়ে সে খান-এর উঠোনে ঢুকল। আগের রাতে অনেক লোক সেখানে এসে জমায়েত হয়েছে। প্রাতরাশ খেতে খেতে সে তাদের কথা শুনতে লাগল। একটি দল বিশেষভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে দলের সকলেই যুবক, শক্ত-সমর্থ চেহারা, আচরণে ও কথাবার্তায় গেঁয়ো লোক। সে বুঝতে পারল, তারা সব গ্যালিলি থেকে এসেছে—প্রধানত আজকের বাদ্যোৎসবে যোগ দিতে। যে স্বপ্ন সে এতদিন ধরে দেখে এসেছে তাকে পূর্ণ করতে এদের মত লোককে কাজে লাগানো যায় কি না এই কথাই সে ভাবছিল, এমন সময় একটি লোক অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সেখানে ঢুকল।

"একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ তারা পেয়েছে। মন্দিরের টাকায় পাইলেট-এর নতুন পয় প্রণালী তৈরি হবে।"

"কী! দেবতার টাকায় ?"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একে অন্যকে প্রশ্নটা করতে লাগল।

"এ তো 'কোরবান'—দেবতার টাকা। এর একটা কপর্দকেও হাত দিয়ে দেখুন না!"

আগন্তুক চেঁচিয়ে বলল, "সকলে চল। পাইলেট-এর দর্শনাথীঁদের মিছিল এতক্ষণ সেতুর উপরে উঠে এসেছে। সারা শহর সেখানে ভেঙে পড়েছে। আমাদেরও দরকার হতে পারে। তাড়াতাড়ি চল।"

সকলে বলে উঠল, "আমরা তৈরি।"

বেন-হুর তাদের সামনে গিয়ে বলল, "গ্যালিলির মানুষরা, আমি জুডার পুত্র। আমাকে তোমাদের দলে নেবে?"

তারা বলল, "আমাদের যুদ্ধ করতে হতে পারে।"

"যদি হয়, আমি অন্তত সকলের আগে পালাব না!"

আগন্তুক জবাব শুনে খুসি হয়ে বলল, "ঠিক আছে, চলে এস।"

তারা যখন প্রিটোরিয়াম-এর ফটকে পেঁছিল ততক্ষণে প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ইহুদীদের মিছিলটা সদলে ভিতরে ঢুকে গেছে, কিন্তু বাইরে অপেক্ষা করে আছে তার চাইতেও অধিক সংখ্যক বিক্ষুব্ধ জনতা।

রক্ষীসহ একজন শত-নায়ক ফটক পাহারা দিচ্ছে। লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। বাইরে বেরিয়ে আসা একজনকে অপেক্ষমান জনতার একজন জিজ্ঞাসা করল, "ভিতরে কি হচ্ছে?"

সে জবাব দিল, "কিছু না। সম্ভ্রান্তজনরা প্রাসাদের দরজায় দাঁড়িয়ে পাইলেট-এর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। তিনি দেখা করবেন না। তারাও দেখা না করে ফিরবে না।"

ডান দিকে ঘুরে জনতা গভর্ণরের বাসভবনের নিকটবর্তী একটা বড় বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। উত্তেজিত মানুষে বাগানটা ভরে গেল।

এক ঘণ্টা কাটল। পাইলেট-এর দেখা নেই। প্রবীণ ও সম্ভ্রান্ত ইহুদীদের সঙ্গে জনতাও ঠায় দাঁড়িয়ে। দুপুর হল। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। শুধু জনসংখ্যা বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল তাদের ক্রোধ।

অবশেষে পরিণতি দেখা দিল। জনতার মাঝখান থেকে ভেসে এল আঘাতের শব্দ, যন্ত্রণা ও ক্রোধের আর্তনাদ; শুরু হল প্রচণ্ড হৈ-চৈ। ভিড়ের মধ্যে কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সকলের মুখে একই উত্তেজিত প্রশ্ন, কি হল?

বেন-হুর একজন গ্যালিলিবাসীকে জিজ্ঞাসা করল, "কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

"না।"

"আমি তোমাকে তুলে ধরছি।"

বেন-হুর লোকটির কোমর ধরে তাকে উঁচুতে তুলল। লোকটি বলল, "এবার দেখতে পাচ্ছি। মুগুর হাতে একদল লোক জনতাকে পিটছে। তাদের পরণে ইহুদীদের পোষাক।"

"তারা কারা?"

"নির্ঘাৎ রোমক—ইহুদীর ছদ্মবেশে এসেছে। তাদের মুগুর যেন বাতাসে ঘুরছে। ঐ যে, তারা একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধকে মারল। ওরা কাউকে রেহাই দিচ্ছে না!"

লোকটিকে নামিয়ে দিয়ে বেন-হুর জনতার দিকে তাকিয়ে, বলল, "এটা পাইলেট-এর ফন্দি। ঐ মুগুরধারীদের সমকক্ষ হতে আমি যা বলব তা তোমরা করতে রাজী আছ?"

সকলে সমস্বরে সম্মতি জানাল।

"ফটকের ওখানে অনেক গাছ আছে। সেখানে চল। গাছের ডালের অভাব হবে না।"

দেখতে দেখতে গাছের ভাঙা ডাল হাতে নিয়ে জনতা সশস্ত্র হয়ে উঠল। বেন-হুর হল তাদের দলনায়ক। শুরু হল পাল্টা আক্রমণ। রোমকরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। হতভম্ব হয়ে তারা রণে ভঙ্গ দিল। ক্রুদ্ধ জনতা তাদের পিছু নিতেই বেন-হুর বাধা দিল। হাঁক দিয়ে বলল, "বন্ধুগণ। থাম। ঐ দেখ শতনায়ক আসছে দলবল নিয়ে। তাদের হাতে আছে তলোয়ার, আছে ঢাল। তাদের সঙ্গে আমরা লড়তে পারব না। যা করবার তা করেছি। এবার ফিরে চল ফটকের বাইরে।"

বেন-হুরের নির্দেশমত জনতা পিছন ফিরতেই শতনায়ক তাদের লক্ষ্য করে গালাগালি দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল বেন হুর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলল, "আমরা যদি ইস্রায়েল-এর কুত্তা, তাহলে তোরাও রোমের শেয়াল। অপেক্ষা করে থাক, আমরা আবার আসব।"

গ্যালিলিবাসীরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে লাগল। বাইরের রক্ষীরা তাদের বাধা দিল না। কিন্তু তারা বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই ফটকের প্রধান রক্ষী সেই শতনায়ক এসে বেন-হুরের সামনে দাঁড়াল।

"উদ্ধত যুবক! তুমি রোমক না ইহুদী?"

"আমি জুডার পুত্র। এখানেই আমার জন্ম। কি চাই তোমার?"

"যুদ্ধ।"

"একক?"

"তোমার ইচ্ছা।"

বেন-হুর বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, 'আমি অস্ত্রহীন।"

শতনায়ক বলল, "আমার অস্ত্র তোমাকে দিচ্ছি। আমি রক্ষীর অস্ত্র ধার নেব।"

বেন-হুর বলল, "আমি প্রস্তুত। দাও তোমার তলোয়ার আর ঢাল।"

দু'জন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। ঢালের উপর দিয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল। শুরু হল সংঘাত। প্যাঁচের পর প্যাঁচ। শতনায়ক সশব্দে ধরাশায়ী হল। গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রথামত বিজিত শত্রুর পিঠে পা রেখে ঢালটাকে মাথার উপর ধরে বেন-হুর সমবেত সকলকে অভিবাদন জানাল।

ফটক থেকে একটি ক্ষুদে অফিসার এগিয়ে এলে সে বলল, "তোমার সহকর্মী সৈনিক মৃত্যু বরণ করেছে। তার দেহ রইল এখানে। শুধু তার তলোয়ার আর ঢালটা আমি নিয়ে গেলাম।"

যেতে যেতে গ্যালিলিবাসীদের উদ্দেশে বেন-হুর বলল, "ভাইসব, তোমাদের আচরণে আমি খুসি হয়েছি। এবার সকলে চলে যাও। সৈন্যরা আক্রমণ করতে পারে। আজ রাতে বেথানি-র খান-এ আমার সংগে দেখা করো। ইস্রায়েলের পক্ষে কল্যাণকর কিছু কথা তোমাদের বলব।"

"তুমি কে?" তারা জিজ্ঞাসা করল।

"জুডার সন্তান!"

সমবেত জনতা তাকে ভিড় করে দাঁড়াল।

"তোমরা বেথানিতে আসছ তো?"

"হ্যাঁ, আমরা যাব।"

"তাহলে এই তলোয়ার ও ঢাল সংগে নিয়ে যেয়ো, তাহলেই তোমাদের চিনতে পারব।"

ভিড় ঠেলে বেন-হুর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর এই ভাবেই গ্যালিলির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে যে রাজাধিরাজের আবির্ভাব আসন্ন তাঁর বৃহত্তর সেবার পথ সে তৈরি করে নিল।

॥ সপ্তম পর্ব ॥

নির্দিষ্ট সময়ে বেথানি-র খান-এ গ্যালিলিবাসীরা বেন-হুরের সংগে দেখা করল। বেন-হুর ও তাদের সংগে চলে গেল তাদের দেশে। যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তিও অর্জন করল। শীতকাল শেষ হবার আগেই তিনটি সেনাদল গড়ে তাদের রোমক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলল। সাইমনাইডিস সাহায্য করল অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়ে, আর ইল্ডেরিম সাহায্য করল সর্বক্ষণ সংগে

থেকে আর রসদ সরবরাহ করে। তবু তার সংগে গ্যালিলিবাসীদের সহজাত প্রতিভা যুক্ত না হলে সে হয় তো এত সব করে উঠতে পারত না।

একদিন সন্ধ্যায় কিছু গ্যালিলীয় সংগী নিয়ে বেন-হুর তার নতুন বাসস্থান গুহাটির সামনে বসে আছে এমন সময় একটি অশ্বারোহী আরব পত্রবাহক এসে তার হাতে একখানি চিঠি দিল। জেরুজালেম থেকে লেখা সেই চিঠিতে মালুচ লিখেছে :

একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। লোকে তার নাম বলে ইলিয়াস। দীর্ঘকাল তিনি নির্জন অরণ্যে কাটিয়েছেন। আমাদের চোখেও তিনি মহাপুরুষ। জর্ডন নদীর তীরে তিনি রাজার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আমি তাকে দেখেছি, তার কথা শুনেছি ; যার জন্য আপনি অপেক্ষা করছেন তিনিও তাঁরই অপেক্ষায় আছেন। স্বয়ং এসে দেখে বিচার করুন।"

বেন-হুরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বলল, "বন্ধুগণ, আমাদের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। রাজার ঘোষক এসেছেন, ঘোষণা করেছেন তাঁর আগমন-বার্তা। তোমরা প্রস্তুত হও। প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে সকলকে সমবেত হতে বল। আমি নিজে যাব রাজার খবর নিতে।"

গুহার ভিতর ঢুকে সে ইণ্ডেরিম ও সাইমনাইডিসকে চিঠি লিখে তার জেরুজালেম যাত্রার খবর জানিয়ে দিল। তারপর রাত হলে আকাশে যখন তারা ফুটল তখন তারই আলোয় একটিমাত্র আরব পথপ্রদর্শককে সংগে নিয়ে সে ঘোড়ায় চেপে বসল।

আগামী দিনের আশ্চর্য সব ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে বেন-হুর পথ চলছিল। এমন সময় সংগী আরবটি আর একদল যাত্রীর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, "যাত্রী নিয়ে একটা উট আসছে।"

বড় বড় পা ফেলে উটটা তাদের ধরে ফেলল। যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বেন-হুর তো অবাক। আরে, এ যে আইরাস! বিস্ময়ে ও জিজ্ঞাসায় তার উজ্জ্বল চোখ দুটি বুঝি জলে ভরে উঠেছে।

বালথাজার বলল, "ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক। বৃদ্ধ বয়সে আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে ; তবু মনে হচ্ছে মহামান্য ইণ্ডেরিম-এর শিবিরে যাকে দেখেছিলাম তুমিই সেই হুর-পুত্র।"

বেন-হুর অভিবাদন জানাল। এক সংগে বেশ কিছু পথ পার হয়ে পথ-শ্রমের ক্লান্তিবশত সকলেই পথিপার্শ্বস্থ একটি মরূদ্যানে আশ্রয় নিল।

বৃদ্ধ বালথাজার গম্ভীর গলায় বলল, "তোমার কাছে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ হুর-পুত্র। এ জায়গাটি বড়ই সুন্দর ; এর ঘাস, গাছপালা, ছায়া, ঝর্ণা—সবই যেন ঈশ্বরের করুণার প্রতীক। এস, আমাদের সংগে আহার্য গ্রহণ কর।"

"তার আগে আমি আপনার সেবা করতে চাই," এই কথা বলে বেন-হুর একটি পাত্রে ঝর্ণার জল ভরে বালথাজারের হাতে দিল। বৃদ্ধ সকৃতজ্ঞ চোখ তুলে তার দিকে তাকাল।

কথায় কথায় বালথাজার বলল, "আমি ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছি। ঘুমের মধ্যে বারে বারে একই স্বপ্ন দেখছি। একটি কণ্ঠস্বর—তার বেশী কিছু নয়—আমাকে বলে, 'ত্বরা কর—জাগো। যার জন্য এতকাল অপেক্ষা করে আছ তিনি এসেছেন।"

"আপনি কি তাঁর সম্পর্কে আর কিছু শোনেন নি?"

"স্বপ্নের বাণী ছাড়া আর তো কিছুই শুনি নি।"

বেন-হুর তার পোষাকের ভিতর থেকে মালুচ-এর চিঠিখানা বের করে দেখাল। সে চিঠি পড়ে বৃদ্ধ অশ্রুসিক্ত চোখে কম্পিত গলায় বলে উঠল, "হে ঈশ্বর, ত্রাণকর্তাকে দেখবার, তাঁকে পূজা করবার সুযোগ আমাকে দাও; তাহলেই তোমার এই সেবক শান্তিতে মরতে পারবে।"

আবার যাত্রা শুরু হল। দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যা হল। আবার বিশ্রাম। তারায় ভরা আকাশের নীচে বসে বেন-হুর ও আইরাস-এর মধ্যে কত কথা হল। হৃদয়-বিনিময় হল। পরস্পরকে ভালবাসল।

যাত্রার তৃতীয় দিনে তাদের সঙ্গে দেখা হল জর্ডন-প্রত্যাগত একটি যাত্রীর সঙ্গে। বেন-হুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, "নদীতীরে কোথায় সকলে মিলিত হয়েছে?"

লোকটি বলল, "বেথাবারায়।"

বেন-হুর বলল, "আমি যতদূর জানি সে জায়গাটা তো ছিল জনশূন্য। হঠাৎ সেখানে এত লোক জড় হয়েছে কেন?"

"ওঃ, তাহলে আপনারাও বিদেশী! এখানকার খবর কিছুই রাখেন না।"

"কিসের খবর?"

"নির্জন প্রান্তর পেরিয়ে এসেছে একটি মানুষ—খুবই ভক্ত মানুষ—তার মুখে অদ্ভুত সব কথা—যে শোনে সেই মজে। নিজের পরিচয় বলে—জ্যাকারিয়াস-এর পুত্র নাজারেথ-এর জন; বলে—ত্রাণকর্তার বার্তাবহ সে।"

"কি কথা তিনি বলেন?"

"একেবারে নতুন কথা—এমন কথা ইস্রায়েল-এ আগে কেউ কখনও বলে নি। অনেকে তাকে প্রশ্ন করেছে, সে কি খৃস্ট? সে কি ইলিয়াস? উত্তরে সে শুধু একটি কথাই বলে, "আমি তার কণ্ঠস্বর যিনি পথে-প্রান্তরে কেঁদে কেঁদে বলছেন, প্রভুর পথকে সহজ করে তোল।"

লোকটি চলে গেল। বালথাজার বলল, "ত্বরা কর। আমি মোটেই পরিশ্রান্ত নই।"

রাতের বিশ্রামের পরে বৃদ্ধ আবার বলল, "হুর-পুত্র, ত্বরা কর। নইলে হয় তো পরিত্রাতা আসবেন, কিন্তু আমরা পেঁছিতে পারব না।"

উটের পিঠে চড়তে চড়তে আইরাস চুপি-চুপি বলল, "রাজা কখনও তার অগ্রদূতের চাইতে বেশী দূরে থাকতে পারেন না।"

তার হাতে চুমো খেয়ে বেন-হুর বলল, "কালই দেখা যাবে!"

পরদিন তৃতীয় প্রহরে পবিত্র নদীর পূর্বতীরবর্তী তৃণহীন প্রান্তরে তারা পেঁছে গেল। দূরে দেখা দিল জেরিকোর তাল-বন—জুডিয়ার পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত। বেন-হুরের রক্তস্রোত দ্রুততর হল। কারণ সে জানে, তারা পেঁছে গেছে। বলল, "সুখের খবর বাল্থাজার; আমরা প্রায় পেঁছে গেছি।"

উটের পদক্ষেপ দ্রুততর হল। অচিরেই দেখা দিল অনেক তাঁবু, লোকজন ও উটের দল; তারপর নদী ও নদী তীরে সমবেত প্রচুর জনতা। মহাপুরুষ বাণী প্রচার করছে বুঝতে পেরে তারা আরও দ্রুত এগোতে লাগল। প্রায় পেঁছে গেছে এমন সময় জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল; একে একে সকলে চলে যেতে লাগল।

তাদের পেঁছতে দেরী হয়ে গেছে!

বাল্থাজার তখন হতাশায় হাত মোচড়াচ্ছে। বেন-হুর বলল, "আমরা এখানেই অপেক্ষা করি; নাজারেথবাসী হয় তো এদিকেই আসবেন।"

লোকজন সব যা শুনেছে, যা দেখেছে তারই আলোচনায় ব্যস্ত; এই নবাগত কয়েকটি লোকের দিকে তারা নজরই দিল না। একে একে অনেক লোক চলে গেল। যাকে দেখতে আসা তার দেখা পাবার বুঝি কোন আশাই নেই। এমন সময় অনতিদূরে তারা আর একটি মানুষকে আসতে দেখল। তার অপূর্ব দেহকান্তি দেখে তিনজনের মন থেকেই আর সব কিছু চিন্তা দূর হয়ে গেল।

বাইরে থেকে দেখতে লোকটি রূঢ়, কদাকার, এমন কি অসভ্য। বাদামী কাগজের মত মুখের রং; রোদে-পোড়া এক ঢাল চুল ডাইনীদের মত জট পাকিয়ে ঘাড় বেয়ে পিঠের উপর নেমে এসেছে। চোখ দুটি জ্বল্-জ্বল্ করছে। শরীরের ডান দিকটা একেবারেই উলঙ্গ, মুখের মতই রং, তেমনই সরু; বেদুইনদের তাঁবুর মত মোটা উটের লোমের শার্টে শরীরের বাকি অংশটা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা; কাঁচা চামড়ার চওড়া পট্টি দিয়ে কোমরের কাছে জড়ানো। পা দুটি খালি। কাঁচা চামড়ারই একটা থলি কোমরের পট্টির সঙ্গে বাঁধা। হাতে একটা গাঁটওয়ালা লাঠি। সেটাতে ভর দিয়ে সে হাঁটে। তার চলন দ্রুত, পদক্ষেপ দৃঢ় ও সদাসতর্ক। একটু পরে পরেই চুলগুলিকে চোখের উপর থেকে সরিয়ে চারদিকে দৃষ্টি মেলে কাকে যেন খুঁজে ফিরছে।

মিশরকুমারী এই মরুভূমির সন্তানটিকে ভাল করে লক্ষ্য করে হাওদার পর্দা সরিয়ে বেন-হুরকে বলল, "এই কি তোমার রাজার বার্তাবহ ?"

মুখ না তুলেই বেন-হুর জবাব দিল, "ইনি নাজারেথবাসী।" আসলে সেও খুবই হতাশ হয়েছে।

ঠিক সেই সময় আর একটি লোক নদীর ধারে একটা পাথরের উপর বসেছিল। এবার সে উঠে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে উটটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রচারক ও নবাগত দুজনই এগোতে লাগল—একজন উটের থেকে বিশ গজ দূরে, অপরজন দশ ফুট দূরে। প্রচারক থামল ; চোখের উপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে নবাগতের দিকে তাকাল ; হাত তুলে সমবেত লোকদের ইঙ্গিত করল ; তারাও থেমে গেল ; তারপর চারদিক যখন শান্ত, স্তব্ধ হয়ে এল তখন নাজারেথবাসীর ডান হাতের লাঠিটা নবাগতকে লক্ষ্য করে নেমে এল।

আর সমবেত লোকজন যারা এতক্ষণ ছিল শ্রোতা, এবার দর্শকও হল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বালথাজার ও বেন-হুরও লোকটির দিকে তাকাল। দুজনের মনে জাগল একই ভাব। লোকটির উচ্চতা সাধারনের চাইতে একটু বেশী, গড়ন একহারা, এমন কি একটু কৃশই। পরণের পুরো হাত তলবাসের ঝুল গোড়ালি পর্যন্ত ; তার উপরে ইহুদীদের মত একটি বহির্বাস ; বাঁ হাতে মাথায় বাঁধবার জন্য একখানি রুমাল ; একটা লাল ফিতে পাশে ঝুলছে। লাল ফিতে ও বহির্বাসের নীচেকার সরু নীল পাড় ছাড়া সমস্ত পোষাকটাই হলুদ কাপড়ে তৈরি, রাস্তার ধুলো-কাদায় মলিন। পায়ের স্যাণ্ডেল অতি সাধারণ। কোন থলি, বা পেটি বা লাঠি নেই।

মেঘমুক্ত আলোয় মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ; শুধু কিছুটা ঢাকা পড়েছে ঈষৎ ঢেউ-খেলানো লম্বা চুলে। চুলের মাঝখানে সিঁথি ; পিঙ্গল বর্ণ চুলের যেখানে সূর্যের আলো সোজা হয়ে পড়েছে সেখানকার রং লাল-সোনালীতে মেশা। চওড়া নীচু কপালের নীচে কালো বাঁকা ভুরু ; বড় বড় দুটি গাঢ়-নীল উজ্জ্বল চোখ ; আঁখি-পক্ষগুলি বড় বড় হওয়ার দরুন সে চোখে এমন একটা মেদুর স্নিগ্ধতার আবেশ নেমেছে যা দেখা যায় শিশুদেরই চোখে, বয়স্ক মানুষের চোখে মেলে কদাচিৎ। চেহারার বাকিটা দেখে বোঝা শক্ত সে গ্রীক না ইহুদী।

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল—কাছে, আরও কাছে।

বর্শা হাতে অশ্বপৃষ্ঠে আসীন বেন-হুরের উপর তার দৃষ্টি পড়ল না ; পড়ল না সুন্দরী আইরাস-এর উপরে ; তার দৃষ্টি পড়ল বৃদ্ধ, অকর্মণ্য বালথাজারের উপর।

চারদিক নিস্তব্ধ—নিঃঝুম।

নাজারেথবাসী তখনও তার লাঠি উঁচিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবককে। পৃথিবীর সব পাপ তিনি হরণ করবেন।"

বাল্‌থাজার নতজানু হয়ে বসে পড়ল। আর পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। সেই হলুদ বসন নবাগতের দিকে লাঠিটা বাড়িয়ে নাজারেথবাসী আবার বলল, "আমি জানি, ইনিই ঈশ্বর-পুত্র।"

অশ্রুপূর্ণ চোখ তুলে বাল্‌থাজার কেঁদে বলল, "এই তো তিনি। এই তো তিনি।" পরক্ষণেই তার অচেতন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বেন-হুর তখনও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নবাগতের দিকে। এ কে? এ কি? এ কি ত্রাণকর্তা, না রাজা? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হল, "একে তো আমি আগেও দেখেছি; কিন্তু কোথায়? কবে?" মেঘমুক্ত রোদের মত হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, নাজারেথের কুয়োর ধারে রোমক রক্ষীরা যেদিন তাকে টানতে টানতে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাচ্ছিল, সেদিন এই লোকটিই তাকে সাহায্য করেছিল, জল দিয়ে বাঁচিয়েছিল। সে মুখ সে কোন দিন ভুলবে না। সেই মুহূর্তে আর সব কিছু সে ভুলে গেল। তার কানে বাজতে লাগল প্রচারকের শেষ কথাগুলি: "ইনি ঈশ্বর-পুত্র।"

উপকারীকে শ্রদ্ধা জানাতে বেন-হুর লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল। কিন্তু আইরাস-এর কণ্ঠস্বর তার কানে এল, "বাঁচাও হুর-পুত্র, নইলে আমার বাবা মারা যাবে!"

বেন-হুর থামল; পিছন ফিরে তাকাল; তারপর মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। আইরাস তাকে একটা পাত্র দিল। তাই নিয়ে সে জল আনতে ছুটল নদীতে। যখন ফিরে এল, নবাগত তখন চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত বাল্‌থাজারের জ্ঞান ফিরে এল। হাত দুটি টান-টান করে মৃদু কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "তিনি কোথায়?"

"কে?" আইরাস জিজ্ঞাসা করল।

ভাল মানুষটির মুখ আবেগে ঝলমলিয়ে উঠল। তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। বলল, "তিনি—ত্রাণকর্তা—ঈশ্বর-পুত্র। আবার তাকে আমি দেখলাম।"

মৃদু স্বরে আইরাস বেন-হুরকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমিও কি এ কথা বিশ্বাস কর?"

বেন-হুর বলল, "চারদিকেই এখন আশ্চর্য ঘটনার পালা। আরও অপেক্ষা করে দেখতে হবে।"

পরদিন তিনজনই যখন মন দিয়ে নাজারেথবাসীর কথা শুনছিল, তখন মাঝপথে কথা বন্ধ করে নাজারেথবাসী সসম্ভ্রমে বলে উঠল, "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষ শাবক!"

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বেন-হুর তাকিয়ে দেখল, গতকালের সেই নবাগত। পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করল, "ঐ যে হেঁটে আসছে লোকটি কে?

লোকটি ঠাট্টার সুরে হেসে জবাব দিল, "নাজারেথ-এর এক ছুতোরের ছেলে।"

॥ অষ্টম পর্ব ॥

বেথাবারাতে খৃষ্টের আবির্ভাব-ঘোষণার প্রায় তিন বছর পরের একুশে মার্চের কথা।

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। বেন-হুর চোখের সামনে তার বাবার বাসভবনের শূন্যতা ও ধ্বংস-স্তূপ সহ্য করতে পারে নি; তাই তার হয়ে মালুচ পন্টিয়াস পাইলেট-এর কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিয়েছে; সমস্ত বাড়িটার এমন আমূল সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে যার ফলে একটি পরিবারের শোচনীয় দুঃস্বপ্নের সব স্মৃতি তো মুছে গেছেই, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভবনটি আগের চাইতেও সুন্দর হয়েছে।

অবশ্য বেন-হুর এখনও প্রকাশ্যে এ বাড়ির মালিকানা গ্রহণ করে নি, বা তার নিজের নামও ঘোষণা করে নি। তার মতে, তার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নি। এখনও সে গ্যালিলিতে নিজের প্রস্তুতি নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে। এখনও সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে, রহস্যময় নাজারিন কবে আত্মপ্রকাশ করবে তারই প্রতীক্ষায়। শুধু মাঝে মাঝে অপরিচিত অতিথির মত এসে তার পিতৃভবনে কিছুদিন কাটিয়ে যায়, কারণ সেখানেই এখন বৃদ্ধ বালথাজার ও ও তার মেয়ে আইরাস বাস করে।

একদিন হুরদের পুরনো প্রাসাদের ছাদের উপরকার গ্রীষ্মবাসে বসে ছিল সাইমনাইডিস ও এস্তার। এমন সময় চাকর এসে একটা চিঠি দিল।

সাইমনাইডিস চিঠি ও তার সিলটা ভাল করে দেখে সিলটা ভেঙে চিঠিটা এস্তার-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "পড়।"

এস্তার পড়তে লাগল।

"নিসান, অষ্টম দিবস।

"গালিলি থেকে জেরুজালেম যাবার পথে।

"নাজারিনও এই পথেই চলেছেন। তাঁর অজ্ঞাতে একটি পুরো বাহিনী নিয়ে আমিও তাঁর সঙ্গেই চলেছি। আরও একটি বাহিনী পরে আসছে। ইহুদীদের উৎসব 'পাস-ওভার' উপলক্ষ্যে এই বিপুল জনসমাবেশে কেউ কিছু

মনে করবে না। যাত্রাকালে তিনি বলেছেন, 'আমরা জেরুজালেম যাব; আমার সম্পর্কে যা যা লেখা হয়েছে সবই ঘটবে।"

"আমাদের প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। এখন আর সময় নেই। আপনার শান্তি কামনা করি, সাইমনাইডিস।

বেন-হুর"

সাইমনাইডিস বলে উঠল, "অষ্টম দিবস, অষ্টম দিবস; আজ হল—"

এস্তার বলল, "নবম দিবস।"

"ওঃ, তাহলে এখন তারা হয় তো বেথানি-তে পৌঁচেছে।"

"আর সম্ভবত আজ রাতেই আমরা তাদের দেখতে পাব।"

"হয় তো, হয় তো; কালই তো উৎসব। এস্তার, কালই আমরা তাকে—তাদের দুজনকেই দেখতে পাব।"

ঘণ্টাখানেক পরে।

প্রাসাদের হল-ঘরে বালথাজার ও সাইমনাইডিস বসে কথা বলছিল। পাশে বসে ছিল এস্তার। এমন সময় আইরাসকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল বেন-হুর।

প্রথমেই সে অভিবাদন জানাল বালথাজারকে; তারপর সাইমনাইডিসকে বলল, "পিতৃহীনের কাছে আপনি পিতৃসম; প্রভুর করুণা আপনার মাথায় বর্ষিত হোক।"

কে একজন ঘরে ঢোকায় তার কথায় বাধা পড়ল। ঘরে তাকে দেখেই বেন-হুর দুই হাত বাড়িয়ে চীৎকার করে বলল, "আমরাহ্! আমার আদরের আমরাহ্।"

বৃদ্ধা এগিয়ে এল; বেন-হুরের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসল; দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাত দুটোতে বার বার চুমো খেতে লাগল; আর বেন-হুরও তার গালের উপর থেকে পাকা চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে চুমো খেয়ে বলল, "আমরাহ্, তাদের কোন খোঁজই কি তুমি জান না—একটি কথা—একটা কোন চিহ্ন—কিছু না?"

বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তা দেখেই বেন-হুর তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল। তার চোখেও জল এসে গেল।

একটু পরে কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বলল, "এস আমরাহ্; আমার পাশে বস—এখানে। বসবে না? বেশ, তাহলে পায়ের কাছেই বস। একটি আশ্চর্য মানুষের কথা এদের কাছে বলতেই আমি এসেছি।"

দুই বৃদ্ধকে অভিবাদন করে বেন-হুর বলতে শুরু করল:

"আগামীকাল নাজারিন এই শহরে প্রবেশ করবেন এবং মন্দিরে যাবেন, কারণ তাঁর কথামত ঐ মন্দিরই তার পিতৃভবন আর সেখানেই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর সঙ্গে আছে বারো জন অনুচর,—জেলে, চাষী, সরাইওয়ালা—

সকলেই নীচু শ্রেণীর মানুষ। সকলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আসছেন পায়ে হেঁটে ; ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম তার ভ্রূক্ষেপ নেই।"

আইরাস বলল, "গ্রীকরা হলে তাকে বলত দার্শনিক।"

বালথাজার বলল, "না গো মা, দার্শনিকরা কখনও এসব কাজ করতে পারত না।"

"এই লোকটিই যে পারে তা তুমি কেমন করে জানলে?"

বেন-হুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "আমি তাকে দেখেছি জলকে মদে পরিণত করতে।

"আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য" সাইমনাইডিস বলল।

বেন-হুর বলতে লাগল, "গ্যালিলিতে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম, তখন একটি কুষ্ঠরোগী নাজারিন-এর কাছে এসে বলল, 'প্রভু, তুমি তো ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করে তুলতে পার।' তার কান্না শুনে সে হাত দিয়ে সেই অচ্ছুৎকে স্পর্শ করে বলল, 'তুমি ভাল হয়ে যাও,' আর সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ, সুন্দর দেহের অধিকারী হল। এ ঘটনা তো আমরা অনেকেই দেখেছি।"

"সারা ইস্রায়েল-এ এ ধরনের কথা আগে কখনও শোনা যায় নি," সাইমনাইডিস নীচু গলায় বলল।

কথাগুলি শুনেই আমরাহ্ নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেন-হুর বলতে লাগল, "মনে রাখবেন, আরও অনেকের সঙ্গে আমিও নিজের চোখে যা দেখেছি তাই আপনাদের বলছি। বেথানি-তে ল্যাজারাস বলে একটি লোক বাস করত। মৃত্যুর পরে তাকে কবর দেওয়া হয়। একটা বড় পাথরের নীচে চার দিন কবরে থাকবার পরে নাজারিনকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। পাথরটাকে সরিয়ে দেখা গেল, লোকটি বিকৃতদেহে সেখানেই পড়ে আছে। আশেপাশে অনেক লোক দাঁড়িয়েছিল। নাজারিন-এর স্পষ্ট কথাগুলি সকলেই শুনতে পেল। সে বলল, 'ল্যাজারস, উঠে এস!' বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, যেন তাঁর ডাক শুনেই লোকটি শবাচ্ছাদনসহই উঠে এসে দাঁড়াল। নাজারিন বলল, 'ওকে মুক্ত করে দাও; ওকে যেতে দাও!' তার মুখ থেকে আবরণটা তুলে নেওয়া মাত্রই দেখা গেল, তার শীর্ণ শরীরে নতুন করে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে ; দেখতে দেখতে সে রোগাক্রান্ত হবার আগের মতই সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল। সে লোক আজও বেঁচে আছে। কালই গিয়ে আপনারা তাকে দেখে আসতে পারেন। এবার বলুন সাইমনাইডিস, এই নাজারিন কি মানুষের চেয়ে বড় নয়?"

এই গম্ভীর প্রশ্নটি সকলের সামনে রেখে বেন-হুর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেথানিতে ফিরে গেল।

পরদিন সকালে আম্‌রাহ্‌ একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে সকলের আগে শহরের ফটক পার হয়ে বাইরে চলে গেল। সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এন্‌রোগেল কুয়োর কাছেই একটা কবরের দিকেই সে চলেছে তার কর্ত্রী-ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করতে।

সেই সাত-সকালেই মহিলাটি বাইরে এসে বসেছিল ; আর ভিতরে টির্জা তখনও ঘুমুচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে আম্‌রাহ্‌ তার পায়ের উপর আছড়ে পড়ল। তার দীর্ঘ দিনের চাপা অনুরাগ সরব অশ্রুজলে ফেটে পড়ল। বার বার সে মহিলাটির জামায় চুমো খেতে লাগল। কোন নিষেধই মানল না।

মহিলাটি বলল, "এ কী করলি আম্‌রাহ্‌? এ রকম অবাধ্য হয়েই কি তুই আমাদের প্রতি ভালবাসা দেখাবি? দুষ্টু মেয়ে! তোর যে সর্বনাশ হয়ে গেল; আর তোর মনিব—তার কাছে তো আর কোন দিন ফিরে যেতে পারবি না।"

আম্‌রাহ্‌ উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, "দোহাই কর্ত্রী! আমি দুষ্টু নই। তোমার জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।"

"জুডার খবর কি?" কথা বলতে বলতে বিধবাটি মাথার কাপড় অর্ধেক তুলে ধরল।

আম্‌রাহ্‌ বলল, "একটি আশ্চর্য মানুষ এসেছে যে তোমাকে ভাল করে দিতে পারবে। তিনি একটি কথা বলেন, আর রোগী ভাল হয়ে যায় ; এমন কি মৃতও জীবন ফিরে পায়। আমি তোমাদের তার কাছে নিয়ে যাব।"

"বেচারি আম্‌রাহ্‌!" টির্জা বলল।

তার কণ্ঠস্বরে যে সন্দেহ ফুটে উঠেছিল তার প্রতিবাদে আম্‌রাহ্‌ বলল, "না, আমাদের প্রভু যেমন সত্যি, আমার এবং তোমাদের ঈশ্বর যেমন সত্যি, আমার কথাও ঠিক তেমনই সত্যি। আমার মিনতি, আর সময় নষ্ট করো না, আমার সঙ্গে চল। আজ সকালে তিনি এই পথ দিয়ে যাবেন। এই নাও খাবার—খেয়ে নাও, তারপর বেরিয়ে পড়।"

মা মনোযোগ দিয়ে সব শুনল। এই আশ্চর্য মানুষটির কথা তার কানেও পৌঁচেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "তিনি কে?"

"একজন নাজারিন।"

"কে তোকে বলেছে তার কথা?"

"জুডা।

"জুডা বলেছে? সে কি বাড়ি এসেছে?"

"কাল রাতে এসেছিল।"

বিধবার বুকখানা কাঁপতে লাগল। সে চুপ করে রইল। পরে জিজ্ঞাসা করল, "এ কথা বলতে কি জুডাই তোকে পাঠিয়েছে ?"

"না। তার ধারনা তোমরা মারা গেছ।"

মা চিন্তান্বিত ভাবে টির্জাকে বলল, "এক সময়ে এক মহাপুরুষ একজন কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করেছিলেন; কিন্তু তিনি তো সে শক্তি পেয়েছিলেন ঈশ্বরের কাছ থেকে।...আচ্ছা আমরাহ, এই লোকটির যে এ শক্তি আছে তা আমার ছেলে জানল কেমন করে ?"

"সেও যে তার সঙ্গেই এসেছে। প্রথমে একজন কুষ্ঠরোগী এল; তারপর দশজন এল; তারপর আসতে লাগল দলে দলে।"

বিধবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "নিশ্চয় ইনিই ত্রাণকর্তা। এমন এক সময় ছিল যখন সারা জেরুজালেমে—এমন কি সারা জুডিয়াতে প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে তিনি জন্ম নিয়েছেন। সে কথা আমার বেশ মনে আছে। এত দিনে তিনি নিশ্চয় বড় হয়েছেন। নিশ্চয় তাই—ইনিই সেই।...হ্যাঁ, তোর সঙ্গে আমরা যাব। কবরের মধ্যে জল আছে। নিয়ে এসে খাবার সাজিয়ে দে। খেয়েই আমরা রওনা হব।"

কোন মতে খাওয়া শেষ করেই তিনটি নারী এক অসাধারণ যাত্রাপথে পা বাড়াল। আমরাহ-র পরামর্শে জনবহুল পথ এড়িয়ে তারা একটা উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল। কিন্তু স্নেহময়ী বৃদ্ধার আপ্রাণ সহায়তা সত্ত্বেও পাহাড় বেয়ে নীচে নামতে টির্জার খুবই কষ্ট হতে লাগল। এক সময় ক্লান্তিতে বসে পড়ে সে বলল, "মা, আমাকে এখানে রেখে তুমি আমরাহকে নিয়ে এগিয়ে যাও।"

"না। না, টির্জা। আমার রোগ সেরে যাবে আর তোমার সারবে না, তাতে আমার কি লাভ হবে ? জুডা যখন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করবে তখন তাকে আমি কি জবাব দেব ?"

"তাকে বলো, আমি তাকে ভালবাসি।"

বিধবাটি উঠে দাঁড়াল। একান্ত হতাশায় তার মনে হল, এ যাত্রার বুঝি এখানেই শেষ হয়ে যাবে। এমন সময় সে দেখতে পেল, পুব দিক হতে একটি লোক দ্রুত হেঁটে আসছে।

বিধবা বলল, "মনে সাহস আন টির্জা। দূরে একটি লোককে দেখতে পাচ্ছি। সে হয় তো নাজারিনের খবর আমাদের বলতে পারবে।"

টির্জা বলল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ মা যে আমরা কি। অপরিচিত লোকটি আমাদের এড়িয়ে যাবে। তার কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য পাথর যদি বা না হয়, অভিশাপ অবশ্যই হবে।"

"সে দেখা যাবে।"

লোকটি আরও কিছুটা এগিয়ে আসতেই বিধবা তার মাথার আবরণ সরিয়ে আইনমাফিক উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠল :

"অচ্ছুৎ ! অচ্ছুৎ !"

কী আশ্চর্য ! তা শুনেও লোকটি এগিয়েই এল।

তাদের থেকে চার গজ দূরে দাঁড়িয়ে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কি চাও ?"

মা মর্যাদার সঙ্গে বলল, "দেখতেই তো পাচ্ছ। একটু সরে দাঁড়াও।"

"নারী, আমি যাঁর বার্তাবহ তিনি যদি মাত্র একবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলেন তাহলেই তোমাদের রোগ সেরে যায়। আমি ওতে ভয় পাই না।"

"তিনি কি নাজারিন ?"

"তিনি ত্রাণকর্তা," লোকটি বলল।

"আজ তিনি এই শহরে আসছেন একথা কি সত্যি ?"

"এখন তিনি বেথ্‌ফাজ-এ পৌঁচেছেন।"

"কোন্‌ পথে যেতে হবে ?"

"এই পথে ?"

বিধবা করজোড়ে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

করুণায় বিগলিত হয়ে লোকটি প্রশ্ন করল, "বলতে পার তিনি কে ?"

"ঈশ্বরের পুত্র", বিধবা জবাব দিল।

"তাহলে এখানেই অপেক্ষা কর; অথবা, তার সঙ্গে তো অগুনতি লোকজন থাকবে, তাই দূরের ওই পাহাড়ে সাদা গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াও; আর তিনি যখন এই পথ দিয়ে যাবেন তখন যেন তাঁকে ডাকতে ভুলো না; তাঁকে ডেকো ভয় করো না। আকাশ জুড়ে বজ্রের গর্জন উঠলেও তোমার ডাক তিনি ঠিকই শুনতে পাবেন।"

লোকটি চলে গেল। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ডান দিকে গজ ত্রিশেক দূরে গিয়ে মাথা সমান উঁচু একটা জায়গায় পৌঁছে তারা গাছের নীচে আশ্রয় নিল। গাছের ছায়ায় টির্জা ঘুমিয়ে পড়ল।

নীচের রাস্তায় ক্রমেই লোক চলাচল বাড়তে লাগল। ভিড় জমে উঠল। হাজার হাজার লোক। প্রত্যেকের হাতে সদ্য-কাটা একটা করে তালের ডাঁটি।

এমন সময় পূব দিক থেকে ভেসে এল বহু কণ্ঠের উল্লাস-ধ্বনি। মা তখন টির্জাকে জাগিয়ে তুলল।

"এ সব কি ব্যাপার মা ?"

"তিনি আসছেন।"

পূব দিক থেকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে জনতার স্রোত। সকলের

মাঝখানে যে লোকটি ঘোড়ায় চড়ে আসছে তাকে ঘিরেই উৎফুল্ল জনতা নাচছে আর গাইছে। তার মাথা অনাবৃত ; সারা দেহ শ্বেত বস্ত্রে আবৃত। কাউকে বলে দিতে হল না যে ইনিই সেই আশ্চর্য নাজারিন।

মা বলল, "ঐ তো তিনি টির্জা, ঐ তো তিনি। এগিয়ে চল মা; আরও এগিয়ে চল! যদি তিনি আমাদের ডাক না শুনতে পান।"

কাঁপতে কাঁপতে তারা এগোতে লাগল। সমবেত জনতার চোখ পড়ল তাদের উপর। মুহূর্তের জন্য আতংকে স্তব্ধ হয়ে থেকে তারা চীৎকার করে উঠল।

"কুষ্ঠরোগী! কুষ্ঠরোগী!"

"পাথর ছুঁড়ে মারো।"

"ঈশ্বরের অভিশাপগ্রস্ত জীব ওরা! ওদের হত্যা কর!"

এই রকম চীৎকার করতে করতে একদল লোক তিনটি প্রাণীকে ঘিরে ধরল। এমন সময় অশ্বারোহী এসে মহিলাটির সামনে ঘোড়া থামাল। মহিলাটি চোখ তুলল—কী শান্ত, করুণাঘন, সুন্দর মুখ! দুটি বড় বড় চোখে অভয় আশ্বাস।

"প্রভু, হে প্রভু! তোমাকেই যে আমাদের দরকার। দয়া কর প্রভু, আমাদের উপর দয়া কর।"

অশ্বারোহী প্রশ্ন করল, "তুমি কি বিশ্বাস কর, এ কাজ আমি করতে সক্ষম?"

"মহাপুরুষরা যাঁর কথা বলেছেন তুমিই তো সেই—তুমিই তো মানুষের ত্রাণকর্তা!"

অশ্বারোহীর দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল গভীর প্রত্যয়। বলল, "নারী, তোমার বিশ্বাস অপরিসীম ; তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

সমবেত জনতার কথা বিস্মৃত হয়ে মুহূর্তকালের জন্য অশ্বারোহী সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সদলবলে সেখান থেকে চলে গেল।

মাথাটা ঢেকে বিধবা অতি দ্রুত টির্জার কাছে ফিরে এল। তাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "চেয়ে দেখ টির্জা, তাঁর কথা আমি পেয়েছি। সত্যি তিনি ত্রাণকর্তা। আমরা বেঁচে গেলাম—বেঁচে গেলাম!"

হাঁটু ভেঙে বসে দুজনই অপসৃয়মান শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা অদৃশ্য হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল জনতার শেষ কণ্ঠস্বর। আর তারপরেই শুরু হল অলৌকিক ঘটনা। দুটি কুষ্ঠরোগিনীর দেহে প্রবাহিত হতে লাগল নতুন রক্তের ধারা; অনুভূতিপ্রবণ হতে লাগল প্রতিটি অসার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ; দেহে এল শক্তি ; এল নতুন জীবন। দুজনই রোগ-মুক্ত হল।

আম্‌রাহ্‌ ছাড়া এই পুনর্মিলনের আরও একজন সাক্ষী সেখানে ছিল। নাজারিন-এর এই শোভাযাত্রায় বেন-হুরও তাঁর সংগেই ছিল। তাঁকে অশ্বারোহণে তিনটি নারী মূর্তির দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বেন-হুর শোভাযাত্রা ছেড়ে একটু দূরে একটা পাথরের উপর বসে সবই দেখছিল। শোভাযাত্রা চলে যেতে এবার সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুদূর এগিয়েই সে চমকে উঠল।

"এ যে আম্‌রাহ্‌!"

না চিনতে পেরে মা ও মেয়েকে পাশ কাটিয়ে সে দাসীটির দিকে এগিয়ে গেল। বলল, "আম্‌রাহ্‌, তুমি এখানে কি করছ?"

আম্‌রাহ্‌ ছুটে গিয়ে বেন-হুরের পায়ের উপর আছড়ে পড়ল। আনন্দে ও ভয়ে তার বাকরোধ হয়ে গেল।

"প্রভু, আমার প্রভু! ঈশ্বর করুণাময়!"

বেন-হুরও হতবাক। দুই চোখে জলের ধারা বইয়ে জোড় হাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কে এই নারী? তবে কি তারই ভুল? দাসীর মাথায় হাত রেখে কাঁপা-কাঁপা গলায় সে বলল, "আম্‌রাহ্‌, আম্‌রাহ্‌—আমার মা! টির্জা! বল, আমি যা দেখছি তা সত্যি তো?"

আম্‌রাহ্‌ বলল, "তাদের সংগে কথা বল বাবা, কথা বল!"

দুই হাত বাড়িয়ে বেন-হুর এগিয়ে গেল, "মা! মা! টির্জা! এই তো আমি এসেছি!"

দীর্ঘ অদর্শনের পরে তিনটি প্রাণীর মিলিত অশ্রুধারা আবার এক সংগে বইতে লাগল।

অবশেষে মা বলল, "এবার আমরা কি করব বাবা? কোথায় যাব?"

নিজের জোব্বাটা টির্জার দিকে ছুড়ে দিয়ে বেন-হুর বলল, "এটা গায়ে জড়িয়ে নাও।"

জোব্বাটা খুলে ফেলতেই তার বেল্টের সংগে ঝোলানো তলোয়ারটা সকলের চোখে পড়ে গেল।

মা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করল, "এখন কি যুদ্ধ হচ্ছে?"

"না।"

"তাহলে তুমি সশস্ত্র কেন?"

"নাজারিন-এর নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হতে পারে।"

আসল সত্যটা সে এড়িয়ে গেল।

"তাহলে তাঁরও শত্রু আছে? কারা তারা?"

"হায় মা, তারা সকলেই রোমক নয়।"

"তিনি কি ইস্রায়েলী নন? শান্তিকামী নন?"

"তাঁর চাইতে বড় শান্তিকামী কেউ কোন দিন ছিল না; কিন্তু রাব্বি ও ধর্মগুরুদের মতে একটি গুরুতর অপরাধে তিনি অপরাধী।"

"কি সেই অপরাধ?"

"তাঁর চোখে কি জেণ্টিল, কি ইহুদী সকলেই সমান। তিনি প্রচার করছেন এক নববিধান।"

মা চুপ করল। সকলে পাহাড়ের নীচে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল।

কেড্রন-এর পূর্বতীরে রাজকীয় কবরস্থানের ছোট জায়গাটায় দুটো তাঁবু ফেলে সেখানে সুখ সুবিধার সাধ্যমত ব্যবস্থা করে বেন-হুর মা ও বোনকে সেখানে নিয়ে রাখল। সংশ্লিষ্ট পুরোহিত তাদের দুজনের পূর্ণ রোগমুক্তির সুপারিশ না করা পর্যন্ত আইনত তাদের লোকালয়ের বাইরেই থাকতে হবে।

দীর্ঘ অদর্শনের পরে উভয় পক্ষেরই অনেক কথা বলারও ছিল, শোনারও ছিল। সেই সব কথা বলতে ও শুনতেই বেন-হুরের দিন কাটতে লাগল। মন্দিরে যাবার এবং উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদানের সময়ই তার ছিল না। তাঁবুতে বসে বসেই সে ভাবে: কবে নাজারিন সকলকে ডাক দেবেন, কবে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, কবে সমবেত জনতা ভেরী বাজিয়ে শিঙাধ্বনি করে তাঁকে রাজার আসনে বসাবে?

একদিন। রাত্রিকালে।

রাজপথে জনতার অবিরাম আসা-যাওয়া। দলে দলে লোক আগুনের চারপাশে বসে মাংস রোস্ট করছে; উৎসবের মেজাজে জমায়েত হয়েছে; গান করছে; মৌজ করছে। ঝলসানো মাংসের গন্ধের সঙ্গে চন্দন-ধূপের সুরভি মিশে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সর্বত্র উৎসবের আমেজ। এ কয়দিন সব ইস্রায়েলী পরস্পর ভাই-ভাই। তাই আতিথেয়তা ও আপ্যায়নেরও কোন সীমা নেই। বেন-হুর যেখানে যাচ্ছে সেখানেই সকলে তাকে অভিবাদন করে চেপে ধরছে, "আমাদের সঙ্গেই বসে যাও ভাই। প্রভুর প্রতি প্রেমে আজ আমরা সকলেই ভাই-ভাই।" বেন-হুর সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল খান এর দিকে; মনে ইচ্ছা, যত তাড়াতাড়ি পারে কেড্রন-এর তাঁবুতে ফিরে যাবে।

চলতে চলতে এক জায়গায় তাকে রাজপথ পার হতে হল। সেখানেও উৎসবের হৈ-হল্লা সমানতালে চলেছে। তাকিয়ে দেখল, জ্বলন্ত মশালের শোভাযাত্রা চলেছে অগ্নি-শলাকার মত একটানা। তারপরই তার মনে হল, মশালগুলি যেদিক থেকে আসছে সেখানে গান-বাজনার সুর থেমে গেছে। তার বিস্ময় চরমে উঠল যখন সে নিশ্চিত বুঝতে পারল, ধোঁয়া ও নাচের ফাঁকে

ফাঁকে চোখে পড়ছে ঝক্‌ঝকে বর্শার সুতীক্ষ্ম অগ্রভাগ ; তার অর্থ এরা সব রোমক সৈনিক। ইহুদীদের এই ধর্মীয় শোভাযাত্রায় এই সব বেতনভুক সৈনিকের দল কেন এসেছে ? এ রকম তো আগে কখনও শোনা যায় নি। ব্যাপারটা বুঝবার জন্য সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘোড়া থেকে নেমে বেন হুর শোভাযাত্রীদলের রাস্তার খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল, যাতে প্রত্যেকের উপরেই সে নজর রাখতে পারে। মশাল ও বাতি বয়ে নিয়ে চলেছে চাকরের দল ; তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটা মুগুর অথবা তীক্ষ্মমুখ সড়কি। দেখে মনে হল, উপস্থিত তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে কিছু সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যতদূর সম্ভব সমতল পথ খুঁজে তাদের নিয়ে যাওয়া। সেই সম্ভ্রান্তের দলে আছে প্রবীণ ও পুরোহিতরা ; লম্বা দাড়ি, ঘন ভুরু ও খাড়া নাকের রাব্বিরা (সম্ভ্রান্ত ইহুদী)। কোথায় চলেছে তারা ? মন্দিরে তো নয়, কারণ যেদিক থেকে তারা আসছে সেখান থেকে মন্দিরে যাবার পথ এটা নয়। আর—তাদের উদ্দেশ্য যদি শান্তিপূর্ণই হবে, তাহলে সঙ্গে এত সৈন্য কেন ?

শোভাযাত্রা যখন তার পাশ কাটিয়ে যেতে শুরু করল, তখন তিনটি লোক বিশেষভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সকলের প্রায় আগে আগে তারা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। যে চাকররা তাদের আগে চলেছে বাতি নিয়ে সেই তিনটি মানুষের প্রতি তাদের সম্ভ্রম ও সতর্কতার সীমা নেই। তিনজনের মধ্যে যে রয়েছে সকলের বাঁদিকে তাকে সে চিনতে পারল—মন্দিরের প্রধান পুলিশ ; যে দক্ষিণে আছে সে একজন পুরোহিত ; মাঝখানের তৃতীয় লোকটিকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, কারণ অপর দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে সে অত্যন্ত বেশী ঝুঁকে হাঁটছে, আর তার মাথাটা বুকের উপর খুব বেশী ঝুলে পড়ায় মুখটা ঢেকে আছে। লোকটিকে সঠিক চিনবার জন্য বেন-হুর পুরোহিতের একেবারে পাশে পেঁছে গিয়ে তার সংগে সংগে হাঁটতে লাগল। এখন লোকটি একবার মাথাটা তুললেই হয়! ইতিমধ্যেই সে মাথাটা তুলল ; বাতির আলো পড়ল তার মুখে ; ম্লান, বিহ্বল, আতংকিত মুখ ; এলোমেলো দাড়ি ; হতাশায় গর্তে-বসা বাষ্পাচ্ছন্ন দুটি চোখ। নাজারিন-এর সংগে অনেকদিন থাকার ফলে বেন-হুর তাঁকে যেমন ভাল করেই চেনে, তেমনই চেনে তাঁর শিষ্যসেবকদের। বিষণ্ণ মুখটা দেখেই সে বলে উঠল :

"ঙ্ক্যারিয়ট !"

শোভাযাত্রীদের সংগে বেন-হুর এগিয়েই চলল। সর্বত্র লোক আর লোক ; সকলেই উৎসবে মত্ত। ক্রমে তারা একটা গিরি-খাত ধরে একটা সেতুর কাছে গিয়ে পেঁছল। সেখানে সকলের হাতের মুগুর ও সড়কির আঘাত পাথুরে মাটিতে লেগে ঠকাঠক শব্দ হতে লাগল। আরও কিছুটা এগিয়ে শোভাযাত্রীরা

পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জলপাই বাগানের কাছে হাজির হল। শোভা-যাত্রাটা হঠাৎ সেখানে সম্পূর্ণ থেমে গেল। অনেক কণ্ঠের হাঁকডাক উঠল। সকলে হঠাৎ থেমে পড়ায় একটা ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। সৈনিকরা শৃংখলা রক্ষার কাজে লেগে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে বেন-হুর সেই ভীড় এড়িয়ে ছুটে সামনে এগিয়ে গেল। বাগানের ফটকে কোন দরজা নেই। সমস্ত দৃশ্যটার উপর নজর রাখবার জন্য সেখানেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শ্বেতবসনপরিহিত একটি লোক খোলা মাথায় ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে-ছিল। হাত দুটি আড়াআড়িভাবে রাখা; ঝুঁকে-পড়া ক্ষীণ দেহ; লম্বা চুল ও সরু মুখ; ভংগীতে আত্ম-সমর্পণের ভাব।

লোকটি নাজারিন!

তাঁর পিছনে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে শিষ্যরা। তারা প্রত্যেকেই উত্তেজিত; লোকটি কিন্তু চিরদিনের মতই শান্ত। মশালের উজ্জ্বল আলো পড়েছে তার উপর; সোনালী চুলে লেগেছে রক্তিম আভা।

শোনা গেল খৃস্টের স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

"তোমরা কাকে চাও?"

"নাজারেথ-এর যীশুকে", পুরোহিত জবাব দিল।

"আমিই সেই।"

অতি সহজভাবে উচ্চারিত এই সরলতম কথাগুলি শুনেই আক্রমণকারীরা কয়েক পা পিছিয়ে গেল। যারা অপেক্ষাকৃত ভীরু তারা মাটিতেই লুটিয়ে পড়ল। তাঁকে সেখানে রেখে তারা হয় তো চলেই যেত, এমন সময় এগিয়ে এল জুডাস।

"প্রভুর জয় হোক!"

বন্ধুর মত কথাগুলি বলে জুডাস তাঁকে চুম্বন করল।

সদয় কণ্ঠে নাজারিন বলল, "জুডাস, মানব-পুত্রকে তুমি কি চুম্বন দিয়ে ঠকাতে চাও? কেন এসেছ তুমি?"

কোন জবাব না পেয়ে প্রভু পুনরায় জনতার দিকে তাকিয়ে কথা বলল।

"তোমরা কাকে চাও?"

"নাজারেথ-এর যীশুকে।"

"বলেছি তো আমিই সেই। সুতরাং আমাকেই যদি তোমরা চাও তাহলে এদের চলে যেতে বল।"

তাঁর মুখে এই অনুনয়ের কথা শুনে রাব্বিরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের রকম-সকম দেখে শিষ্যরাও এগিয়ে এল; একজনের কানও কেটে দিল, কিন্তু তাদের প্রভুকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না। বেন-হুর তখনও

শয়তানের মত দাঁড়িয়ে। কী আশ্চর্য! অফিসাররা যখন দড়ি দিয়ে নাজারিনকে বাঁধতে উদ্যত, তখনও সে জীবনের শ্রেষ্ঠ করুণা প্রদর্শনের কাজেই ব্যস্ত।

কান-কাটা লোকটিকে বলল, "তোমার আর কষ্ট হবে না।" গায়ে হাত বুলিয়ে সে তার ক্ষত সারিয়ে দিল।

শত্রু-মিত্র দু'পক্ষই হতবাক—বন্ধুরা ভাবছে, এ কাজ সে করল কেমন করে, আর শত্রুরা ভাবছে, এই পরিস্থিতিতে কি এ কাজ করা সম্ভব।

বেন-হুর তখনও ভাবছে: "এরা কিছুতেই তাঁকে বাঁধতে পারবে না।"

"তোমাদের তরবারি কোষবদ্ধ কর; আমার পিতা যে পান-পাত্র আমাকে পাঠিয়েছেন তা পান না করে কি আমি পারি?" তারপর আক্রমণোদ্যত সংগীদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যারা তাকে বন্দী করতে এসেছে তাদের দিকে ফিরে নাজারিন বলল, "তোমরা কি একটা চোরকে ধরতে এসেছ যে তরবারি ও সড়কি হাতে নিয়ে এসেছ? মন্দিরে তো রোজই তোমাদের সংগে আমি ছিলাম, তখন তো আমাকে বন্দী কর নি; কিন্তু এই তো তোমাদের উপযুক্ত সময়, অন্ধকারের শক্তি তোমরা।"

সৈন্যদল নব উদ্যমে তাঁকে ঘিরে ফেলল; বেন-হুর তাকিয়ে দেখল, অনুগতরা চলে গেছে—একজনও সেখানে নেই।

জনতা শহরের দিকে ফিরে চলল। এবার তাদের আগে আগে সৈন্যদল। বেন-হুর উদ্বিগ্ন, নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট। হঠাৎ তার মনে হল, তাঁর সংগে সে দেখা করবে, তাঁকে একটি প্রশ্ন করবে।

গায়ের ঝোলা পোষাক ও মাথার রুমালটা খুলে বাগানের প্রাচীরের উপর রেখে সে দ্রুত ভিড়ের সংগে মিশে গেল। যে লোকটির হাতে ছিল বন্দীর দড়ির প্রান্ত ভিড় ঠেলে তার কাছে পৌঁছে গেল।

ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে নাজারিন; মাথাটা আনত, হাত দুটি পিছনে নিয়ে বাঁধা; মুখের উপর চুল এসে পড়েছে ঘন হয়ে; অনেক বেশী ঝুঁকে পড়েছে দেহ; কোন দিকে যেন খেয়ালই নেই।

অবশেষে গিরি-খাতের সেতুর কাছে পৌঁছে বেন-হুর একটি চাকরের হাত থেকে বন্দীর দড়িটা নিজের হাতে নিল। নাজারিন-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "তুমি কি শুনতে পাচ্ছ প্রভু? একটি কথা—মাত্র একটি কথা। আমাকে বল—"

চাকরটি আবার দড়িতে হাত দিল।

বেন-হুর বলল, "বল, তুমি কি স্বেচ্ছায় এদের সংগে চলেছ?"

লোকজনরা এগিয়ে এসে তার কানের কাছে বলল, "তুমি কে হে বাপু?"

উদ্বেগাকুল গলায় বেন-হুর বলল, "প্রভু, আমি তোমার বন্ধু, আমি

তোমাকে ভালবাসি। মিনতি করছি; বলে দাও, তোমাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা যদি করি তুমি কি তা গ্রহণ করবে?"

নাজারিন মুখ তুলেও তাকাল না; তাকে যে চিনতে পেরেছে তার তিলমাত্র লক্ষণও খুঁজে পাওয়া গেল না। তবু মনে হল, তার বেদনাদীর্ণ চোখ দুটি যেন বলছে, তাকে একা থাকতে দাও। বন্ধুরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছে; জগৎ তাঁকে অস্বীকার করেছে; তাই তো বড় দুঃখে সে মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে; সে আজ চলে যাচ্ছে; কোথায় যাচ্ছে তা সে জানে না; জানতেও চায় না। তাঁকে একা থাকতে দাও।"

এবার সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেন-হুরের উপর। এক ডজন হাত তাকে ঘিরে ধরল। চারদিক থেকে সকলে চীৎকার করে বলল, "এও ওদেরই একজন। একে টেনে নিয়ে এস। মুগুর লাগাও—মেরে ফেল!"

বিপদে পড়লে বেন-হুরের শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সেই শক্তিবলে দুই হাতে অন্য সব হাত দূরে সরিয়ে সে ভিড়ের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। লোকের হাতের টানে তার জামাটা পিঠের দিক থেকে ছিঁড়ে তাদের হাতেই রয়ে গেল। উলঙ্গ অবস্থায় সে গিরি-খাতের নির্জন অন্ধকারে নিজেকে নিরাপদে লুকিয়ে ফেলল। তারপর বাগানের প্রাচীরের উপর থেকে জোব্বা ও রুমাল তুলে নিয়ে শহরের ফটক পেরিয়ে খান-এ ঢুকল এবং একটা ভাল ঘোড়ায় চেপে সেখান থেকে রাজকীয় সমাধির পাশে তার মা ও বোনের তাঁবুর দিকে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, কাল সে নাজারিন-এর সঙ্গে দেখা করবেই—হায়! সে তো জানত না, বন্ধুপরিত্যক্ত সেই মানুষটিকে সেই রাতেই সোজা নিয়ে যাওয়া হয়েছে হান্নাস-এর ভবনে বিচারের জন্য।

পরদিন সকাল দ্বিতীয় ঘণ্টায় দুটি অশ্বারোহী তীব্রগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বেন-হুরের তাঁবুর সামনে থামল। লোক দুটি গ্যালিলিসবাসী, বিশ্বস্ত অফিসার।

বেন-হুর বলল, "আসন গ্রহণ কর।"

প্রবীণতর লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না; এখানে বসে আরাম করলে নাজারিনকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দেওয়া হবে। হে জুডার পুত্র, প্রস্তুত হয়ে নিন, আমাদের সঙ্গে চলুন। দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রুশ-কাষ্ঠ ইতিমধ্যেই গল্‌গোথায় পৌঁছে গেছে।"

বেন-হুরের মুখ সংকল্পে রক্তিম হয়ে উঠল। হাতে তালি বাজাতেই একটি আরব ঘরে ঢুকল। "আমার ঘোড়া—শিগ্‌গির! আর আম্‌রাহ্‌কে বল, নতুন পোষাক ও তরবারি আনতে। বন্ধুগণ, ইস্রায়েল-এর জন্য মৃত্যুর

লগ্ন সমাগত। আমি না আসা পর্যন্ত তোমরা বাইরে ক্ষণেক অপেক্ষা কর।"

পথে নেমে গ্যালিলিবাসী জিজ্ঞাসা করল, "প্রথম কোথায় যাবেন?"

"সৈন্য সংগ্রহ করতে।"

দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে লোকটি বলে উঠল, "হায় দুর্ভাগ্য।"

"দুর্ভাগ্য কেন?"

লজ্জায় মুখ নীচু করে লোকটি বলল, "প্রভু, শুধু আমি আর আমার এই বন্ধুটিই আপনার অনুগত। আর সকলেই পুরোহিতদের দলে।"

ঘোড়ার রাশ টেনে বেন-হুর বলল, "তারা কি চায়?"

"তাঁকে হত্যা করতে।"

"নাজারিনকে নিশ্চয় নয়?"

"আপনি ঠিক নামটিই উচ্চারণ করেছেন।"

বেন-হুর বুঝতে পারল, গ্যালিলিবাসীদের উপর ভরসা করে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল তা ব্যর্থ হয়েছে; তারা তাকে পরিত্যাগ করেছে; আর কিছুই করার নেই। আতংকে সে শিউরে উঠল।

তারপর বলল, "চল ভাইসব, গলগোথার দিকে চল।"

রাস্তা জুড়ে উত্তেজিত জনতার প্রচণ্ড ভীড়। শহরের উত্তরাঞ্চল দিয়ে গোটা দেশ যেন পথে নেমে এসেছে। ভিড় তো নয়, যেন বন্যার জলস্রোত। ঘোড়া থেকে নেমে তিনজন একটা বাড়ির কোণে দাঁড়িয়ে পড়ল। দূর থেকে কানে এল বহু কণ্ঠের উত্তেজিত উল্লসিত চীৎকার। সে শব্দে বাতাস যেন কাঁপছে।

সাইমনাইডিসকে চেয়ারে বসিয়ে সেখানে উপস্থিত হল তার চাকররা। তার পাশে হাঁটছে এস্তার। তাদের পিছনে একটি ঢাকা পাল্কি। তাতে আছে বৃদ্ধ বাল্‌থাজার।

বেন-হুর সাইমনাইডিস ও এস্তারকে শুভ কামনা জানিয়ে তাড়াতাড়ি পাল্কির আবরণ খুলে দিল। মিশরীয় বৃদ্ধ শুয়ে আছে। তার মুখ মরার মত সাদা।

বেন-হুর বলল, "এই প্রচণ্ড ভিড়ে আর না এগিয়ে এই বাড়িটার কোণে আশ্রয় নেওয়াই ভাল, কি বলেন?"

"তাঁকে দেখতে পাব তো?" বৃদ্ধ অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল।

"নাজারিনকে তো? নিশ্চয়; এখান থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূর দিয়েই তো তিনি যাবেন।"

বৃদ্ধ আবেগে কাঁপা গলায় বলল, "হায় প্রভু! আর একবার, আর একটিবার! হায়, পৃথিবীর আজ বড় দুর্দিন।"

অতি কষ্টে পাল্কি থেকে বেরিয়ে সে একটি চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াল ; এস্তার ও বেন-হুর দাঁড়াল সাইমনাইডিস-এর পাশে।

বন্যার স্রোত আরও কাছে এগিয়ে এল ; আরও তীব্র তার বেগ, আরও নিষ্ঠুর, নির্মম তার গর্জন।

অবশেষে দেখা দিল নাজারিন।

মৃতপ্রায়। প্রতিটি পদক্ষেপে পা এমনভাবে টলছে বুঝি মাটিতে পড়ে যাবে। সেলাইহীন তলবাসের উপরে একটা শতচ্ছিন্ন নোংরা দাগ লাগা গাউন কাঁধের উপর থেকে ঝুলছে। খালি পা দুটো যেখানে রাখছে সেখানেই রক্তের ছোপ পড়ছে। গলার সঙ্গে একটা বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো ; তাতে লেখা—ইহুদীদের রাজা। একটা কাঁটার মুকুট মাথায় চেপে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ; ফলে কপাল ফুটো হয়ে রক্ত ঝরছে ; সে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে মুখে ও গলায় লেগে আছে। লম্বা চুল কাঁটায় জড়িয়ে জট পাকিয়ে গেছে। গায়ের চামড়া বীভৎস রকমের সাদা। দুই হাত পিছনে বাঁধা। প্রথামত দণ্ডিত অপরাধী হিসাবে ক্রুশ-কাষ্ঠটিকে সে নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল বধ্যভূমিতে। ক্লান্ত পায়ে চলতে গিয়ে শহরের পথে সে ক্রুশ-কাষ্ঠ নিয়েই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে আর একটি লোক ক্রুশ-কাষ্ঠটি বয়ে নিয়ে চলেছে। কয়েকটি সৈনিক তাকে ঘিরে রেখেছে ; তবু জনতা সুযোগ পেলেই তাকে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারছে, তাঁর গায়ে থুথু ফেলছে। কিন্তু তাঁর মুখে শব্দটি নেই ; না ক্রোধের, না আর্তনাদের ; একবার চোখ তুলেও সে তাকাচ্ছে না।

সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ল। সাইমনাইডিস আবেগে কাঁপছে। এস্তার তাকে জড়িয়ে ধরেছে। বাল্‌থাজার হতবাক হয়ে বসে পড়ল। বেন-হুর চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘হে আমার ঈশ্বর! আমার ঈশ্বর!”

নাজারিন পাণ্ডুর মুখখানি তুলল ; একে একে সকলের দিকে তাকাল ; যে আশীর্বাদ সে মুখে উচ্চারণ করতে পারছে না তাই যেন ঝরে পড়ছে তাঁর দুটি মৃত্যুলীন চোখে ; সে দৃষ্টির স্মৃতি এদের অনাগত সারা জীবনের অক্ষয় সঞ্চয়।

সম্বিত ফিরে পেয়ে সাইমনাইডিস জিজ্ঞাসা করল, “হুর-পুত্র, কোথায় তোমার সৈন্যবাহিনী ?”

“এ প্রশ্নের উত্তর আমার চাইতে হান্নাসই ভাল বলতে পারে।”

“সে কি, সব বিশ্বাসঘাতক ?”

“মাত্র এই দুজন ছাড়া।”

বণিকের মুখটা কুঁকড়ে উঠতে লাগল। বেন-হুরের সাথে সাথে সেও অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। সে স্বপ্নের আজ সমাধি হল।

নাজারিন-এর পিছন পিছন দুটি লোক ক্রুশ-কাষ্ঠ বহন করে চলেছে।

"ওরা কারা?" বেন-হুর গ্যালিলিবাসীদের জিজ্ঞাসা করল।

তারা জবাব দিল, "এই দুটি চোরও নাজারিন-এর সঙ্গেই মৃত্যু বরণ করবে।"

এস্তার বলল, "ওখানে কয়েকটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ওরা কারা?"

বেন-হুর বলল, "যে লোকটির কাঁধে মুখ রেখে একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে সে নাজারিন-এর প্রিয়তম শিষ্য; আর যে স্ত্রীলোকটি কাঁদছে সে প্রভুর মা মেরি; বাকি তিনটি স্ত্রীলোক গ্যালিলিবাসিনী।"

সাইমনাইডিস অধৈর্য হয়ে বলল, "দয়া করে বালথাজারকে বলে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন। জেরুজালেমের উচ্ছিষ্টভোজীর দল আসছে।"

কথাগুলি বেন-হুরের কানে গেল না। একাগ্র মনে সে নাজারিন-এর কথাই ভাবছে। এই মানুষটির কাছে তার যে অনেক ঋণ; অথচ সে ঋণ শোধ করবার কোন ক্ষমতাই তার নেই। হয় তো এ অবস্থার জন্য সেই দায়ী। সাধ্যায়ত্ত সব কিছু সে করে নি। গ্যালিলির অধিবাসীদের উপর আরও কড়া নজর সে রাখতে পারত; পারত তাদের বিশ্বস্ত রাখতে, প্রস্তুত হয়ে থাকতে; আর—আঃ! আঘাত হানবার এই তো উপযুক্ত মুহূর্ত! একটিমাত্র চরম আঘাতে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত; নাজারিন মুক্তি পেত! শুধু তাই নয়, এ আঘাত ইস্রায়েলীদের কানে বাজত রণ-সংকেত হয়ে; দীর্ঘদিনের মুক্তি-যুদ্ধের স্বপ্ন সত্য হত। সে সুযোগ চলে যাচ্ছে; প্রতি মুহূর্তে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে; আর এ সুযোগ যদি হারায়! হে আব্রাহাম-এর ঈশ্বর! কিছুই কি করবার নেই—কিছুই না?"

সেই মুহূর্তে একদল গ্যালিলিবাসীকে সে দেখতে পেল। ছুটে গিয়ে তাদের সামনে হাজির হল। বলল, "আমার সঙ্গে এস। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।"

লোকগুলি বেন-হুরের কথা শুনল। পুনরায় সেই বাড়িটার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে বেন-হুর বলতে লাগল:

"তোমরাই আমার হাত থেকে তরবারি নিয়েছিলে; আমাকে কথা দিয়েছিলে, আমার পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তির জন্য, আসন্ন রাজার জন্য যুদ্ধ করবে! সেই তরবারি এখনও তোমাদের হাতে আছে, আর আঘাত করবার সময়ও আজ হয়েছে। যাও, সর্বত্র ভাইদের খোঁজ কর, তাদের বল নাজারিন-এর জন্য প্রস্তুত ক্রুশ-কাষ্ঠের কাছে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। ত্বরা কর! না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেক না! নাজারিনই রাজা; তাঁর মৃত্যুতে মুক্তিরও মৃত্যু।"

তারা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে বেন-হুরের দিকে তাকাল, কিন্তু নড়ল না।

"শুনতে পাচ্ছ?" সে প্রশ্ন করল।

তখন তাদের একজন বলল, "জুডার পুত্র, প্রতারিত হয়েছেন আপনি, আমরা নই। নাজারিন রাজা নয়; রাজা হবার মত মনই তার নেই। তিনি যখন জেরুজালেম-এ এলেন, আমরা তাঁর সঙ্গেই ছিলাম: মন্দিরে আমরা তাঁকে দেখেছি; নিজের, আমাদের এবং ইজ্রায়েল-এর আশা তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি; সৌন্দর্য-ফটকে তিনি ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, ডেভিড-এর সিংহাসনে বসলেন না। তিনি রাজা নন, তাই গ্যালিলিও তাঁর সঙ্গে নেই। তাঁকে মরতেই হবে। কিন্তু আপনি শুনুন জুডার পুত্র। আপনার তরবারি রয়েছে আমাদের হাতে, আর মুক্তির জন্য সে তরবারি কোষমুক্ত করে আঘাত হানতে আমরাও প্রস্তুত। প্রস্তুত সমস্ত গ্যালিলি। কিন্তু মনে রাখবেন, মুক্তির জন্য। ক্রুশ-কাষ্ঠের কাছে আমরা আপনার সঙ্গে মিলিত হব।"

বেন-হুরের জীবনের পরম লগ্ন তার সামনে উপস্থিত। এ প্রস্তাব গ্রহণ করে সে যদি কথা বলতে পারত, তাহলে ইতিহাস পাল্টে যেত; কিন্তু সে ইতিহাস হত মানুষের হাতে গড়া, ঈশ্বরের হাতে নয়,—তা কখনও হয় নি, হবেও না।

দোলাচলচিত্তে দুই হাতে মুখ ঢেকে বেন-হুর অসহায়ের মত বাক্যহারা হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

সাইমনাইডিস চতুর্থবার তাকে ডাকল, "চলে এস; আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।"

বাল্‌থাজার, সাইমনাইডিস, এস্তার, বেন-হুর ও দুজন বিশ্বস্ত গ্যালিলি-বাসী যখন ক্রুশে বিদ্ধ করবার জায়গায় উপস্থিত হল, তখন তাদের সকলের আগে ছিল বেন-হুর।

একটা নীচু গোল পাহাড়ের উপরে একটা নর-কপালের আকৃতির জায়গা তারা দেখতে পেল। রুক্ষ, ধূলিমলিন, তৃণহীন, মাঝে মাঝে কিছু পুদিনাজাতীয় গাছের ঝোপ। মানুষের একটা জীবন্ত প্রাচীর জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। তাদের পিছনে আবার বহু লোক উঁকি দিয়ে ভিতরে কি আছে দেখতে চেষ্টা করছে। ভিতরে রোমক সৈনিকদের আর একটা প্রাচীর মানুষের প্রাচীরটাকে আটকে রেখেছে। একজন শতনায়ক তাদের তত্ত্বাবধান করছে। বেন-হুর সেই সুরক্ষিত সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেল। অকাল উত্তর-পশ্চিম দিকে। ওই গোল পাহাড়টার প্রাচীন অ্যারামীয় নাম গল্‌গোথা—ল্যাটিনে ক্যাল্‌ভারিয়া, ইংরেজীতে ক্যাল্‌ভারী, আর তারই অর্থান্তর—নর-কপাল।

সেইখানে কিছু সৈনিক ও মজুর ক্রুশ-কাষ্ঠ বসাবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

গাছ বসাবার গর্তগুলো খোড়া হয়ে হয়ে গেছে। এবার ক্রুশ-কাষ্ঠে জুড়ে দেওয়ার কাজ চলেছে।

প্রধান পুরোহিত শতনায়ককে বলল, "লোকজনকে তাড়াতাড়ি করতে বল।" তারপর নাজারিনকে দেখিয়ে বলল, "দেশ যাতে অপবিত্র না হয় সে জন্য সূর্যাস্তের আগেই এদের মৃত্যু এবং কবরস্থ হওয়া চাই। সেটাই বিধান।"

একটি সৈনিক নাজারিনের কাছে গিয়ে তাঁর সামনে একটি পানপাত্র এগিয়ে ধরল, কিন্তু সে নিল না। তখন আর একটি সৈনিক তাঁর কাছে গিয়ে বিজ্ঞপ্তি-ফলকটি তাঁর গলা থেকে খুলে নিয়ে ক্রুশ-কাষ্ঠের সঙ্গে পেরেক দিয়ে এঁটে দিল—উদ্যোগ-পর্ব সম্পূর্ণ হল।

শতনায়ক জানাল, "ক্রুশ প্রস্তুত।"

প্রধান পুরোহিত বলল, "প্রথম নিয়ে যাও ঈশ্বরের নিন্দাকারীকে; ঈশ্বর-পুত্র অবশ্যই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। দেখা যাক।"

এবার দণ্ডিতদের পেরেক মেরে ক্রুশ-কাষ্ঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। এ কথা ভাবতেও সমবেত জনতা যেন ভয়ে শিউরে উঠল।

বালথাজার কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। বলল, 'দোষী কি নির্দোষ, যারাই এ দৃশ্য দেখল, আজ থেকে তাদের জীবনও হল অভিশপ্ত।"

সাইমনাইডিস উত্তেজিত গলায় বলল, 'হুর-পুত্র, এখনও যদি জিহোভা ওঁর হাত না বাড়ান, তাহলে ইস্রায়েল-এর সর্বনাশ—আমাদের সর্বনাশ।"

বেন-হুর শান্ত গলায় বলল, "আমি যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম সাইমনাইডিস। স্বপ্নের মধ্যে কে যেন আমাকে বলল, যা বিধির বিধান তাই তো হচ্ছে। নাজারিন-এরও এই ইচ্ছা—এ ইচ্ছা ঈশ্বরের। নিশ্চুপে প্রার্থনা করাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।"

পুনরায় সেই নর-কপালাকৃতি পাহাড়ের দিকে তাকাতেই নিস্তব্ধ বাতাসে তার কানে ভেসে এল একটি অশরীরী বাণী:

"আমিই নবজন্ম—আমিই জীবন।"

কে জানে কার উদ্দেশে—বেন-হুর সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল।

পাহাড়-চূড়ায় তখন নির্দিষ্ট কাজ চলেছে। রক্ষীরা নাজারিন-এর গা থেকে পোষাক খুলে নিল; লক্ষ চোখের সামনে সে তখন নগ্নদেহ। সকাল থেকে যত কশাঘাত তাঁকে করা হয়েছে তার রক্তাক্ত চিহ্ন ফুটে রয়েছে তাঁর পিঠে। তবু নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে ক্রুশ-কাষ্ঠের গায়ে শুইয়ে দেওয়া হল—প্রথমে হাত দুখানি রাখা হল আড়াআড়ি কাঠের দুদিকে; পেরেকগুলি তীক্ষ্নমুখ—কয়েকটি আঘাতেই হাতের পাতা ফুঁড়ে কাঠের সঙ্গে বিঁধে গেল; তারপর হাঁটু দুটোকে এমনভাবে ঠেলে তুলে ধরা হল যাতে তাঁর পায়ের

পাতা ক্রুশ-কাষ্ঠের উপর ঠিকভাবে পড়ে; তখন একটা পাতাকে আর একটা পাতার উপর রেখে একটিমাত্র পেরেক দিয়ে দুটি পাতাকে এক সঙ্গে কাঠের সঙ্গে গেঁথে দিল।

অনেকেই এ দৃশ্য দেখল; অনেক দূরে দূরে যারা ছিল তারা চোখে দেখতে পেল না, কিন্তু হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনতে পেল; আতংকে কাঁপতে লাগল সকলেই। কিন্তু যাঁর উপরে এত নির্যাতন, তাঁর মুখে একটি আর্তনাদ নেই, একটু ক্রন্দন নেই, এতটুকু নালিশ নেই: এমন কিছু নেই যা দেখে-শুনে শত্রুর মুখে হাসি ফুটতে পারে, আর আপনজনের মনে জাগতে পারে ক্ষোভ।

একজন জানতে চাইল, "মুখ রাখা হবে কোন্ দিকে?"

প্রধান পুরোহিত বলল, "মন্দিরের দিকে। মৃত্যুকালে সে যেন দেখে যেতে পারে যে তার মৃত্যুতে মন্দিরের এতটুকু ক্ষতি হয় নি।"

মজুররা ক্রুশ-কাষ্ঠটি বয়ে নিয়ে গিয়ে একটিমাত্র হাঁক দিয়ে গর্তের মধ্যে সেটাকে বসিয়ে দিল; সঙ্গে সঙ্গে নাজারিন-এর দেহটাও একটা ঝাঁকি খেয়ে রক্তাক্ত হাতের সঙ্গে ঝুলে পড়ল। তবু যন্ত্রণার শব্দটি পর্যন্ত মুখে নেই—শুধু উচ্চারিত হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাণী:

"পিতা, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা জানে না এরা কি করছে।"

নীচের ভিড়কে ছাড়িয়ে ক্রুশ-কাষ্ঠ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণে সমবেত জনতা একটা উন্মাদ উল্লাস-ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। ক্রুশের মাথায় ঝোলানো ফলকে কি যেন লেখা ছিল। দূরে ও নিকটে সকলেরই দৃষ্টি পড়ল সেই লেখার উপর। যারা সেটা পড়তে পারল তারা শোনাল অন্যদের। এমন কি সমবেত জনতার মুখে মুখে তুমুল হাসি ও তীব্র আর্তনাদের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল আরও একটি সম্ভাষণ:

"ইহুদীদের রাজা। অভিবাদন, ইহুদীদের রাজা।"

সূর্য ক্রমে মধ্যে গগনে উঠল। রোদ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের রুক্ষ বুকে। এমন সময় সহসা যেন একটা প্রচ্ছায়া আকাশ থেকে নেমে এল, ঢেকে দিল পৃথিবীকে—প্রথমে সামান্য একটু ম্লান ছায়ামাত্র, যেন অসময়ের গোধূলি, মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার পদচারণা। কিন্তু ক্রমে সে ছায়া গাঢ়তর হতে লাগল। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। থেমে গেল হাসি। থেমে গেল উল্লাস-ধ্বনি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বিবর্ণ মুখে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আতংকিত এস্তারকে সান্ত্বনা দিতে সাইমনাইডিস বলল, "এটা একটা কুয়াসা, অথবা মেঘ। এখনই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে?"

বেন-হুর বলল, "না, এটা কুয়াসা বা মেঘ নয়,—এটা বায়ুভূত সাধু-সন্তদের করুণার প্রকাশ। আপনি নিশ্চিত জানবেন সাইমনাইডিস, ঐ দূরে যিনি ক্রুশে ঝুলছেন তিনিই ঈশ্বর-পুত্র।"

নতজানু হয়ে প্রার্থনারত বাল্‌থাজার-এর কাছে গিয়ে বেন-হুর বলল, "বিজ্ঞ মিশরীয়,একমাত্র আপনিই সত্যকে জেনেছিলেন—নাজারিনই ঈশ্বর-পুত্র।"

তাকে আরও কাছে ডেকে বাল্‌থাজার বলল, "জন্মলগ্নেই জাবুনার পাত্রে তাঁকে আমি শিশুরূপে দেখেছিলাম; কাজেই তোমাদের চাইতে আগেই যে আমি তাকে চিনতে পারব এতে আর বিস্ময়ের কি আছে!"

প্রচ্ছায়া ঘন হতে হতে এক সময় অন্ধকার নেমে এল পৃথিবীর বুকে। ক্রুশে বিদ্ধ করবার কাজ তাতে বন্ধ হল না। চোর দুটিকে ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ করে সে দুটোকেও মাটিতে পুঁতে দিয়ে রক্ষীরা চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ-ভাঙা বন্যা-স্রোতের মত জনতা সেখানে গিয়ে ভিড় জমাল।

একজন সৈনিক বলল, "হা, হা! তুমি যদি ইহুদীদের রাজা, তাহলে নিজেকে বাঁচাও!"

একজন পুরোহিত বলল, "হ্যাঁ, এখন যদি তিনি আমাদের কাছে নেমে আসতে পারেন, তবেই তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।"

অন্যরা বলল, "তিনি নিজেকে বলতেন ঈশ্বরের পুত্র; দেখা যাক, ঈশ্বর তাঁকে গ্রহণ করেন কি না।"

সাইমনাইডিসরাও সদলে বধ্যভূমির আরও কাছে এগিয়ে গেল। অনেক কষ্ট সহ্য করে বাল্‌থাজারও পাহাড় বেয়ে সেখানে গেল। সেখান থেকে তারা নাজারিনকে অস্পষ্টভাবে একটি ঝুলে-থাকা ছায়ামূর্তির মত দেখতে পেল। তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসও তাদের কানে বাজতে লাগল।

এইভাবে এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা কেটে গেল। কয়েকটি স্ত্রীলোক ক্রুশের পায়ের কাছে এসে নতজানু হয়ে বসল। তাদের মধ্যে ছিল তাঁর মা ও প্রিয় শিষ্য।

গলার স্বর একটু তুলে নাজারিন মাকে বলল, "নারী, তোমার সন্তানকে দেখো!" আর শিষ্যকে বলল, "তোমার মাকে দেখো!"

ক্রমে তৃতীয় ঘণ্টাও অতিক্রান্ত হতে চলল। নাজারিন-এর নিঃশ্বাস কষ্টকর ও দ্রুততর হতে লাগল। মৃত্যুকাল বুঝি আসন্ন।

এ সংবাদ যেন বাতাসের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল প্রতি জনের কানে। নেমে এল নিবিড় স্তব্ধতা। বাতাসও বুঝি মরে গেল। অন্ধকার উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠল। সকলেই উৎকণ্ঠ—কখন কি হয়।

এমন সময় সেই উৎকণ্ঠ স্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে এল মৃত্যুপথযাত্রীর কাতর ক্রন্দন—সে ক্রন্দন ক্ষোভের নয়, হতাশার :

"আমার ঈশ্বর! ঈশ্বর আমার! কেন তুমি আমাকে ছেড়ে আছ ?"

সৈনিকরা একটি পাত্রে জল-মেশানো মদ রেখে গিয়েছিল। কেউ ইচ্ছা করলে সেই পানীয়ে স্পঞ্জ ভিজিয়ে একটা লাঠির ডগায় করে ক্রুশবিদ্ধ তৃষ্ণার্তের জিভটা ভিজিয়ে দিতে পারে। সেটা দেখেই বেন-হুরের মনে পড়ে গেল নাজারেথ-এর কুয়োর ধারে এই মানুষটি একদিন তার মুখে দিয়েছিল তৃষ্ণার জল। আবেগতাড়িত হয়ে স্পঞ্জটা পাত্রে ডুবিয়ে সে ক্রুশের দিকে ছুটে গেল। সকলে হৈ-হৈ করে উঠল। কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে দৌড়ে গিয়ে সে নাজারিন-এর ঠোঁটে স্পঞ্জটা চেপে ধরল।

দেরি হয়ে গেছে, বড় দেরি হয়ে গেছে!

বেন-হুর দেখল, ক্ষতবিক্ষত, ধূলিধূসরিত, রক্তাক্ত মুখখানি অকস্মাৎ এক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিস্ফারিত দুটি চোখ বহু দূরে কারও উপর নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে শান্তি, স্বস্তি, এমন কি জয়ের আভাষ।

চোখের আলো ধীরে ধীরে নিভে এল। কণ্টকমুকুটলাঞ্ছিত মাথাটা উথাল-পাতাল বুকটার উপর ঝুলে পড়ল। বেন-হুর ভাবল, সব সংগ্রামের অবসান হল। কিন্তু ক্রমক্ষীয়মান শক্তিকে একত্র করে নিম্ন, ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারিত হল তাঁর শেষ বাণী :

"পিতা, তোমার হাতেই আমার আত্মাকে সমর্পণ করলাম।"

যন্ত্রণাদীর্ণ দেহটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল ; একটা তীব্র আর্তনাদ আকাশে ছড়িয়ে পড়ল ; মর-জীবনের অবসান হল ; প্রেমে ভরা বুকটা ভেঙে গেল ; পাঠক, মহামানবের মৃত্যু হল !

বেন-হুর বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে শুধু বলল, "সব শেষ ; তিনি মৃত।"

হঠাৎ শুরু হল ভূমিকম্প। পাহাড়টা কাঁপতে লাগল। দুলতে লাগল ক্রুশ-কাষ্ঠগুলি। ক্রুশবিদ্ধ চোর দুটি আর্তনাদ করতে লাগল। তারই মধ্যে কোন রকমে ছুটতে ছুটতে বেন-হুর বালথাজার-এর কাছে পৌঁছল। সে মাটিতে পড়ে আছে। বেন-হুর তার নাম ধরে ডাকল ; কোন সাড়া নেই। ভাল মানুষটি মারা গেছে। তখন বেন-হুরের মনে পড়ল, নাজারিন-এর শেষ আর্তনাদের সময় আরও একটা আর্ত চীৎকার তার কানে এসেছিল। তবে কি এই মহান মিশরীয়ের আত্মা তার প্রভুর আত্মার সংগেই মরলোকের সীমানা পেরিয়ে একই সংগে যাত্রা করেছে স্বর্গালোকের পথে।

* * *

যীশু খৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার প্রায় পাঁচ বছর পরে।

মিসেনাম-এর তীরে একটি সুন্দর বাড়ির একটা ঘরে বসে ছিল বেন-হুরের স্ত্রী এস্তার। বেলা দ্বিপ্রহর। ইতালীর আকাশে গ্রীষ্মকালীন সূর্য গোলাপ ও দ্রাক্ষালতার বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে উষ্ণ রোদের স্পর্শ। ঘরের সব কিছুই রোমক পদ্ধতিতে সাজানো; শুধু এস্তারের পরণে ইহুদীদের পোষাক। মেঝেতে বিছানো সিংহের চামড়ার উপর বসে টিজর্ণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করছে। এস্তার আগের চাইতেও সুন্দরী হয়েছে; একটি সুখী সংসারের কর্ত্রী হবার স্বপ্নও সফল হয়েছে।

এমন সময় ঘরে ঢুকল একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক। তাকে দেখেই এস্তার উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমি তোমাকে চিনি; তুমি তো—"

"ছিলাম বাল্‌থাজার-এর মেয়ে আইরাস।"

এস্তার চাকরকে বলল একটা আসন এনে দিতে।

আইরাস ঠাণ্ডা গলায় বলল, "না। আমি এখনই চলে যাব।...এরা তোমার ছেলেমেয়ে?"

এস্তার হেসে বলল, "হ্যাঁ। তুমি এদের সঙ্গেও কথা বলবে না?"

"না। আমাকে দেখে ওরা ভয় পাবে।" আইরাস এস্তারের আরও কাছে এগিয়ে যেতেই সে একটু সরে গেল। আইরাস বলল, "ভয় নেই। আমার হয়ে তোমার স্বামীকে একটা খবর দিও। তাকে বলো, তার শত্রু মারা গেছে, আর যে কষ্ট সে আমাকে দিয়েছে তার বিনিময়ে আমি তাকে হত্যা করেছি।"

"তার শত্রু!"

"মেসালা।"

এস্তারের চোখে জল এল। কি যেন বলতেও চাইল। আইরাস বাধা দিল, "না। কারও করুণা বা চোখের জল আমি চাই না। তাকে শেষ কথা জানিয়ে দিও, আমি বুঝেছি যে রোমক হওয়া মানেই পশু হওয়া। বিদায়।"

এস্তার বলল, "আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে যাও। তোমার বিরুদ্ধে তার কোন রাগ নেই। সে তোমার বন্ধু। আমিও তোমার বন্ধু। আমরা খৃস্টান।"

আইরাস সংকল্পে অটল। "না। আমি যা হয়েছি স্বেচ্ছায়ই হয়েছি।"

"কিন্তু তোমার কি কিছুই চাইবার নেই? কিছুই—না?"

মিশরীর মুখটা ঈষৎ নরম হল। ঠোঁটে ফুটল এক টুকরো হাসি। ছেলেমেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু চাইবার আছে।"

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে এস্তার বলল, "এরা তো তোমারই।"

আইরাস এগিয়ে গিয়ে সিংহের চামড়ার উপর নতজানু হয়ে বসল। শিশু

দুটিকে চুমো খেল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তাদের দিকে তাকাল। তারপর একটিও কথা না বলে দ্রুত পায়ে দরজা পার হয়ে চলে গেল। এস্তার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

বেন-হুর পরে সব কথাই শুনল। সে জানত, খৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার দিনেই আইরাস বাবাকে ত্যাগ করে মেসালার কাছে চলে গিয়েছিল। তবু আজ সে তার খোঁজ করতে চেষ্টার ত্রুটি করল না। কিন্তু সব বৃথা। আর কেউ কোন দিন তাকে দেখে নি। ঊর্মিমুখর নীল সমুদ্রের বুকে কত গোপন কথাই তো লুকিয়ে আছে। সমুদ্র যদি কথা বলত তাহলে হয় তো মিশর-কুমারীর খবর জানা যেত।

ইতিমধ্যে বেন-হুরের জীবনে একটি মাত্র দুঃখের ঝড় বয়ে গেছে। তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। বুড়ি আমরাহও তারই পথ চলে গেছে। তবে আজও বেঁচে আছে বৃদ্ধ সাইমনাইডিস। নিরো-র রাজত্বের দশম বর্ষে ব্যবসা থেকে সে সম্পূর্ণ ছুটি নিয়েছে। দেহে ও মনে সক্রিয় থেকে সুখেই আছে।

সেই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে সাইমনাইডিস, বেন-হুর, এস্তার ও ছেলে-মেয়েরা বাড়ির ছাদে বসেছিল। এমন সময় মালুচ এসে একটা দুঃসংবাদ জানাল। আগের দিন একটা জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়েছে। তাতেই খবর এসেছে, রোমে সম্রাট নিরো খৃস্টানদের উপর নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে। সকলেই মর্মাহত হয়ে তাই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তখন মালুচ এগিয়ে এসে বেন-হুরকে একটা খাম দিল।

খাম খুলে চিঠি পড়ে বেন-হুর জিজ্ঞাসা করল, "এটা কে এনেছে ?"

"একটি আরব।"

"সে কোথায় ?"

"চিঠি দিয়েই চলে গেছে।"

বেন-হুর সাইমনাইডিসকে বলল, "শুনুন।"

"মহান ইল্ডেরিম-এর পুত্র ও ইল্ডেরিম জাতির বর্তমান শেখ আমি ইল্ডেরিম লিখছি হুর-পুত্র জুডাকে।

"হে আমার পিতৃবন্ধু, আমার বাবা আপনাকে কত ভালবাসতেন তা তো আপনি জানেন। এই সঙ্গে যে চিঠি পাঠালাম সেটা পড়লে আরও জানতে পারবেন। তার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা; সুতরাং তিনি যা দিয়েছেন তা আপনারই।

"যুদ্ধে তাকে হত্যা করে পার্থিয়ানরা তার কাছ থেকে যা কিছু নিয়েছিল সব আমি পুনরুদ্ধার করেছি—অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে তার মধ্যে ছিল এই চিঠি; আর নিয়েছি প্রতিশোধ।

"আপনার ও আপনাদের সকলের শান্তি কামনা করি।
"মরুভূমি থেকে যে কণ্ঠস্বর যাচ্ছে সে কণ্ঠস্বরের মালিক
শেখ ইল্ডেরিম।"

তার পরে বেন-হুর শুকিয়ে হলুদে হয়ে যাওয়া একটা প্যাপিরাস পাতার পাক খুলল অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সংগে এবং পড়তে লাগল :

"ইল্ডেরিম জাতির শেখ ইল্ডেরিম, উপাধি মহান, লিখছি আমার বংশধরকে।

"পুত্র, যেদিন তোমার অভিষেক হবে সেদিন আমার যা কিছু আছে সে সবই তুমি পাবে, শুধু তাল-বন নামে খ্যাত এণ্টিয়ক-এর সম্পত্তিটা ছাড়া; যে হুর-পুত্র সার্কাস-এ আমাদের জন্য এত বড় গৌরব বহন করে এনেছিল সেই পাবে এণ্টিয়ক-এর সম্পত্তি এবং পাবে চিরকালের জন্য।

"তোমার পিতার অসম্মান করো না।
মহান ইল্ডেরিম, শেখ।"

চিঠি দুটো সাইমনাইডিসকে পড়ে শুনিয়ে বেন-হুর বলল, "আপনি কি বলেন?"

সাইমনাইডিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "হুর-পুত্র, ঈশ্বর তোমার প্রতি খুবই প্রসন্ন। তাঁর কাছে তোমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।" তাই এসব কিছু তাঁর কাজে লাগানোই তোমার কর্তব্য।"

"সে তো আমিও অনেক দিন আগেই স্থির করেছি। কিন্তু কেমন করে তা করব আপনিই বলে দিন।"

সাইমনাইডিস বলল, "মহান শেখের এই উপহারের সংগে সংগেই আজকের জাহাজে খবর এসেছে, সম্রাট নিরো রোমের খৃস্টানদের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করেছে। কিন্তু প্রভুর আলো তো সেখানে জ্বালিয়ে রাখতেই হবে।"

"আপনি বলে দিন, কেমন করে তা করব।"

"বলছি। মাত্র দুটি জিনিসকে রোমকরা—এমন কি নিরোও—পবিত্র বলে মনে করে—মৃতের ছাই এবং সমাধিস্থান। নিরোর রাজধানীতে মাটির উপরে প্রভুর মন্দির যদি তুমি নাও গড়তে পার, তাহলে মন্দির গড় মাটির নীচে, আর সেই মন্দিরকে রোমকদের অপবিত্র হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য খৃস্টধর্মে বিশ্বাসী যাদেরই মৃত্যু হবে সেখানেই তাদের সমাধিস্থ করো।"

বেন-হুর উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বলল, "অতি মহান প্রস্তাব। আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়। যে জাহাজ

আমার ভাইদের নির্যাতনের সংবাদ বয়ে এনেছে সেই জাহাজেই কাল আমি রোম যাত্রা করব।"

"খুব ভাল কথা", সাইমনাইডিস বলল।

"এস্তার, তুমি কি বল ?" বেন-হুর জিজ্ঞাসা করল।

এস্তার তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "খৃস্টের সেবার এই তো শ্রেষ্ঠ পথ। স্বামী, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমাকে সাহায্য করব।"

কোন দিন কোন পাঠক যদি রোম পরিদর্শনে গিয়ে সান সেবাস্টিয়ানো থেকেও প্রাচীন সান কালিস্টোর কাটাকুম্ব্ দেখতে যান, তাহলেই বেন-হুরের সম্পদের পরিণতি দেখতে পাবেন, আর তাকে ধন্যবাদ জানাবেন। সেই প্রকাণ্ড সমাধিস্থান থেকে আবির্ভূত হয়ে খৃস্টধর্ম সীজারদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিল।



ডন কুইকজোট

সার্ভেন্টিস

॥ এক ॥ বই পড়ার বিপদ

অনেক কাল আগের কথা।

স্পেন দেশের লা মাঞ্চা গ্রামে একটি আমুদে লোক বাস করত। তার নাম ছিল কুইকজাডা। তার চোয়ালের হাড়দুটো ছিলো একটা লণ্ঠনের মত মত দেখতে। তাই লোকে তার নাম দিয়েছিলো কুইকজাডা বা লণ্ঠন-মুখো।

এখন ব্যাপার হয়েছে কি, লোকটি কেন কাজকর্ম করত না। দিনরাত বসে বসে কেবল পড়ত যত রাজ্যের রাজা-রাজড়াদের কাহিনী। কোথায় কোন্ রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে উদ্ধার করে আনলো কোন্ বন্দিনী রাজকন্যাকে, কোথাকার কোন্ মহাবীর যুদ্ধ করে হারিয়ে দিলো এক-চক্ষু দানবকে—এমনি ধরনের সব অ্যাডভেঞ্চার আর বীরত্বের কাহিনী নিয়ে কুকইজাডা দিনরাত একেবারে মশগুল হয়ে থাকত।

ফল কি হলো জান? নিত্য তিরিশ দিন ওই সব গল্প-কাহিনী পড়তে পড়তে কুইকজাডার মনে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেলো যে সেও একজন মস্ত বড় বীর পুরুষ। দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে বেড়ানোই তার কাজ। কি খেয়াল হলো, কুইকজাডা একদিন স্থির করে বসলো, সেও দিগ্বিজয়ে বের হবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ঠাকুর্দার বাপের আমলের বর্ম-চর্ম যোগাড় হলো। যোগাড় হলো ঢাল, তলোয়ার, বর্শা। মাথা ঢাকবার জন্য একটা পুরোনো শিরস্ত্রাণও পাওয়া গেলো।

তারপর চাই একটা ঘোড়া, কারণ ঘোড়া না হলে তো আর দিগ্বিজয় করা চলে না। হাড়-জিরজিরে একটা ঘোড়া কুইকজাডার আগে থেকেই ছিলো। ওতেই কাজ চলে যাবে। কেবল একটা জুৎসই নাম চাই। চারদিন ধরে অনেক মাথা খাটিয়ে কুইকজাডা তার ঘোড়ার নাম রাখলো রোজিনান্তে।

সবই তো হলো। কিন্তু—একটা খটকা লাগলো কুইকজাডার মনে—একজন হবু দিগ্বিজয়ী মহাবীরের পক্ষে ওই কুইকজাডা নামটা বড়ই বেখাপ্পা, বড়ই বেমানান লাগছে। কত লোক তার কথা গল্প করবে, কত কবি তার কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করবে; এমন কি ইতিহাস পর্যন্ত লেখা হবে তার নামে। নাঃ, ও লণ্ঠনমুখো কুইকজাডা নাম তাকে পাল্টাতেই হবে। কিন্তু—কি নাম দেওয়া যায়?

আট দিন ধরে আবার চললো ভাবনা। ভাবতে ভাবতে অবশেষে নাম ঠিক হলো, 'মাস্তার বীর ডন কুইকজোট'। হ্যাঁ, একটা নামের মত নাম। বলতে যেমন লম্বা চওড়া, শুনতেও তেমনি গুরু-গম্ভীর। দিগ্বিজয়ী মহাবীরের উপযুক্ত নামই বটে।

নতুন নাম নিয়ে কুইকজাডা তো মহা খুসি। বর্ম-চর্ম এঁটে, ঢাল-সড়কি নিয়ে, রোজিনান্তের পিঠে চেপে জুলাই মাসের এক গরম সকালে ডন কুইকজোট বের হলো দিগ্বিজয়ে।

॥ দুই ॥ মহাবীর-ব্রতে দীক্ষা

পথে নেমেই মনে হলো, তাই তো, এখনও তো কেউ তাকে মন্ত্র পড়ে মহাবীর-ব্রতে দীক্ষা দেয় নি। তাহলে সে কেমন করে দিগ্বিজয়ীর মহান কর্তব্য পালন করবে?

সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হলো যাকগে, পথ চলতে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে তার কাছে দীক্ষাটা নিয়ে নিলেই চলবে।

সারাদিন পথ চলেও কিন্তু জনমানবের সাক্ষাৎ মিললো না। ক্রমে দিন শেষ হয়ে এলো। সন্ধ্যা নামলো। পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ডন কুইকজোট পথের পাশে একটা সরাইখানা দেখতে পেয়ে সেখানেই ঘোড়া থামালো।

সরাইখানার দরজায় তখন বসে ছিলো দুটি মেয়ে। আর যায় কোথায়! ডন কুইকজোট ভাবলো, ওই সরাইখানাটা হচ্ছে একটি সুদৃঢ় দুর্গ আর মেয়ে দুটি হলো দুর্গেশনন্দিনী।

এদিকে তার ওই কিম্ভুতকিমাকার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মেয়ে দুটি একপা দুপা করে ভিতরে চলে যায় দেখে ডন কুইকজোট তার শিরস্ত্রাণের সঙ্গে আঁটা

পিসবোর্ডের চোখ-ঢাকনাটা তুলে সবিনয়ে বলে উঠলো, আপনারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবেন না। কারণ যারা নিরীহ, আমার কাছে তাদের কোন ভয় নেই।

মেয়ে দুটি ফিরে তাকালো। আগন্তুকের অদ্ভুত কথা এবং ততোধিক অদ্ভুত বেশভূষার দিকে ভালো করে চেয়ে হঠাৎ তারা হো-হো করে হেসে উঠলো।

এমন সময় সেখানে হাজির হলো সরাইখানার মালিক। ডন কুইকজোট ভাবলো, ইনি নিশ্চয় এই দুর্গের শাসনকর্তা। ঘোড়া থেকে নেমে সে বললো, দুর্গাধিপতি, আজ রাতে আমি আপনার অতিথি। আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, শুধু দেখবেন আমার এই বলবান রোজিনান্তের যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়।

না, না, আপনি কিছু ভাববেন না,—বলে সরাইওলা হাসতে হাসতে ঘোড়াটাকে নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেলো।

ফিরে এসে দেখে সে এক বিষম কাণ্ড। মেয়ে দুটি সম্মানিত অতিথির সাজ-পোশাক সব খুলে ফেলেছে। কিন্তু পিসবোর্ডের চোখ-ঢাকনাটাকে মাথার শিরস্ত্রাণের সঙ্গে নীল ফিতে দিয়ে এমন জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে যে অনেক টানাটানি করেও তারা সেটাকে কিছুতেই খুলতে পারছে না।

ডন কুইকজোট বললো, থাক, ওটা আর খুলতে হবে না।

একটি মেয়ে বলে উঠলো, বা রে, তাহলে আপনি খাবেন কি করে?

ডন কুইকজোট জবাব দিলো, সে যা হয় এক ব্যবস্থা হবেই। আগে খাবার তো নিয়ে এসো।

খাবার এলো। শক্ত কালো রুটি আর কিছু শুকনো মাছ। কিন্তু খাবে কেমন করে? চোখ-ঢাকনায় যে সারা মুখটাই ঢেকে আছে।

অগত্যা একটি মেয়ে ঢাকনাটা তুলে ধরলো, আর অন্য মেয়েটি পাখির বাচ্চাকে খাওয়ানোর মতো করে তার মুখে খাবার পুরে দিতে লাগলো।

তারপর সরাইওলা নিয়ে এলো একটি ফাঁপা নল। তার এক দিক ডনের মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে অন্য দিক দিয়ে ঢেলে দিতে লাগলো পানীয়। আর সে ঢক্ ঢক্ করে পেট ভরে সেই জল পান করে খাওয়া শেষ করলো।

খাওয়া সেরে ডন কুইকজোট সরাইওলাকে নিয়ে ঢুকলো সেই আস্তাবলে। তারপর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আবেগভরে বললে, হে মহাবীর, আপনি যদি আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ না করেন, তাহলে আমি কিছুতেই এখান থেকে উঠব না।

সরাইওলা হেসে বললো, বেশ তো, বলুন আপনার কি প্রার্থনা?

—এই তো আপনার উপযুক্ত কথা। দেখুন, আমার প্রার্থনা, আপনি

আমাকে মহাবীর-ব্রতে দীক্ষা দিন। আপনার এই দুর্গ-চত্বরে আজ সারা রাত আমি আমার বর্ম-চর্ম অস্ত্রশস্ত্র পাহারা দেব। আর কাল সকালে আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে দীক্ষা দেবেন। তারপর দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে আমি এমন কীর্তি স্থাপন করব যাতে অনাগত ভবিষ্যৎ চিরদিন আমাকে সগৌরবে স্মরণ করবে।

এই সব শুনে সরাইওলার বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, অতিথিটি নিতান্তই মাথা-পাগলা। তাই তাকে নিয়ে একটু মজা করবার জন্য সে ডনের প্রস্তাবে রাজী হলো। তারপর প্রশ্ন করল, আপনার সঙ্গে অর্থাদি আছে তো?

হবু মহাবীর হেসে বললো, এক কপর্দকও নেই। কারণ মহাবীরদের সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকে একথা তো কোন বইতে আমি পড়ি নি।

সরাইওলা বললো, তা পড়েন নি, তার কারণ টাকা-পয়সাটা এত দরকারী জিনিস যে তার কথা লেখা কেউ প্রয়োজনই মনে করেন নি। আসলে প্রচুর টাকা-পয়সা আর ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় তো প্রত্যেক মহাবীরের অবশ্য প্রয়োজন। এমনকি সেগুলিকে বয়ে নেবার জন্য একজন অনুচর পর্যন্ত চাই।

কুইকজোট বিস্মিত হয়ে বললে, তাই নাকি? তাহলে তো এবার বাড়ি ফিরে আমাকে একজন অনুচরও যোগাড় করতে হবে! কি বলেন?

—সে তো নিশ্চয়ই, অনুচর না হলে কি মহাবীরকে মানায়? আচ্ছা, আপনি তাহলে সারারাত অস্ত্রগুলি পাহারা দিন, কাল সকালে আপনার দীক্ষা হবে।

সরাইওলা চলে গেলো। বর্ম-চর্ম অস্ত্রশস্ত্র সব আস্তাবলের জলের চৌবাচ্চার উপরে জড়ো করে রেখে কুইকজোট গম্ভীরভাবে সেগুলি পাহারা দিতে লাগলো।

মাথায় শিরস্ত্রাণ, বাঁ হাতে ঢাল আর ডান হাতে বর্শা নিয়ে কুইকজোট অন্ধকারে একা একা পায়চারি করতে লাগলো। সরাইওলার অন্য লোকরা দূরে থেকে উঁকি মেরে তার কাণ্ডকারখানা দেখে নিঃশব্দে হাসাহাসি করতে লাগলো। কুইকজোটের কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। আপন মনে সে পায়চারি করছে তো করছেই।

প্রায় ঘণ্টা-দুই কেটে গেলো। এমন সময় একটা লোক তার গাধাকে জল খাওয়াবার জন্য সেখানে এসে হাজির হলো। গাধাটাকে একপাশে রেখে যেই সে চৌবাচ্চার উপর থেকে বর্ম-চর্মগুলো সরাতে যাবে, অমনি ডন চোখ পাকিয়ে বর্শা উঁচিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলো, যে হও সে হও, এ-কথা ঠিক জেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহাবীরের এই বর্মে যে হাত দেবে তার মৃত্যু অনিবার্য। অতএব সাবধান।

লোকটি কিন্তু এসব কথার কোন অর্থ না বুঝতে পেরে এগিয়ে গিয়ে বর্ম-চর্মগুলো সরিয়ে রাখতে লাগলো।

আর যাবে কোথায়? ডন তার হাতের বর্শাটাকে দুই হাতে তুলে ধরে লোকটির মাথায় বসালো কষে এক ঘা। লোকটি মাথা ঘুরে পড়ে গেলো। ডন আবার বর্ম-চর্মগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে যথারীতি পাহারা দিতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে আর একটি লোক এলো গাধাকে জল খাওয়াতে। ডন এবার আর কোন কথা না বলে সোজা তার মাথায় বসালো বর্শার ঘা। লোকটির তো মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড! তার চীৎকার শুনে এগিয়ে এলো তার সঙ্গীরা। দুড়দাড় করে জমা হলো সরাইখানার লোকেরা। সবাই এক সঙ্গে ডন কুইকজোটকে গালাগালি করতে লাগলো; কেউ বা ভয় দেখাতে লাগলো মার লাগাবে বলে।

কী, এত বড় কথা! মাণ্ডার বীর ডন কুইকজোটকে মার লাগাবে! ডন খাপ থেকে তলোয়ার খুলে হুংকার দিয়ে এক লাফে এগিয়ে গেলো সকলের সামনে।

চারদিক থেকে সকলে দুমদাম করে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো তাকে লক্ষ্য করে। ডনও নানান কায়দায় ঢাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক হাতে তাদের ঢিল ঠেকাতে লাগলো আর অন্য হাতে তলোয়ার ঘোরাতে লাগলো চরকির মতো। ওদিকে সরাইওলা 'থামো—থামো' বলে চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে।

কিছুক্ষণ চললো এমনি হট্টগোল।

ক্রমে জনতা একে একে সরে পড়লো। কার এত দায় পড়েছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে!

আর ডন কুইকজোটও বিজয়ী বীরের মত এসে দাঁড়ালো চৌবাচ্চার পাশে।

গতিক সুবিধের নয় দেখে সরাইওলা এসে সবিনয়ে সকলের হয়ে ক্ষমা চাইলো। তারপর অনেক হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে ডনকে মহাবীর-ব্রতে দীক্ষা দিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে সরাইখানা থেকে বিদায় করে দিলো।

॥ তিন ॥ দিগ্বিজয়ের প্রথম ধাক্কা

পথে নেমেই ডনের মনে পড়লো সরাইওলার উপদেশ—অর্থ, বস্ত্র, অনুচর

যোগাড় করতে হবে। তাই দিগ্বিজয় আপাতত বন্ধ রেখে ডন রোজিনান্তের মুখ ঘোরাল মাঞ্চার দিকে।

কিছু দূর যেতেই ডন দেখতে পেলো বিপরীত দিক থেকে একদল ঘোড়সোয়ার এগিয়ে আসছে। আসলে তারা একদল ব্যবসায়ী। কিন্তু মহাবীর ডন কুইকজোট মনে ভাবলো অন্য রকম। ঢাল-তলোয়ার আচ্ছা করে বাগিয়ে রোজিনান্তের লাগাম টেনে ধরে সেখানেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর অশ্বারোহীরা কাছে আসতেই গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, হে বিশ্ববাসী, আপনারা অবিলম্বে একবাক্যে স্বীকার করুন যে আমার হবু পত্নী ডালসিনিয়া হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। অন্যথায় আপনাদের আমি আর এক পা-ও অগ্রসর হতে দেব না।

ব্যবসায়ীরা তো কথা শুনে থ! লোকটা বলে কি? তাদের মধ্যে থেকে একজন রসিক লোক বললো, দেখুন বীরবাহু, আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে আপনার হবু পত্নীকে আমরা দেখিনি। দেখলে নিশ্চয়ই আপনার কথা আমরা মেনে নিতাম।

ডন রেগে বললো, দেখা না-দেখার প্রশ্নই ওঠে না। দেখে তারপর বললে আর বাহাদুরি রইলো কি? না দেখে বিশ্বাস করাটাই হলো আসল কথা। আর তা যদি আপনারা না করেন, তাহলে এই মুহূর্তে আমার সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন!

লোকটি হাসি চেপে বললো, আহা-হা আপনি চটছেন কেন? আপনি বরং আপনার হবু পত্নীর একখানি ছবি আমাদের দেখান, তাহলেই আমরা স্বীকার করব যে তিনি পরমা সুন্দরী, তা সে ছবিতে তিনি বাঁকা, ট্যারা, কুঁজো যাই হোন না কেন।

কী? কুঁজো?—গর্জে উঠলো মহাবীর:

আরে দুষ্টমতি,
ডালসিনিয়া কুব্জ তোর চোখে?
জান না কি উর্বশীর প্রায়
সুন্দর সুঠাম দেহ তার—
ন্যুব্জ নহে, কুব্জ নহে, নহে বক্র-চোখ?
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
করেছ যে অন্যায় ভাষণ,
সমুচিত শাস্তি তার পাইবে এখনি!

বর্শা উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো ডন কুইকজোট। সে প্রবল আক্রমণের ফল শেষ পর্যন্ত কি হত কে জানে, মাঝপথে হঠাৎ রোজিনান্তে পড়ে গেলো

পা হড়কে আর বেচারি ডন কুইকজোট আছড়ে পড়লো মাটিতে। তার পা আটকে রইলো পা-দানিতে আর শরীর ঝুলতে লাগলো মাটির দিকে।

তাই না দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো প্রতিপক্ষ দল। রাগে জ্বলতে লাগলো ডনের মন। সেই ঝুলন্ত অবস্থাতেই সে গর্জন করে উঠলো আবার :

আরে আরে পাপিষ্ঠ শয়তান,
শুধু একবার পারিতাম দাঁড়াইতে যদি,
সবাকার মাথা কাটি ফেলিতাম ভূমে।
দেখিছ না মোর ত্রুটি নহে,
বিশ্বাস ভেঙেছে অশ্ব, তাই আমি ঝুলিতেছি হেন?

কথার তুবড়ি ফুটতে লাগলো ডনের মুখে। তাই শুনে ব্যবসায়ীরা হাসতে হাসতে চলে গেলো। কিন্তু তাদের একটি ষণ্ডা-গোছের চাকর ভাবলো, না, লোকটা বড় বাজে বকে, ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

চাকরটি এগিয়ে গিয়ে ডনের বর্শাটাকে ভেঙে দু' টুকরো করলো। তারপর সেই ভাঙা টুকরো দিয়ে তাকে পিটতে লাগলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত। পিটুনির চোটে মহাবীর একেবারে ছাতু হবার যোগাড়।

হাড়-গোড়-ভাঙা অবস্থায় ডন কুইকজোট সেখানেই পড়ে রইলো। ঘোড়ায় চড়া দূরের কথা, নড়ে বসবার শক্তিও তার রইলো না। হায়রে দিগ্বিজয়!

দৈবাৎ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল মাঞ্চার একটি লোক তার গাধা নিয়ে। পথের পাশে ডনকে দেখেই সে চিনতে পারলো। তারপর তাকে গাধায় চড়িয়ে আর ডনের বর্ম-চর্ম, এমন কি ভাঙা বর্শার টুকরোগুলো পর্যন্ত রোজিনান্তের পিঠে চাপিয়ে অনেক কষ্টে ডন কুইকজোটকে নিয়ে তার বাড়িতে হাজির হলো।

॥ চার ॥ হাওয়ার সঙ্গে লড়াই

ডন কুইকজোট শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইলো ঘরে।

এদিকে বাইরের ঘরে সভা বসলো গ্রামবাসীদের। সবাই স্থির করলো, ওই মোটা মোটা বইগুলো পড়েই ডনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কাজেই ডন অসুস্থ থাকতে থাকতেই সব বই পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং লাইব্রেরি-ঘরের দরজা একেবারে দেয়াল তুলে বন্ধ করে দিতে হবে। তাহলে বিছানা ছেড়ে উঠে সে আর বই পড়তে পারবে না। ফলে ওই সব আজগুবি খেয়াল-কল্পনাও তার মাথায় ঢুকবে না।

ব্যাস, উঠোনে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হলো ডন কুইকজোটের সাধের বইগুলো। লাইব্রেরি-ঘরের দরজায় আগাগোড়া তুলে দেওয়া হলো দেয়াল।

ভাল হয়ে বাইরে এসে ডন শুধোলো, আমার লাইব্রেরি গেলো কোথায়?

সবাই বললো, লাইব্রেরি কি আর আছে? হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে।

—তার মানে?

—তুমি যখন বাড়ি ছিলে না, তখন হঠাৎ একদিন এক জাদুকর এসে হাজির হলো মেঘের ভিতর দিয়ে সাপের মাথায় চড়ে। তারপর লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ কি যেন করলো। আর যেই না সে ঘর থেকে বেরুলো, অমনি সারা বাড়ি ধোঁয়ায় ভরে গেলো। ক্রমে যখন ধোঁয়া সরে গেলো তখন দেখি জাদুকর নেই, লাইব্রেরিও নেই। বুঝলে ব্যাপারটা?

না বুঝে আর কি করে বেচারি।

মনের দুঃখ মনে চেপে ডন চুপচাপ কাটিয়ে দিলো পুরো একপক্ষ কাল।

তারপর হঠাৎ একদিন আবার তার পুরোনো বাতিক মাথা চাড়া দিলো।

ঘরের জিনিসপত্তর বেচে কিছু টাকা যোগাড় করলো। কিনলো কিছু নতুন কাপড়। শিরস্ত্রাণটা মেরামত করলো। আর এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে আনলো একটা পুরোনো মরচে-ধরা বর্শা।

দরকারী জিনিস সব ঠিক হলো। এইবার দরকার একজন অনুচর।

মাঞ্চা গ্রামে আর একজন লোক বাস করত। তার নাম সাংকো পাঞ্জা। নাদুস-নুদুস গোবেচারি মানুষ। অনেকগুলো ছেলেপিলে নিয়ে বড় কষ্টে দিন কাটায়।

একদিন ভোর সকালে ডন তার বাড়ি গিয়ে হাজির। বাইরে থেকেই হাঁক দিলো, সাংকো পাঞ্জা বাড়ি আছ হে—সাংকো—

সাংকো বাইরে এলো ডাক শুনে, বলল, আরে, হুজুর যে। বলি, ব্যাপার কি?

ডন বললো, দেখো সাংকো, আমি একজন মহাবীর। কেমন কিনা?

সাংকো মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো, আজ্ঞে, সেই রকমই তো শুনেছি।

—তবেই ভেবে দেখো, এ ভাবে ঘরে বসে থাকা আমার শোভা পায় না।

—আজ্ঞে, তা তো পায়ই না।

—সুতরাং শিগগিরই আমি দিগ্বিজয়ে বের হব।

সাংকো আনন্দে একেবারে হাততালি দিয়ে উঠলো, চমৎকার, চমৎকার। একেবারে যাকে বলে—

তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিলো ডন, আরে চুপ চুপ। সব জানাজানি হয়ে

যাবে যে। এখন আমি যে জন্যে এসেছি তাই শোন। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—ওরে বাবারে, আবার আমি কেন হুজুর?

—দূর বোকা, দিগ্বিজয়ী মহাবীরের একজন অনুচর না হলে কি মানায়? তুমিই বলো?

সাংকো আমতা আমতা করে বললো, আজ্ঞে, তা তো মানায়ই না। কিন্তু হুজুর, আমি আপনার সঙ্গে গেলে আমার ছেলে-মেয়েরা কি খাবে?

এবার খেঁকিয়ে উঠলো ডন, ধুত্তোর ছেলেমেয়ে! তুমি ভারি বোকা হে সাংকো! আরে, তুমি ভুলেই যাচ্ছ যে, আজ থেকে তুমি আমার অনুচর। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রথম যে দেশ আমি জয় করব, তোমাকেই বানিয়ে দেব সে দেশের লাট সাহেব।

সাংকোর তো চক্ষু চড়কগাছ! দুই চোখ গোল গোল করে সে শুধালো, আজ্ঞে—লাট সাহেব?

মুরুব্বিয়ানা সুরে ডন বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, লাট সাহেব। তখন আর তোমার ছেলেমেয়েদের খাবার ভাবনা থাকবে না। বুঝেছ?

—বুঝেছি হুজুর, বুঝেছি।

—বেশ। তাহলে তুমি রাজী কি না তাই বলো?

—আজ্ঞে, একেবারে লাট-বেলাট ব্যাপার যখন, তখন নিশ্চয় রাজী।

—ব্যাস। তবে আর কোন কথাই নেই। তুমি তৈরি হয়ে থেকো। যথাসময়ে তোমাকে আমি খবর দেব। কিন্তু—

একটা খটকা লাগলো ডনের মনে। তাই তো, সাংকো কি চড়ে যাবে তার সঙ্গে? ঘোড়া তো মোটে একটি। তাহলে?

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ঠিক হলো, সাংকো যাবে তার গাধার পিঠে চেপে। ব্যবস্থাটি অবশ্যি সাংকোর খুব মনোমত হলো না। সে বললো, হুজুর, দিগ্বিজয়ী বীরের অনুচর আমি, শেষকালে কিনা একটা গাধায় চেপে—

ডন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি কিছু ভেবো না সাংকো। পথ চলতে প্রথম যে মহাবীরকে আমি সম্মুখ-সংগ্রামে পরাস্ত করব, তার ঘোড়াটাই তোমাকে দিয়ে দেব। কেমন?

—হ্যাঁ হুজুর, সেই ব্যবস্থাই ভাল।

যাত্রার দিন এলো।

পাছে কেউ দেখতে পেয়ে বাধা দেয়, তাই একদিন গভীর রাতে ডন আর সাংকো কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে পথে বের হলো।

শুরু হলো দিগ্বিজয়।

আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে ডন কুইকজোট। তার পিছনে গাধার পিঠে চলেছে সাংকো পাঞ্জা। ডন স্বপ্ন দেখছে বিশ্ব-বিজয়ের, আর সাংকো দেখছে লাটসাহেবির স্বপ্ন।

এমন সময় সাংকো বললো, হুজুর, নিশ্চয় আমার লাটগিরির কথা ভোলেন নি। আপনি দেখে নেবেন হুজুর, লাটগিরিতেও আমি কম পোক্ত নই।

ডন হেসে বললো, আরে না না, ভুলব কেন? অনুচরদের লাটগিরি দেওয়া যে মহাবীরদের অবশ্য কর্তব্য!

সাংকো তখন আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলো, আচ্ছা হুজুর, কপাল-গুণে আমি যদি লাট সাহেব হয়েই যাই, তাহলে আমার স্ত্রী তেরেসা পাঞ্জাও লাট-গিন্নি হবে তো? আর আমার বাচ্চারা সব লাট-পুত্তুর?

ডন হেসে বললো, আরে বোকা, তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? লাটসাহেবের স্ত্রী লাট-গিন্নি আর তার বাচ্চারা সব লাট-পুত্তুর তো হবেই!

সাংকো মিষ্টি হেসে বললো; যাক, তাহলে আর কোন ভাবনা নেই। এবার চলুন।

চলতে চলতে একটা মাঠের সামনে এসে তারা হাজির হলো।

এখন ব্যাপার হয়েছে, কী জান? ওই মাঠে ছিলো অনেকগুলো হাওয়া-কল, প্রায় চল্লিশটা। দূর থেকে অতগুলো হাওয়া-কল দেখেই তো ডন কুইকজোটের মাথা গেলো খারাপ হয়ে। সে বলে উঠলো, বাহবা বাঃ; পথে বেরুতে-না-বেরুতেই যে মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার আয়োজন। সাংকো, দেখতে পাচ্ছ?

সাংকো অবাক হয়ে বললো, কী হুজুর?

—কেন? ওই যে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশ দানব!

সাংকো বাধা দিলো, কিন্তু হুজুর—

একটানে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ডন বলে উঠলো, কোনো ভয় নেই সাংকো, আমার তরবারির আঘাতে একে একে ওই চল্লিশটা দানবই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে।

সাংকো হেসে উঠলো। বললো, দানব কোথায় দেখছেন হুজুর?

ডন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, কেন? তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ওই যে তোমার সামনেই সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় হাত ছড়িয়ে দিয়ে!

কথা শুনে সাংকো তো হেসে খুন, ও হরি! দানব কোথায়, ওগুলো তো হাওয়া-কল হুজুর! আর ও হাতগুলো তো হাওয়া-কলের পাখা। বাতাসে ওই পাখাগুলো ঘোরে আর কল চলতে আরম্ভ করে।

ডন মুখ ভেংচে বললো, কল না হাতি। তুমি দিগ্বিজয়ের কিছুই জান না। আর জানবেই বা কেমন করে, পুথিপত্তর তো আর পড় নি! আমি বলছি, ওগুলো নির্ঘাত দানব। বেশতো, তুমি যদি ভয় পেয়ে থাকো, তবে এখানে বসে বসেই ইষ্টনাম জপ কর। আমি একাই ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসি।

সাংকো বাধা দিয়ে ডাকলো, হুজুর—হুজুর—

কিন্তু কে আর সে ডাক শুনেছে! ডন ততক্ষণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে হাওয়া-কল লক্ষ্য করে।

কাছে গিয়ে রণ-হুংকার দিয়ে সে বলতে লাগলো :

আরে আরে দুষ্ট দানবেরা,
দল বেঁধে রয়েছে দাঁড়ায়ে
ডন কুইকজোটের সাথে যুদ্ধ করিবারে!
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
রণ-আশা মিটাব সবার,
একে একে পাঠাইব শমন-সদনে!

যেমন বলা তেমনি কাজ। বর্শা উঁচিয়ে ডন ঝাঁপিয়ে পড়লো হাওয়া-কলের উপর। অমনি হাওয়া-কলের পাখায় আটকে গেল তার বর্শা। আর সেই ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে অশ্ব ও আরোহী দুই-ই একচক্করে ঘুরে এসে আছড়ে পড়লো মাটিতে।

ছুটে এলো সাংকো, অবশ্য গাধার পিঠে চড়ে যতটা ছোটা সম্ভব। ডন তখন উত্থানশক্তি-রহিত। আস্তে আস্তে তাকে তুলে বসিয়ে সাংকো বললো, হায় হায় হায়, এ কী করলেন হুজুর? কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হাওয়া-কলের পাখার উপর, আর পাখার এক ঝাপটা খেয়ে ছিটকে পড়লেন দশ হাত দূরে! এখন উপায়? হাড়গোড় সব ঠিক আছে তো? হায় হায়রে!

অতি কষ্টে ধমক দিয়ে উঠলো ডন, চুপ কর সাংকো, চুপ করো। অমন গাধার মত চেঁচিও না।

সাংকো বললো, চেঁচাই কি আর সাধে? যে ভাবে পপাত ধরণীতলে হলেন, তাতে কি আর হুজুরের হাড়গোড় সব জায়গামত আছে? আছাড় তো নয়, একেবারে যাকে বলে—

ডন বাধা দিলো, থাম, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। দ্যাখো সাংকো, ব্যথা আমি সত্যি পেয়েছি—খুবই পেয়েছি। কিন্তু সেকথা কি মুখ ফুটে বলতে পারি? আমি একজন দিগ্বিজয়ী মহাবীর! মহাবীররা যুদ্ধে শত্রুর হাতে মার খেয়ে চিঁড়ে-চ্যাপটা হলেও মুখে কখনও টুঁ শব্দটি করে না। বুঝলে তো?

মুখ টিপে হাসতে হাসতে সাংকো বললো, বুঝেছি হুজুর, খুব বুঝেছি। যাকে বলে একেবারে—

আবার ধমকে উঠলো ডন, থাক! এখন আমাকে ধরে ঘোড়ায় তুলে দাও তো! তারপর চলো এগিয়ে।

সেই ভাল হুজুর, সেই ভাল—বলে সাংকো অনেক কষ্টে ডন কুইকজোটকে রোজিনান্তের পিঠে চাপিয়ে দিলো।

দুই বীর আবার চললো এগিয়ে।

॥ পাঁচ ॥ কম্বল-খেলার ঠ্যালা

সন্ধ্যা হয়-হয় দেখে দুজনে একটা সরাইখানায় এসে আশ্রয় নিলো।

সরাইওলা চিলে-কোঠার এক ভাঙা খাটে তাদের শুতে দিলো। তা দিক, সরাইওলার বউ আর মেয়ে বড় ভাল মানুষ। ডনের শরীরের দুর্দশা দেখে তাদের বড় দয়া হলো। তারা খুব যত্ন করে তার শরীরের কাটা ঘা-গুলিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একে-একে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো।

রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকালে আবার তারা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলো। তাদের অদ্ভুত যুগলমূর্তি দেখবার জন্য সরাইখানার দরজায় সবাই ভিড় জমিয়ে ফেললো।

সরাইওলাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে ডন বলল, যদি কেউ কখনও আপনার উপর কোনরূপ অত্যাচার করে তাহলে একবার শুধু মাণ্ডার বীর ডন কুইকজোটকে স্মরণ করবেন। ব্যস, অমনি আমি হাজির হয়ে তার সমুচিত শাস্তিবিধান করব।

সরাইওলা উত্তর দিলো, দেখুন মহাবীরবাহু, অত্যাচারীর শাস্তিবিধান করতে আমি বিলক্ষণ জানি, সে জন্য আপনাকে প্রয়োজন হবে না। তার চেয়ে আমার বেশী প্রয়োজন আপনার টাকার। দয়া করে টাকাটা দিয়ে দিন তো।

ডন সবিস্ময়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললো, টাকা! কিসের টাকা?

সরাইওলা দাঁত খিঁচিয়ে বললো, আপনি আর আপনার অনুচর একটি ঘোড়া এবং একটি গাধা-সহ কাল রাতে যে আমার সরাইখানায় থাকলেন, খেলেন, তার টাকা।

ডন বললো, কী বললেন? এটা সরাইখানা? আমি তো ভেবেছিলাম

এটা একটা দুর্গ আর আপনি স্বয়ং দুর্গাধিপতি। ফুঃ, আপনি একটা সরাইওলা? কিন্তু মশায়, টাকা তো আপনি পাবেন না।

—কেন?

—যেহেতু মহাবীরব্রতে যারা দীক্ষা নেয় তারা কখনও কোথাও থাকা-খাওয়ার জন্য মূল্য দেয় না। জগতের কল্যাণের জন্য তাদের আগমন, আহার-বাসস্থানে তাদের ন্যায্য অধিকার।

চেঁচিয়ে উঠল সরাইওলা, আরে রাখুন আপনার মহাবীরব্রত। ওসব আমি বুঝি না। আমার ন্যায্য পাওনা আমি চাই-ই।

—আপনি একটি মহামূর্খ!—এই কথা বলেই ডন রোজিনান্তের পিঠে চেপে বর্শা উঁচিয়ে তিন লাফে সরাইখানার দরজা পার হয়ে গেলো।

সকলে হৈ-হৈ করে উঠলো। কিন্তু ডনকে ধরতে পারলো না। অগত্যা তারা পাকড়াও করলো সাংকোকে।

সরাইওলা বললো, প্রভু যখন বিদায় হলেন, তখন তুমিই পয়সা দাও।

সাংকোও কমতি যায় না। সে সোজা বলে দিলো, টাকা পয়সার আমি কী জানি? আমি সঙ্গে এসেছি মাত্র।

সরাইওলাও ছাড়বে না, সাংকোও ট্যাঁক খুলবে না। দুই পক্ষে চললো ঝুলোঝুলি।

এমন সময় সেখানে হাজির হলো একদল তাঁতি, মিস্ত্রি আর কসাই। ব্যাপার দেখে তারা খুব মজা পেয়ে গেলো। একজন কোথা থেকে নিয়ে এলো একখানি কম্বল। তারপর কম্বলের চারদিকে চারজনে ধরে সাংকোকে গাধার পিঠ থেকে তুলে এনে ফেলে দিলো সেই কম্বলের মাঝখানে।

তারপর—সাংকোকে নিয়ে সে কী কাণ্ড! কম্বলের চারদিক ধরে জোর ঝাঁকুনি দিয়ে তারা সাংকোকে ছুঁড়ে দেয় শূন্যে। হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সে ধপ করে আবার এসে পড়ে কম্বলের মধ্যে।

সাংকোকে নিয়ে এমন 'শাটল-কক' খেলা চললো অনেকক্ষণ ধরে। তার করুণ চীৎকারে সরাইখানার সবাই সেখানে হাজির হলো।

দূর থেকে ডন কুইকজোটও শুনতে পেলো সে চীৎকার। অনুচরকে এই বিপদে ফেলে তো আর এগনো চলে না। কাজেই জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আবার সে ফিরে এলো সরাইখানায়।

কিন্তু সরাইখানার দরজা বন্ধ। ভিতরে ঢুকবার উপায় নেই।

বাইরে থেকে সে শুধু দেখতে পেলো, জাদুকরের হাতের বলের মতো সাংকো শুধু শূন্যে উঠছে আর পড়ছে। আহা বেচারি!

অনেকক্ষণ সাংকোকে নিয়ে এইভাবে খেলা করে অবশেষে কম্বল-ওয়ালা তাকে তার গাধার পিঠে চাপিয়ে সরাইখানার বাইরে ছেড়ে দিলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে ডনের কাছে এসে সাংকো হঠাৎ একগাল হেসে বলে উঠলো, মেরেছে বড় জব্বর; কিন্তু হুজুর, একটি পয়সাও ওদের আমি দিই নি।

—তাই নাকি? তাহলে তো তুমি খুব বাহাদুর!

গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সাংকো এবার গম্ভীর স্বরে বললো, কিন্তু হুজুর, আর দিগ্বিজয়ে কাজ নেই; ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরে চলুন। বাপরে! যা ধোলাই দিয়েছে কম্বলে চাপিয়ে, এর পরেও যদি এদেশ-ওদেশ ঘুরে বীরত্ব ফলাতে যাই তাহলে আর জানে প্রাণ থাকবে না হুজুর!

ডন বললো, এখন তো চলো, সে পরে দেখা যাবে।

॥ ছয় ॥ বেদনা-বিধুর সিংহ বাহাদুর

অনেক পথ পার হয়ে তারা এগিয়ে চললো।

বিকালের দিকে ডন কুইকজোট দেখলো, সামনের দিকের রাস্তা ধুলোয় একেবারে ঢেকে গেছে। যেন একখানি ধুলোর মেঘ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, ভাগ্য সুপ্রসন্ন সাংকো? আজ যে মহাযুদ্ধে আমি অবতীর্ণ হব, তার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে। দেখতে পাচ্ছ ওই ধুলোর মেঘ? ও কিসের ধুলো জান? জোর কদমে এগিয়ে আসছে একটি বিরাট সৈন্যদল। ও তাদেরই অশ্বক্ষুর-ধুলি, বুঝলে?

কি ভেবে সাংকো বললো, তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাদের পিছনেও যে অমনি ধুলোর মেঘ এগিয়ে আসছে, তার মানে কি?

ডন হেসে জবাব দিলো, তার মানে তো অতি সোজা। এগিয়ে আসছে দুইদল সৈন্য—একদল আসছে অত্যাচার করতে; অপর দল চাইছে আত্মরক্ষা করতে। সম্মুখে বিরাট যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আমি গ্রহণ করব আত্মরক্ষাকারী দুর্বলের পক্ষ। অত্যাচারীর বিনাশই যে আমার সাধনা, আমি মাণ্ডার বীর ডন কুইকজোট! কিন্তু আর তো বিলম্ব করা চলে না! সৈন্যদল একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ওই দ্যাখো, তাদের মাথার লৌহ-শিরস্ত্রাণ দেখা যাচ্ছে, ওই শোনা যাচ্ছে তাদের অশ্বের হ্রেষা, দুন্দুভির নির্ঘোষ।

তোমরা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ যে এ সবই ডনের আজগুবি কল্পনা। আসলে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে আসছিল একদল ভেড়া আর তাদের রক্ষীদল।

তাই সেদিকে চেয়ে সাংকো বললো, মাপ করবেন হুজুর, আমি তো

সৈন্যদলের স-ও দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো চোখে দেখছি একপাল ভেড়া, আর কানে শুনছি তাদের ডাক।

ডন হেসে বললো, আমি বুঝতে পেরেছি সাংকো, তুমি ভয় পেয়েছ। বেশ, তুমি তাহলে এখানেই থাকো, আমি একাই ঝাঁপ দেব এই মহাসমরে!

বলেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। পিছন থেকে বাধা দিয়ে চেঁচাতে লাগলো সাংকো, হুজুর—হুজুর—শুনুন! এমন পাগলামি করবেন না। ওরা সব সৈন্য নয়! ভেড়া—একেবারে যাকে বলে—

কে কার কথা শোনে। ডন তলোয়ার উঁচিয়ে আক্রমণ করলো ভেড়ার দলকে। আর যায় কোথা! ভেড়ার রক্ষীদলও এলো তেড়ে। দুই হাতে তারা সমানে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো ডনকে লক্ষ্য করে। উঃ সে কী ঢিল-বৃষ্টি! ঢিলের চোটে ডনের কপাল গেলো কেটে, নাক গেলো ফেটে। রক্ত ঝরতে লাগলো সারা শরীরে। শেষটায় টাল সামলাতে না পেরে চার হাত পা ছেড়ে দিয়ে ঘাড়-মুখ গুঁজে ডন ঘোড়া থেকে সটান পড়ে গেলো মাটিতে। তারপর গোঙাতে গোঙাতে জ্ঞান হারালো।

ব্যাপার বেগতিক দেখে ভেড়ার রক্ষীরা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চম্পট দিল। তখন চারদিক ফাঁকা দেখে সাংকো সেখানে হাজির হলো তার গাধা নিয়ে। ডনের মাথাটা তুলে ধরে আস্তে আস্তে ডাকলো, হুজুর—হুজুর, ও হুজুর—

চোখ মেললো ডন। অনেক কষ্টে বললো, এ্যাঁ! কে? ও!—সাংকো?

—হ্যাঁ হুজুর, আমি। ব্যাটারা সব পালিয়েছে। আর ভয় নেই। এখন কেমন আছেন?

ডন পাশ ফিরে চারদিক দেখে বললো, আছি ভালই। মহাবীর কি কখনও মন্দ থাকতে পারে?

সাংকো হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলো। ডন শুধোলো, ও কি? তুমি হাসছ যে?

হাসতে হাসতেই সাংকো বললো, জানেন হুজুর, আপনাকে একটা নতুন নাম দিতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার।

ডন বললো, কী নাম?

—আজ্ঞে, মহাবীর বেদনাবিধুর সিংহ বাহাদুর।

—কেন?

—হুজুর, সারাদিন আপনার খাওয়া হয়নি; ঢিলের চোটে মাথা ফেটেছে, দাঁত পড়েছে, পাঁজর ভেঙেছে। এখন আপনার চেহারা যা হয়েছে, একেবারে যাকে বলে মহাবীর বেদনা-বিধুর সিংহ বাহাদুর।

আবার হো-হো করে হেসে উঠলো সাংকো। ডনের মুখ একবার বিরক্তিতে

কুঁচকে গেলো। পর-মুহূর্তে সেও উচ্চতর কণ্ঠে যোগ দিলো সেই হাসিতে বেদনা-বিধুর মুখ হাসিতে ভরে উঠলো।

॥ সাত ॥ রাজকুমারী মিকোমিকোনা

এরপর ঘটলো একটা নতুন ধরনের ব্যাপার।

পথে যেতে যেত ওরা দেখতে পেলো, একদল সশস্ত্র প্রহরী জনকয়েক বন্দীকে হাত-কড়া লাগিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্র-তীরের দিকে।

ডন কুইকজোট প্রহরীদের থামিয়ে বন্দীদের নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো। সব শুনে তার ধারণা হলো, এই দুঃখী লোকগুলোকে এরা অকারণে বেঁধে নিয়ে চলেছে। কিন্তু ডন বেঁচে থাকতে তা তো হতে পারে না। সে প্রহরীদের অনুরোধ করলো বন্দীদের ছেড়ে দিতে। কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই রাজি হলো না। ডন তখন রেগেমেগে বন্দীদের আক্রমণ করলো।

যুদ্ধের ফলাফল এ নিতে কি দাঁড়াত বলা যায় না। কিন্তু ব্যাপার কি হলো জান, প্রহরীরা যখন ডনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে বন্দীরাও হাত-কড়া ভেঙে ফেলে ডনের সঙ্গে যোগ দিলো। আর তাদের মিলিত আক্রমণের তোড় সামলাতে না পেরে প্রহরীরা বেদম মার খেয়ে পালিয়ে গেল।

বন্দীরা তখন ডনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে বললো, হে প্রভু আপনি আমাদের উদ্ধারকর্তা। বলুন, আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি?

ডন গম্ভীর চালে বললো, শুধু একটিমাত্র কাজ আপনাদের করতে হবে। আমার সঙ্গে চলুন আমার হবু বধূ সুন্দরী ডালসিনিয়ার কাছে। সেখানে তাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে আমার এই অপরূপ বীরত্ব-কথা তাকে শুনিয়ে আসবেন।

বন্দীরা কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজি হলো না। ডন যতই তাদের রাজী হতে পীড়াপীড়ি করে, বন্দীরা ততই আপত্তি করে। কথায় কথায় ক্রমে কথা বাড়ে। কথা-কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি। ডন খুললো তলোয়ার। বন্দীরা ছুঁড়লো ঢিল। ঢিলের চোটে ডন চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলো। আর সেই সুযোগে বন্দীরা গেলো পালিয়ে—তাদের যে ভয় রয়েছে, পাছে স্পেন সরকারের সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসে তাদের আবার গ্রেপ্তার করে।

সাংকোর বুকও তখন ঢিপঢিপ করছে সেই একই ভয়ে। তাই তাড়াতাড়ি

তারাও তাদের গাধা-ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলো সিয়েরা মোরেনা পর্বতশ্রেণীর দিকে। সেখানেই দিনকতক লুকিয়ে থাকবে তারা!

সিয়েরা মোরেনার একেবারে মাঝখানে সেবুলে পাহাড়। সেইখানে একটা গুহায় তারা রাতটা কাটিয়ে দিলো। সারাদিনের নানা ঘটনা-অঘটনের ক্লান্তিতে তখন তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন; সেই সুযোগে সেই বন্দীদলের সর্দার এসে সাংকোর গাধাটাকে চুরি করে পালিয়ে গেল।

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সাংকো দেখে, গাধা নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে নাম ধরে গাধাটাকে ডাকতে লাগলো, ড্যাপ্‌লে—ড্যাপ্‌লে—আমার আদরের ড্যাপ্‌লে—

কোন সাড়া নেই। হায় হায় করে সাংকো গলা ছেড়ে কাঁদতে বসলো, ওরে আমার বুকের মাণিক, আমার ঘরে তুই জন্মেছিলি, আমার ছেলেমেয়েরা তোকে কত আদর করত, কত সোহাগ করত আমার বউ, আমার কত বোঝা তুই বয়েছিস এতকাল! ওরে, তোকে নিয়েই তো আমার ঘর-সংসার, আমার আয়-উপার্জন! ওরে আমার ড্যাপ্‌লে রে, তুই কোথায় গেলি রে!

কান্না শুনে বেরিয়ে এলো ডন। অনেক করে বুঝিয়ে, বাড়ি ফিরে তিনটে গাধার বাচ্চা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে সাংকোকে শান্ত করলো।

ঘুরতে ঘুরতে খাড়া পাহাড়ের নীচে একটা ঝরনার পাশে তারা উপস্থিত হলো। সামনে যতদূর চোখ যায়, গাছ-গাছালির সবুজ আবরণ। অনেক দূরে আকাশ এসে মিশেছে তার সঙ্গে।

কেন যেন জায়গাটা বড় ভাল লাগলো ডনের। সেইখানে ধপ করে বসে পড়ে ডন আবেগ-ভরে বলে উঠলো, তুমি ফিরে যাও সাংকো, এইখানে বসে আমি তপস্যা করব সুন্দরী ডালসিনিয়ার জন্য।

সাংকো অনেক বোঝালো, কিন্তু ডন তার প্রতিজ্ঞায় অটল। শেষটায় ডন বললো শোন সাংকো, দুখানা চিঠি আমি তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি যাতে বাড়ি ফিরেই আমার তিনটে গাধার বাচ্চা পেতে পার প্রথম চিঠিতে থাকবে তারই নির্দেশ। আর দ্বিতীয় চিঠিটা লিখব সুন্দরী ডালসিনিয়ার নামে। আমার কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে সে যদি নিজে এসে কোনদিন আমাকে ডাকে, তবেই আমি দেশে ফিরব নতুবা এইখানেই ফেলব আমার শেষ দীর্ঘশ্বাস।

অগত্যা দুখানি চিঠি নিয়ে রোজিনান্তের পিঠে চেপে দেশে ফিরে চললো সাংকো।

ফিরবার পথেই দেখা হয়ে গেলো মাঞ্চা গাঁয়ের পুরুতমশাই আর নাপিত ভায়ার সঙ্গে।

সাংকোর কাছ থেকে সব ব্যাপার জেনে তারা মনে মনে ডনকে দেশে ফিরিয়ে আনবার একটা ফন্দি এঁটে ফেললো।

পুরুতমশাই বললো, যেমন করেই হোক ডনকে দেশে ফিরিয়ে আনতেই হবে। নইলে বেচারি যে সেই নির্জন পাহাড়ে বেঘোরেই মারা যাবে। এস, এক কাজ করি। তিনজন মিলে চলো সেবুলু পাহাড়ে। সেখানে পেঁছে সাংকো বলবে যে, চিঠি পেয়ে সুন্দরী ডালসিনিয়া অবিলম্বে ডনকে তার সংগে দেখা করতে বলেছে। তাহলেই—

সাংকো বাধা দিলো, কিন্তু হুজুর যদি আমার ফাঁকা কথা বিশ্বাস না করেন ?

নাপিত ভায়া বললে, তেমন যদি হয়, আমিই না-হয় তখন এক সুন্দরী রানী সেজে ডনকে বলব আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। ব্যস্, তাহলেই মহাবীর ডন কুইকজোটের তপস্যা ভেঙে যাবে। তখনই সে ছুটে আসবে সংগে। তারপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে নিয়ে হাজির করব একেবারে মাণ্ডায়।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো সাংকো, বলিহারি তোমার বুদ্ধি নাপিত-দাদা। তাই চলো—তাই চলো—

কিন্তু—বরাত ভাল, নাপিত ভায়াকে আর রানী সাজতে হলো না। রানী মিলে গেলো। পথ চলতে চলতে একদল যাত্রীর সংগে তাদের পরিচয় হলো। সেই দলে ছিলেন একটি মহিলা। ডন কুইকজোটের আজগুবি সব খেয়াল-বাতিকের গল্প শুনে কৌতূহলবশে তিনিই সেই বিপন্না রানীর ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি হলেন।

দলবলকে একটু দূরে রেখে সাংকো একাই গিয়ে হাজির হলো তপস্যারত ডনের সামনে। তাকে জানালো সুন্দরী ডালসিনিয়ার অনুরোধ। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। ডন সোজা জবাব দিলো, না না, সুন্দরী ডালসিনিয়া নিজে এসে ডাক না দিলে এই তপস্যার আসন ছেড়ে এক পা-ও আমি নড়বো না।

অগত্যা দ্বিতীয় ফন্দিই কাজে লাগাতে হলো।

মহিলাকে বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে সাংকো আবার গিয়ে হাজির হলো ডনের কাছে। হাতজোড় করে বললো, হুজুর, এই যে সুন্দরীকে দেখছেন আপনার সম্মুখে, ইনি ইথিওপিয়ার অন্তর্ভুক্ত মিকোমিকোন রাজ্যের অধিশ্বরী রাজকুমারী মিকোমিকোনা। বড়ই বিপদে পড়ে ইনি আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন।

ডন মুখ তুলে গম্ভীর গলায় শুধোলো, কী বিপদ ?

মহিলা এবার কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, হে মহাবীর, আপনার অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী শুনে অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আমাকে রক্ষা করুন।

ডন উত্তরে বললো, হে সুন্দরী, বৃথা কাতর হবেন না। আপনার বিপদের

কথা বলুন। আমার দেশের রাজা, আমার দেশ ও আমার বন্ধুবান্ধবের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা ভিন্ন আপনার জন্য আর সব কিছু করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

মহিলা বললেন, আপনি মহানুভব, এ আপনারই যোগ্য কথা। শুনুন বীরবাহু, এক দুষ্ট দানব আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। আপনি নিজ শৌর্য-বলে সেই দানবকে পরাজিত করে আমাকে আমার রাজ্য ফিরিয়ে দিন, এই আমার প্রার্থনা।

ডন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বেশ, আমি প্রস্তুত। মাঞ্চার বীর ডন কুইক-জোট আমি, মহাবীর-ব্রতে দীক্ষা নিয়েছি। বিপন্নের উদ্ধারই তো আমার কাজ। চলুন, কোন পথে যেতে হবে।

মহিলা বললেন, কিন্তু যাবার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমার রাজ্য উদ্ধার করবার আগে আপনি অন্য কোন কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন না এবং আমি যে পথে আপনাকে নিয়ে যাব, বিনা বাক্যব্যয়ে আপনি সেই পথেই যাবেন।

ডন সানন্দে এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। সাংকো তাড়াতাড়ি তাকে বর্ম-চর্ম পরিয়ে ঢাল-তলোয়ারে সাজিয়ে দিলো। তিনজনে নেমে এলো পাহাড় থেকে।

নীচে নামতেই দেখা হলো পুরুতমশাই ও নাপিত ভায়ার সঙ্গে। সকলেই আনন্দে আটখানা।

কুশল প্রশ্নাদির পরে ডন বললো, আমার তো আর সময় নেই ভাই, এখুনি আমাকে রওনা হতে হবে মিকোমিকোনের পথে। চলুন সুন্দরী।

পুরুতমশাই বললো, আরে ভাই, আমরাও যে তোমার সঙ্গে যাব। চলো; এখান থেকে সোজা মাঞ্চা গাঁয়ের ভিতর দিয়ে পৌঁছতে হবে কার্থেজেনা। সেখান থেকে জাহাজে চেপে তবে আমরা পৌঁছব মিকোমিকোন রাজ্যে। চলো—চলো।

ডন কুইকজোট বিনা বাক্যব্যয়ে মাঞ্চার দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলো।

কিছুদূর এগোতেই দেখা গেলো, বেদের মত পোশাক পরা একটা লোক গাধায় চড়ে আসছে। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো সাংকো, আরে—ওই তো সেই ব্যাটা চোরের সর্দার, যে আমার ড্যাপলুকে চুরি করে পালিয়েছিলো! ধরু—ধরু ব্যাটাকে!

সাংকোর চেঁচামেচি শুনে আর এতগুলো লোক দেখে সেই বন্দীদের সর্দারটা গেলো ঘাবড়ে। গাধাটাকে সেইখানে রেখে এক দৌড়ে সে পালিয়ে গেলো পাহাড়ের আড়ালে।

সাংকো আনন্দে লাফাতে লাফাতে গিয়ে ড্যাপলের গলা জড়িয়ে ধরলো। তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো, মুখে চুমো খেলো। তারপর সোহাগ করে

বললো, সোনা আমার, মাণিক আমার, কেমন আছিস তুই ? আমাকে ছেড়ে এতদিন ছিলি কোথায় রে দুষ্টু ?

গাধাটা ঘাড় উঁচু করে ডেকে উঠলো একবার। সকলে হো-হো করে হেসে উঠলো।

॥ আট ॥ অপূর্ব শোভাযাত্রা

রাতটা কাটাবার জন্য সবাই হাজির হলো একটা সরাইখানায়। সেখানে মহিলাটির দেখা হয়ে গেলো তাঁর সংগীদের সঙ্গে। কাজেই তিনি আর মাণ্চা পর্যন্ত যেতে রাজি হলেন না।

মহা বিপদ! তাহলে ডনকে কি করে মাণ্চায় নিয়ে যাওয়া যাবে!

এমন সময় সেই সরাইখানায় হাজির হলো একটি গাড়োয়ান। তার সংগে একটি গাড়ি ও এক জোড়া ষাঁড়।

সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব খেলে গেলো নাপিত ভায়ার মাথায়। পুরুত-মশায়ের কানে কানে কি যেন সে বললো আর অমনি সে হেসে বলে উঠলো, ঠিক আছে।

রাতারাতিই গাড়োয়ান আর তার গাড়ি ভাড়া করা হলো। টুকরো কাঠ দিয়ে তৈরি করা হলো মানুষ-সমান একটা খাঁচা, যোগাড় করা হলো বড় বড় আলখাল্লা আর কিম্ভুতকিমাকার সব মুখোস।

রাত গভীর হলো।

ডন গভীর ঘুমে অচেতন। পুরুতমশাই, নাপিত ভায়া, সাংকো আর গাড়োয়ান সেইসব আলখাল্লা পরে মুখোস এঁটে হাজির হলো ডনের ঘরে। চটপট তাকে কাপড় চাপা দিয়ে বেঁধে ফেললো আষ্টেপৃষ্ঠে। তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে চললো বাইরে।

ঘুম ভেঙে গেলো ডনের।

ওরে বাবা! এরা সব কারা? নিশ্চয়ই এ কোন জাদুকরের কাজ! যত সব ভূত-প্রেত পাঠিয়ে দিয়েছে তার মহাবীর-ব্রতে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে।

কিন্তু কি আর করা যাবে? তার যে একেবারে নট্‌ নড়ন-চড়ন অবস্থা।

ভূত-প্রেতরা তাকে নিয়ে শুইয়ে দিলো খাঁচার মধ্যে। তারপর পেরেক ঠুকে ঠুকে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে খাঁচাশুদ্ধ তাকে চাপিয়ে দিলো গাড়িতে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

এমন সময় ডনের কানে ভেসে এসে এক রহস্যময় গম্ভীর দৈববাণী, হে মহাবীর বেদনা-বিদুর সিংহ বাহাদুর, খাঁচায় বন্দী হয়েছ বলে তুমি দুঃখ করো না। যে মহান ব্রতসাধনে তুমি অগ্রসর হয়েছ তা যাতে অধিক তৎপরতার সংগে সাধিত হতে পারে, তার জন্যই এই বন্দীত্বের প্রয়োজন হয়েছে।

আর হে চির-বিশ্বস্ত অনুচর, তোমার শৌর্যবান প্রভুর এই অবস্থা দেখে তুমি মুসড়ে পড়ো না। সময় হলে তুমি নিজেই দেখতে পাবে, তোমার জন্য কোন্ উচ্চ পদ আর কত অর্থ অপেক্ষা করে আছে। কাজেই তোমার মহান প্রভুকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে তুমি তাঁর অনুগামী হও, কারণ সেখানে তোমরা উভয়েই শান্তিতে ও সুখে থাকতে পারবে। এখন আর এর চেয়ে বেশী কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। অতএব বিদায়।

দৈববাণী শুনে ডন কুইকজোটের সব দুঃখ-দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেলো। খুসি মনে সে খাঁচার ভিতর শুয়ে পড়লো। আর তাকে নিয়ে এগিয়ে চললো এক অদ্ভুত শোভাযাত্রা। খাঁচায় বন্দী মহাবীরকে নিয়ে প্রথমে চলল স-গাড়ি গাড়োয়ান। পুরুতমশাইয়ের ব্যবস্থা-মতো গাড়ির দুপাশে চললো সঙীণধারী পুলিশ প্রহরী। তার পিছনে চললো গাধার সওয়ার সাংকো পাঞ্জা। রোজিনান্তের পিঠের দুদিকে ডনের বর্ম-চর্ম ঢাল-তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে জুড়ে দেওয়া হলো গাধার পিছনে। সকলের শেষে চললো আলখাল্লা-পরা মুখোসধারী পুরুতমশাই আর নাপিত ভায়া।

ছ-দিন ছ-রাত এই ভাবে চলে রবিবার দুপুরে শোভাযাত্রা ঢুকলো মাঞ্চা গাঁয়ে।

মুখে মুখে খবর রটে গেলো। পথের দুপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়লো শিশু-বুড়ো, ছেলে-মেয়ের দল। কি খবর? না, ডন কুইকজোট ফিরে এসেছে খাঁচায় বন্দী হয়ে!

॥ নয় ॥ সিংহের মুখোমুখি

মাসখানেক বেশ ভালয় ভালয় কেটে গেলো।

ইতিমধ্যে ডন কুইকজোট লোকমুখে খবর পেলো যে, আরাগন রাজ্যের সারাগোসা সহরে শীঘ্রই সেণ্ট জর্জের উৎসব উপলক্ষে একটি বড় রকমের সামরিক প্রতিযোগিতা হবে।

অমনই নেচে উঠলো ডনের অ্যাডভেঞ্চার-পাগল মন। কারও বাধা-নিষেধ সে মানলো না। সাংকো পাঞ্জাকে নিয়ে গোপনে যাত্রার আয়োজন শুরু করে

দিলো। আর তিন দিন পরে এক ভর-সন্ধ্যাবেলা সকলের অলক্ষ্যে দুজনে যার যার ঘোড়া আর গাধার পিঠে চেপে বসলো।

সারাগোসার পথে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে তাদের পরিচয় হলো। ভদ্রলোকটির নাম ডন ডিয়েগো। ডন কুইকজোটের দিগ্বিজয়ের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে তিনি সেদিন দুপুরে দুজনকে তাঁর বাড়িতে খাবার নেমন্তন্ন করলেন। ডনও সানন্দে তাতে রাজী হয়ে গেলো।

কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ি পৌঁছবার আগেই ঘটলো এক মজার ব্যাপার। অনেক দূরে একখানা গাড়ি দেখা গেলো। তার মাথায় উড়ছে কয়েকটি ছোট ছোট রাজকীয় নিশান।

আর যায় কোথায়! ডন কুইকজোটের মাথায় অমনি কিলবিল করে উঠলো নতুন অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন। তাড়াতাড়ি সাংকোকে ডেকে সে বললো, সাংকো, শিগগির আমার শিরস্ত্রাণ দাও! এখুনি তৈরী হতে হবে। নিশ্চয় কোন মহাবীর আসছে ওই গাড়িতে। দেখছ না, কেমন নিশান উড়ছে বাতাসে?

গাড়িখানা কাছে এলে দেখা গেলো, গাড়িটা টানছে দুটো খচ্চরে, আর তার উপরে রয়েছে দুটো ভারী খাঁচা। একটা খচ্চরের পিঠে চেপেছে গাড়োয়ান, আর অন্য একটি লোক বসে আছে গাড়ির সামনে।

ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে গেলো ডন। জোর গলায় বললে, আপনারা কে মশাই? এ গাড়ি কার, আর এতে আছেই বা কী? এ নিশানগুলোই বা কিসের?

জবাব দিলো গাড়োয়ান, গাড়িখানি আমার। এই খাঁচার ভিতরে আছে দুটো হিংস্র সিংহ। ওরানের অধিপতি এ দুটোকে উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন স্পেনের মহামান্য নৃপতির দরবারে। সম্প্রতি আমরা সেই দরবারেই চলেছি। আর এ নিশানগুলি তারই নিদর্শন।

ডন শুধালো, সিংহদুটি কি বেশ বড়?

গাড়িতে বসা লোকটি এবার কথা বললো, বড় মানে? একেবারে বৃহত্তম! আজ পর্যন্ত এর চেয়ে বড় সিংহ আফ্রিকা থেকে স্পেনে আসে নি। আমিই এ দুটোর দেখাশুনো করি। জীবনে অনেক সিংহ আমি চরিয়েছি মশাই, কিন্তু এত বড় সিংহ আমি কখনও দেখি নি। নিন, এখন দয়া করে পথ ছেড়ে দিন, আমরা এগোই। তাছাড়া, এঁদের এখনও খাওয়া হয় নি। রাগে দুজনে গরু গরু করছেন। কখন কী বিপদ ঘটিয়ে বসেন ঠিক নেই।

হেসে উঠলো ডন কুইকজোট; বিপদ? মশাই, আপনি আমাকে সিংহের ভয় দেখাচ্ছেন? তাও এই দিবা দ্বিপ্রহরে? বেশ, এই মুহূর্তে আপনি খাঁচার মুখ খুলে সিংহদুটোকে ছেড়ে দিন। তারপর এই খোলা মাঠেই চোখ খুলে দেখুন, মাঞ্চার বীর ডন কুইকজোট কেমন করে হেলায় ওদের পরাভূত করে!

ডনের এই ঘোষণা শুনো সাংকো ডন ডিয়েগোকে মিনতি করে বললো, দোহাই হুজুর, আপনি এখুনি আমার প্রভুকে থামান। নইলে খাঁচার মুখ একবার খুললে আমরা সবাই মরে যে ভূত হয়ে যাব !

ডন ডিয়েগো সবিস্ময়ে বললো, সেকি! তোমার প্রভু কি সত্যিই ওই সিংহদুটোর সঙ্গে লড়াই করবেন ? তিনি কি পাগল ?

সাংকো বললো, আজ্ঞে না, পাগল নন, তবে একটু একরোখা।

ডন ডিয়েগো মহাবীরকে এই হঠকারিতা থেকে বিরত হবার জন্য অনেক অনুরোধ করলো। কিন্তু মহাবীর তখন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মশগুল। সে সোজা জবাব দিলো, আপনি আপনার কাজ করুন গে, আমাকে আমার কাজ করতে দিন।

তারপর বর্শা উঁচিয়ে গাড়ির লোকটির নাকের ডগায় ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, দেখুন, এই মুহূর্তে যদি আমার কথামত খাঁচার দরজা খুলে না দেন, তাহলে আপনাকে আমি ওই গাড়ির সঙ্গে গেঁথে ফেলব।

রকম-সকম দেখে বেচারি গাড়োয়ান হাত জোড় করে বললো, একটু দেরী করুন হুজুর, আমার খচ্চরদুটোকে আগে গাড়ি থেকে খুলে নি।

ডন মৃদু হেসে বললো, বুঝেছি, তোমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ, গাড়ি থেকে খুলে নিয়ে যাও তোমার খচ্চর।

গাড়ির ওপরের লোকটি তখন বললো, আপনারা সবাই সাক্ষী, আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই আমি সিংহ দুটিকে ছেড়ে দিচ্ছি। তা ছাড়া, এর ফলে আমার যদি চাকরি যায়—যাবে তো নিশ্চয়ই,—তাহলে তার জন্যে দায়ী হবেন একমাত্র এই ভদ্রলোক। আচ্ছা, তাহলে আমি খাঁচার দরজা খুলছি। আপনারা শিগগির দূরে চলে যান—নিজেদের বাঁচান।

ডন ডিয়েগো অনেক বোঝালো, সাংকো চোখের জলে অনেক কাকুতি-মিনতি জানালো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ডন সিংহের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াবেই। সবশেষে সে বললো, দ্যাখো সাংকো, এই মহা অভিযানে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমার হবু বধূ ডালসিনিয়াকে তুমি সংবাদটি দিও। ব্যস, আর কিছুই আমার বলবার নেই !

ডন খাড়া হয়ে দাঁড়ালো সিংহের খাঁচার সামনে। ডন ডিয়েগো, গাড়োয়ান ও সাংকো অনেক দূরে গিয়ে ঝোপের আড়াল হতে চোখ পাতলো এই বিরাট দৃশ্য দেখবার জন্যে।

ধীরে ধীরে লোকটি কম্পিত হাতে খাঁচার দরজা খুলে দিলো।

ভিতরে বসে আছে সিংহ মহারাজ। মস্ত শরীর, ঘাড়-ভর্তি হলদে কেশর, আগুন-জ্বলা সোনালি চোখ।

খাঁচা খোলার শব্দে চকিত হয়ে সিংহ মহারাজ উঠে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে

এক পাক ঘুরলো খাঁচার মধ্যে। একটা থাবা বাড়িয়ে দিয়ে শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিলো। খাঁচার মুখের কাছে বসে কয়েকবার হাই তুললো পরম আলস্যভরে। টকটকে লাল মুখের ভিতর থেকে হাতখানেক লম্বা জিবটা বের করে মুখটা একবার চেটে নিলো। তারপর খাঁচার ভিতর থেকে মাথাটা বের করে চারদিকটা একবার দেখলো ভাল করে।

তার চোখের সেই আগুনের ভাঁটার মত দৃষ্টি দেখে পৃথিবীর যে-কোনো মহাবীরের বুকও বুঝি কেঁপে উঠত। কিন্তু ডন কুইকজোট নির্বিকার। সে এক দৃষ্টিতে সিংহটার দিকে তাকিয়েই রইলো। ভাবখানা এই, সিংহটা লাফিয়ে পড়লেই দেবে তাকে ঠাণ্ডা বানিয়ে।

সিংহ মহারাজের কিন্তু সেরকম কোনো বাসনা দেখা গেলো না। মহাবীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করে সে শান্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার খাঁচার মধ্যে শুয়ে পড়লো।

তা দেখে ডন বললো, সে তো হবে না, তুমি শিগগির ওটাকে খুঁচিয়ে বের করে দাও।

লোকটি সভয়ে বললো, ওরে বাপরে, সে আমি পারব না। একবার ওকে রাগিয়ে তুললে সকলের আগে ও আমাকেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু আমি বলি কি, এই সব ঝঞ্ঝাটে আর কাজ কি? আপনি যা করেছেন, যে-কোন বীরশ্রেষ্ঠের পক্ষেই তা গর্বের বিষয়। ওইখানে ছিলো সিংহ মহারাজ, আর এইখানে ছিলেন আপনি। মাঝখানে খোলা ছিলো খাঁচার দরজা। ইচ্ছে করলেই ওটা আপনার উপর লাফিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু ও তা করেনি। কাজে-কাজেই এজন্য লজ্জা যদি কারো প্রাপ্য হয় তো সে ওর। যুদ্ধে আহ্বানকারীর গৌরব তো আপনার অক্ষুণ্ণই রইলো।

ডন বললো, এ কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার যা-কিছু করবার তা তো আমি করেছি। বেশ, তাহলে আপনি খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিন। আর আপনার সঙ্গীকে এখানে ডাকুন। ওদের সবাইকে বলুন আমার কীর্তি-কলাপের কথা। না, থাক, আমিই ওদের দেখাচ্ছি যুদ্ধজয়ের সংকেত।

ডন কী করলো জানো? তার বর্শার মাথায় সাদা রুমালখানা বেঁধে সেটাকে উঁচু করে নাড়তে লাগলো। তাই দেখে প্রথমে ভয়ে ভয়ে, পরে দ্রুত-পায়ে সবাই এগিয়ে এলো।

ব্যাপার দেখে সবাই তো অবাক! গাড়ির লোকটি সবিস্তারে সবই বুঝিয়ে বললো।

ডন তখন মৃদু হেসে বললো, দ্যাখো সাংকো, অনেকটা সময় এদের আমরা এখানে আটকে রেখেছি। অতএব ক্ষতিপূরণ বাবদ তুমি এদের প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দাও।

লোকটি এই অযাচিত দানে সন্তুষ্ট হয়ে ডনকে ধন্যবাদ দিলো। আরও বললো যে, তার এই অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী সে স্পেনের নৃপতিকেও সবিস্তারে বর্ণনা করে শোনাবে।

ডন খুশি হয়ে বলল, সেই সঙ্গে নৃপতিকে একথাও বলবেন যে, মহাবীরদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে আজ হতে আমি নতুন উপাধি গ্রহণ করলাম। 'মহাবীর বেদনাবিদুর সিংহ বাহাদুর'এর বদলে আজ হতে আমার নাম হবে 'মাণ্ডার বীর ডন কুইকজোট, মহাবীর সিংহ-দমন সিংহ বাহাদুর।'

আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে উঠলো ডন কুইকজোট। সবাই যোগ দিলো সে হাসিতে।

॥ দশ ॥ সাংকোর লাটগিরি

এমনি করে ভাল-মন্দ নানা রকম কীর্তি-কলাপের ভিতর দিয়ে ডন কুইকজোট ও সাংকো পাঞ্জার দিন কাটতে লাগলো পথে পথে।

চিরদিন কারও সমান যায় না। দুঃখের পর আসে সুখ, ঝড়ের পরে যেমন আসে শান্ত দিন।

ডন কুইকজোট ও সাংকো পাঞ্জাও একদিন সুখের মুখ দেখতে পেলো। অনেক হাসি-কান্না পার হয়ে তারা আশ্রয় পেলো মস্ত বড় এক জমিদারের বাড়িতে।

জমিদার মহাশয় অমায়িক মানুষ। তেমনি আমুদে তাঁর গিন্নি। লোকের মুখে মুখে ডন কুইকজোট ও সাংকো পাঞ্জার হৈ-হুল্লোড়ের অনেক কথাই তাঁরা শুনেছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন তাদের সঙ্গে দেখাই হয়ে গেলো ডনের। সামান্য কথাবার্তাতেই ডনের খামখেয়ালী মন আর সাংকোর সরল ব্যবহার তাঁদের খুব ভালো লেগে গেলো। এদের দুজনকে নিয়ে বেশ আমোদে দিন কাটানো যাবে—এই ভেবে তাঁরা ডন ও তার সঙ্গীকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেলেন তাঁদের মস্ত বড় প্রাসাদে।

খুব খাতির করে তাদের থাকতে দিলেন প্রাসাদে। দুবেলা রাজভোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। চাকর-বাকরদের উপর কড়া হুকুম দিলেন, ডন কুইকজোটকে তারা যেন একজন আসল মহাবীরের মতই সম্মান করে চলে।

সে এক এলাহি ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। সকাল সন্ধ্যায় কুর্নিশ, পাইক-পেয়াদার ঠেলাঠেলি। উঠতে হুজুর, বসতে হুজুর। মুখ খুলতে না খুলতেই হুকুম তামিল।

ডন তো মহা খুশি। সাংকোর দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসে আর বলে, কী হে সাংকো, এখন কেমন বুঝছ?

সাংকো জোড়হাত করে বলে, সত্যি হুজুর, বেড়ালের ভাগ্যে এবার শিকে ছিঁড়েছে। আপনি হুজুর সত্যি-সত্যি মহাবীর সিংহ-দমন সিংহ বাহাদুর।

কথায় কথায় সাংকো একদিন তার লাট সাহেব হবার বাসনাটা জমিদার মহাশয়কে জানালো।

জমিদার মহাশয় একবার চাইলেন গিন্নির দিকে। গিন্নিও চোখ টিপে হাসলেন। তাই দেখে জমিদার মহাশয় মুখের হাসি চেপে গম্ভীর গলায় বললেন, তার জন্য ভাবনা কী সাংকো। আমার জমিদারিতেই একটা লাট সাহেবী এখন খালি আছে। সেখানেই তোমাকে পাঠিয়ে দেব লাট সাহেব বানিয়ে।

খবর শুনে সাংকো তো ভারি খুসি।

জমিদার-গিন্নি শুধোলেন, কিন্তু সাংকো, লাট সাহেব হয়ে তুমি বেশ ভাল ভাবে প্রজা-শাসন করতে পারবে তো?

একগাল হেসে সাংকো বললো, সে আপনি দেখে নেবেন রানীমা, সে আমি ঠিক পারব। কেন পারব না? যে ভাল তাকে নেব বুকে তুলে, আর যে মন্দ তার জন্যে আছে এই পা আর পয়জার। আর আমার পিছনে যে লাগবে তাকে বুঝিয়ে দেব মজা।

শুভদিনে শুভক্ষণে সাংকো তো রওনা হলো নকল লাটসাহেবীতে। পরনে জরির পোশাক, মাথায় ইয়া পাগড়ি, খচ্চর-বাহন। পিছনে পিছনে চললো তার বড় আদরের গাধা ড্যাপল। তাকেও পরানো হয়েছে সিল্কের পোশাক। সাংকো পথ চলে, আর ফিরে ফিরে চায়। আহা! ড্যাপলকে আজ কী সুন্দরই না মানিয়েছে!

সাংকো তো সদলবলে হাজির হলো নতুন দেশে।

এদিকে জমিদার মহাশয়ের আদেশে আগে থেকে সব ব্যবস্থাই করা ছিলো। সাংকো পৌঁছনোমাত্রই পাত্রমিত্র সভাসদরা সব সসম্ভ্রমে তাকে অভিবাদন জানালো। তারপর নিয়ে গেল গির্জায়। সেখানে ঘণ্টা বাজিয়ে জয়ধ্বনি করে তার হাতে দিলো শহরের চাবি। সাংকোকে লাট সাহেবের পদে বরণ করা হলো

পরদিন বসলো বিচার-সভা।

বিচার-কক্ষে ঢুকেই সাংকো দেখতে পেলো, তার আসনের ঠিক পিছনেই দেয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে:

"আজ অমুক মাসের অমুক তারিখে সিনর ডন সাংকো পাঞ্জা এই দ্বীপের অধিকারী হলেন। তাঁর রাজত্ব দীর্ঘজীবী হোক।"

দেখেই সাংকো বলে উঠলো, না তো, আমার বাপ-ঠাকুর্দা কারুর নামের আগে ডন-ফন তো কিছু ছিলো না। আমারও নেই। আমার সোজা নাম সাংকো পাঞ্জা। বুঝলে তো?

সকলে ঘাড় নাড়লো।

তারপর বিচার।

বিচার-প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালো একজন দর্জি আর একটি লোক।

দর্জি হাতজোড় করে বলতে লাগলো, দেখুন হুজুর, এই লোকটি দিন-কয়েক আগে এক টুকরো কাপড় নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এই কাপড়ে একটা টুপি হবে কি না। আমি বললাম, হবে। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করলো, এই কাপড়ে দুটো টুপি হবে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, তাও হবে। এমনি করে ক্রমে তিনটি, চারটি, এমনকি পাঁচটি টুপি সেই কাপড়ে হবে কি না জিজ্ঞেস করায় আমিও বলেছি হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। তখন লোকটি পাঁচটি টুপির অর্ডার দিয়ে যায়। আমিও পাঁচটিই তৈরি করেছি। কিন্তু হুজুর, এখন এই লোকটি বড়ই গোলমাল করছে। এখন এ টুপির মজুরি তো দেবেই না, উল্টে বলছে—হয় আমার কাপড় ফেরৎ দাও, নয়তো তার দাম দাও।

লাট সাহেব সাংকো শুধালো, আচ্ছা ভাই, এর কথা কি সত্যি?

লোকটি বললো, সত্যি হুজুর। কিন্তু আপনি ওকে সেই টুপি পাঁচটা একবার সবাইকে দেখাতে বলুন।

লাট সাহেবের কথা মত দর্জি পকেট থেকে তার বাঁ হাতখানি বের করলো। ও হরি! হাতের পাঁচ আঙুলের মাথায় বসানো রয়েছে পাঁচটি খেলনা-টুপি। সভাশুদ্ধ সবাই তো হেসেই অস্থির।

দর্জি সবিনয়ে বললো, হুজুর, ওর কথা মতোই আমি পাঁচটা টুপি তৈরি করেছি। ঈশ্বরের দোহাই, একসুতো কাপড়ও আমি চুরি করি নি।

নতুন লাট সাহেব একটু ভাবলো। তারপর রায় দিলো, দ্যাখো, এ মামলার একটা আপোষ মীমাংসা হওয়াই ভালো। আমি বলি, দর্জি যে কাজ করেছে তার জন্য কোন মজুরি সে পাবে না। আর এই লোকটিও পাবে না তার কাপড়ের দাম। ব্যস, তাহলেই তো সব ল্যাঠা চুকে গেলো। কি বলো তোমরা?

সবাই খুসি মনে বিচার মেনে নিলো।

ঠিক সেই সময়েই আরও দুজন লোক এসে হাজির হলো। দুজনেই বয়স্ক। একজনের হাতে একখানি মোটা লাঠি।

যার হাতে লাঠি নেই সে অভিযোগ করলো যে, কিছুদিন আগে লাঠিধারী লোকটি তার কাছ থেকে দশ মোহর ধার নেয়। কথা ছিলো, চাইবামাত্রই

মোহরগুলি সে ফেরৎ দেবে। এখন মোহর ফেরৎ চাইতে সে বলছে যে মোহরগুলি সে আগেই ফেরৎ দিয়ে দিয়েছে। এখন মুস্কিল হয়েছে এই যে, দেওয়া বা নেওয়া কোনটারই কোনো দলিল বা সাক্ষী নেই। অগত্যা অভিযোগকারী হুজুরের নিকট এই প্রার্থনা জানায় যে, এই লোকটি হুজুরের সামনে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলুক যে সে মোহরগুলি ফেরৎ দিয়েছে। ব্যস, তাহলেই সে তাকে ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেবে।

লাট সাহেব বললো, লাঠি-হাতে-বুড়োকর্তা, এ ব্যাপারে তুমি কি বলতে চাও বলো।

বুড়ো বললো, হুজুর, আপনার হাতের ওই ন্যায়দণ্ড আমাকে দিন। ওই ন্যায়দণ্ড স্পর্শ করেই আমি শপথ করছি যে, এই লোকটির ঋণ আমি শোধ করেছি।

সাংকো হাতের ন্যায়দণ্ড বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। বুড়ো লোকটি তাড়াতাড়ি তার নিজের হাতের লাঠিটা অভিযোগকারীর হাতে দিয়ে ন্যায়দণ্ডটি হাতে নিলো। তারপর শপথ করে বললো যে, নিজের হাতে সে তাকে মোহরগুলি ফেরৎ দিয়েছে।

বেচারি অভিযোগকারী আর কী করে! সেই শপথই সে মেনে নিলো। বুড়ো তখন তার লাঠিখানা ফেরৎ নিয়ে লাট সাহেবকে সেলাম ঠুকে লাঠি ঠকঠকিয়ে বিচার-কক্ষ থেকে চলে গেলো।

সাংকো ঝিম হয়ে বসে রইলো মাথায় হাত দিয়ে। তারপর হঠাৎ কি মনে করে লাঠি-হাতে বুড়োটিকে আবার ডেকে পাঠালো।

লোকটি ফিরে আসতেই সাংকো বললো, দেখি বুড়োকর্তা তোমার লাঠিটা।

লাঠিটা নিয়ে সাংকো অভিযোগকারীর হাতে দিলো। বললো, এইবার ভাই তুমি খুসি মনে বাড়ি যাও। কারণ এবার সত্যি-সত্যি তোমার পাওনা তুমি পেয়ে গেলে।

লোকটি তো অবাক! লাট সাহেবের কি মাথা খারাপ নাকি? সে বলে উঠলো, সে কি হুজুর? এই লাঠিটা আমার দশ মোহরের সমান হলো?

লাট সাহেব বললো, নিশ্চয় হলো। তা যদি না হয় তাহলে বুঝব, লাট সাহেবি করা আমার কর্ম নয়, আমার মাথার আছে শুধু গোবর।

বলেই সাংকো লাঠিখানা হাতে নিয়ে পটাস করে ভেঙে দুটুকরো করে ফেললো।

অবাক কাণ্ড!

সেই ভাঙা লাঠির ভিতর থেকে বের হলো দশটি মোহর!

সাংকোর বুদ্ধি দেখে সভার লোক সব ধন্য-ধন্য করে উঠলো। তারা

বলতে লাগলো, আমাদের নতুন লাট সাহেব বুদ্ধিতে একেবারে দ্বিতীয় সলোমন।

কিন্তু সাংকোর যত বিপদ হলো খেতে বসে।

টেবিলে থরে থরে সাজানো সব খাবার। যত দেখে সাংকোর চোখ তত গোল হয়ে উঠে, জিব ভরে আসে জলে।

ভয়ে ভয়ে যেই একটা মনের মত খাবার হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে, অমনি—

একপাশে চুপচাপ বসে আছে—লোকটা কে? লম্বা মুখ, হাতে লাঠি?

লাঠি উঁচিয়ে সে বললো সবিনয়ে, উঁ-হুঁ-হুঁ, ওটা খাবেন না হুজুর। বাবুর্চি, এটা নিয়ে যাও।

বাবুর্চি এসে নিয়ে গেলো সে খাবারটা।

লোকটা লাট সাহেবের চিকিৎসক। খাবার তদারক করাই তার কাজ। পাছে অতিভোজনের ফলে লাট সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই এই ব্যবস্থা।

লাট সাহেব ফল খেতে পাবেন না, ওতে অ্যাসিড বড় বেশি। মাংস খেতে পাবেন না, গুরুপাক—ওটা খেতে পাবেন না, লঘুপাক।

তাহলে লাট সাহেব খাবেনটা কী? কী খেয়ে তিনি বাঁচবেন?

রেগেমেগে সাংকো খাদ্য-চিকিৎসককে তাড়িয়ে দিলো লাট-ভবন থেকে।

ভালই কাটছিলো সাংকোর নকল লাটগিরির দিনগুলি।

কিন্তু একদিন রাতের এক হাঙ্গামায় সব গেলো ভেস্তে।

অনেক রাত।

পাখির পালকের নরম গদিতে শুয়ে সাংকো গভীর ঘুমে অচেতন। এমন সময়—

হঠাৎ তীব্রস্বরে বেজে উঠলো বিপদ-ঘণ্টা। বেজে উঠলো ভেরী, তুরী, ঢাক, ঢোল, জগঝম্প।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলো সাংকো। দরজা খুলে বের হতেই দেখে, পাত্র-মিত্র সভাসদরা সব ছুটে আসছে। তাদের এক হাতে মশাল, অন্য হাতে খোলা তলোয়ার।

কী ব্যাপার?

লোকজনরা সব চীৎকার করে বলে উঠলো, অস্ত্র নিন হুজুর, শিগগির অস্ত্র নিন। প্রাসাদ-দ্বারে শত্রু উপস্থিত। আপনি হোন আমাদের বীর সেনাপতি, পরিচালিত করুন জয়যাত্রার পথে।

ওরে বাপরে! যুদ্ধ? তবেই হয়েছে!

সাংকো সভয়ে বললো, যুদ্ধ করতে তো আমি জানি না! সে জানেন আমার হুজুর ডন কুইকজোট। তোমরা বরং—

কিন্তু লোকজনের হৈ-হল্লায় সাংকোর গলা আর শোনা গেলো না। কলরব করতে করতে সবাই মিলে জোর করে সাংকোকে রণ-সাজে সাজিয়ে দিলো। দুটো ভারী ভারী লোহার ঢাল এনে বেঁধে দিলো সাংকোর বুকে আর পিঠে। ফলে উপরে মাথা, দুপাশে দুখানি হাত আর নীচে পায়ের পাতা ছাড়া তার সারা শরীর ঢেকে গেলো। সাংকোকে দেখতে হলো ঠিক যেন খোলে ঢাকা একটি কচ্ছপ!

কোথা হতে একজন তার হাতে এনে দিলো একটা লম্বা বর্শা। তারপর সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, এইবার চলুন যুদ্ধযাত্রায়।

প্রায় কেঁদে ফেললো সাংকো, যুদ্ধযাত্রা! কেমন করে আমি যুদ্ধযাত্রা করব? তোমরা যে আমাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছ! আমি যে স্যান্ডউইচ বনে গেছি! হায় হায়, এ কী হলো? আমি যে নিঃশ্বাস নিতেই পারছি না! দুই ঢালের চাপে আমার যে দম আটকে আসছে! কিন্তু কে তার কথা শোনে! সবাই মিলে তাকে ঠেলে দিলো সামনের দিকে। আর টাল সামলাতে না পেরে সাংকো সশব্দে পড়ে গেলো সিঁড়ির কাছে।

ওদিকে বাইরের কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে। মার-মার কাট-কাট শব্দে কানে তালা লাগবার জোগাড়।

এই হট্টগোলের মধ্যে আবার নিভে গেলো সবগুলো মশাল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে সে এক নরককুন্ড ব্যাপার। চীৎকার করতে করতে সবাই সাংকোকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলো। পায়ের চাপে সাংকোর প্রাণ যায় আর কি! ভাগ্যিস বড় বড় দুটো লোহার ঢাল দিয়ে শরীরটা ঢাকা ছিলো তাই রক্ষে, নইলে এতক্ষণে চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যেত।

মনের দুঃখে সাংকো উপুড় হয়ে পড়ে বলতে লাগলো, উঃ, একবার কোনমতে এই অলক্ষুনে দ্বীপ থেকে চলে যেতে পারতাম, জীবনে তাহলে আর এখানে আসতাম না। বাপ রে! মাথায় থাক আমার লাটগিরি, এখন ধড়ে প্রাণটা থাকলে বাঁচি!

এমন সময় বাইরে সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল, জয়—সিনর ডন সাংকো পাঞ্জার জয়!

পাত্র-মিত্র-সভাসদ সবাই এসে হাজির হলো। তারা বললো: হুজুর, শত্রুরা সব পালিয়েছে। আমাদের জয় হয়েছে। এবার উঠে বসুন।

সাংকো হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, জয়-বিজয় বুঝি না বাপু, আগে আমাকে একটু তুলে ধরো।

তাড়াতাড়ি সাংকোর বুক-পিঠের ঢাল দুটি খুলে দেওয়া হলো। তারপর যেই ধরাধরি করে তাকে বসিয়ে দেওয়া হলো বিছানায়, অমনি সাংকো মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

ব্যাপার দেখে লোকগুলোর তো চক্ষু চড়কগাছ! তারা চেয়েছিলো সাংকোকে নিয়ে একটু নির্দোষ আহ্লাদ করতে। সে ব্যাপার যে এমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে তা তো তারা ভাবে নি! এখন উপায়? জমিদার মহাশয় জানলে কী বলবেন?

যাহোক, ব্যাপার বেশী দূর গড়ালো না। একটু পরেই সাংকো চোখ মেলে চাইলো। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, এখন কটা বাজে?

একজন জবাব দিলো, আজ্ঞে, ভোর হয়ে এলো হুজুর।

ম্লান হেসে সাংকো শুধু একটি কথা বললো, হুজুরই বটে!

তারপর কাঁপতে কাঁপতে বিছানা থেকে উঠে সে নিজের জামা-কাপড় পরে নিলো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকলো আস্তাবলে। সেখানে তার আদরের বাহন ড্যাপলের গলা জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খেয়ে আদর করে বলতে লাগলো, আমার সকল দুঃখ-বেদনার চিরসাথী, কাছে এস বন্ধু। যতদিন তুমি আর আমি ছিলাম সাথী, যতদিন তোমার যত্ন-আদর করাই ছিলো আমার একমাত্র কাজ, ততদিন কী সুখেই না আমি ছিলাম! তারপর যেদিন তোমাকে ছেড়ে মূর্খের মত লাট-বেলাটের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম, সেইদিন থেকেই কপালে জুটেছে কেবল দুঃখ আর দুর্দশা। কিন্তু আর ভুল করব না বন্ধু। চলো, এবার আমরা ফিরে যাই!

গাধার পিঠে চেপে বসলো সাংকো।

পাত্র-মিত্র-সভাসদ সবাই এসে ততক্ষণে জড়ো হয়েছে আস্তাবলের সামনে। তাদের উদ্দেশ্য করে সাংকো বললো, এইবার আপনারা আমাকে বিদায় দিন। আবার আমি ফিরে যাই আমার নিজের জায়গায়। ফিরে যাই বন্ধন থেকে মুক্তিতে, মৃত্যু থেকে জীবনের পথে। এবার আমি বুঝতে পেরেছি, লাটগিরি আমার জন্যে নয়। আমার কাজ জমি চাষ করা আর ফসল কাটা। কথায় বলে, যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। আমারও হয়েছে তাই। তাই এবার আমি ফিরে চললাম। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। আর জমিদার মহাশয়কে দয়া করে আপনারা জানিয়ে দেবেন যে, খালি হাতে আমি এসেছিলাম, খালি হাতেই ফিরে যাচ্ছি। দুদিনের লাটগিরিতে আমার লাভও নেই, লোকসানও নেই।

সমবেত সকলেরই চোখ উঠলো ছলছলিয়ে। বার বার তারা সাংকোকে থেকে যেতে অনুরোধ জানালো। কিন্তু সাংকো রাজী হলো না কিছুতেই। জমিদার মহাশয়ের প্রাসাদের দিকে ড্যাপলের মুখ ঘুরিয়ে দিলো।

॥ এগারো ॥ নকল বীরের ভেল্কি

এদিকে জমিদার বাড়িতে রাজার হালে থেকেও ডন কুইকজোটের মনে সুখ নেই। মহাবীর কি কখনও এমন চুপচাপ বসে থাকতে পারে? নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ঠিক সেই সময়েই ফিরে এলো সাংকো পাঞ্জা। অতএব আর দেরী নয়। জমিদার মহাশয় ও তাঁর গিন্নিকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তারা আবার যাত্রা শুরু করলো সারাগোসা সহরের দিকে।

পথে বার্সিলোনা সহরের এক ভদ্রলোকের বাড়িতে তারা দিন কয়েকের জন্য অতিথি হলো। আর সেখানেই একদিন এমন একটা কাণ্ড ঘটলো যার ফলে ডন কুইকজোটের জীবনের গতিই গেলো পাল্টে।

সেদিন খুব ভোরে রোজিনান্তের পিঠে চেপে ডন গেলো সাগর তীরে হাওয়া খেতে। ঘুরতে ঘুরতে সে দেখতে পেলো, আর একজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎ-গতিতে সেই দিকেই ছুটে আসছে। তার পা থেকে মাথা অবধি লোহার বর্মে ঢাকা। ঢালের ওপর আঁকা মস্ত বড় একটা সাদা চাঁদ।

নবাগত মহাবীর কাছে এসেই চীৎকার করে বলে উঠলো: হে বিশ্ববিখ্যাত মাণ্ডার বীর ডন কুইকজোট, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আমার নাম মহাবীর চন্দ্রকেতন। আমি এসেছি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। শুধু তাই নয়, আমি আপনাকে স্বীকার করতে বাধ্য করব যে আমার হবু বধূ (তা সে যেই হোক) আপনার ডালসিনিয়ার চেয়ে দশগুণ বেশী সুন্দরী। বলুন আপনি যুদ্ধ করতে রাজী কি না?

ডন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, নিশ্চয় রাজী।

নবাগত আবার বললো, কিন্তু এ যুদ্ধ হবে এক শর্তে। যদি যুদ্ধে আপনি পরাজিত হন, তাহলে অস্ত্র-শস্ত্র বর্ম-চর্ম পরিত্যাগ করে আজীবন আপনাকে বিশ্রাম করতে হবে নিজের বাড়িতে। ভবিষ্যতে আর কখনও কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে আপনি লিপ্ত হতে পারবেন না। আর যদি আমি পরাজিত হই তাহলে আমি, আমার অশ্ব, আমার অস্ত্র-শস্ত্র সবই হবে আপনার। এখন চটপট আমার কথার জবাব দিন। এই দণ্ডেই আমি এ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই।

ডন একটু ভেবে জবাব দিলো, মহাবীর চন্দ্রকেতন, আপনার এ প্রস্তাব বড়ই বিস্ময়কর। তবু প্রস্তাব যখন আপনি করেছেন, আমি সানন্দে তা মেনে নিলাম।

হাঁক-ডাক শুনে ভিড় জমে গেলো সাগর তীরে। সবাই দাঁড়িয়ে গেলো এই আজব লড়াই দেখতে। ডন যে ভদ্রলোকের বাড়ি অতিথি হয়েছিলো, খবর পেয়ে তিনিও সেখানে হাজির হলেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।

হাড়-জিরজিরে রোজিনান্তের উঠতে বসতে ছ-মাস। আর নবাগতের ঘোড়াটি তাজা জোয়ান। ফলে নবাগত তিন লাফে এগিয়ে এসে এমন জোরে আঘাত করলো ডন কুইকজোটকে যে ঘোড়া নিয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মাটিতে। আর সেই মুহূর্তে মহাবীর চন্দ্রকেতন ঘোড়া থেকে নেমে ডনের বুকের ওপর চেপে বসলো, আর তার বর্শার তীক্ষ্ম মুখ ডনের গলায় ছুঁইয়ে বললো, এইবার আপনি পরাজয় স্বীকার করুন মহাবীর ডন কুইকজোট। এই মুহূর্তে যাত্রা করুন নিজের গ্রামে। নতুবা আমার বর্শার একটু চাপ দিলেই আপনার জীবনান্ত হবে।

ডন তখন উত্থান-শক্তি-রহিত। মুখ-ঢাকা শিরস্ত্রাণের ভিতর থেকেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আমার জীবন এখন আপনার হাতে, এ কথা ঠিক। কিন্তু মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়েও আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী হচ্ছেন ডালসিনিয়া, আর দুর্ভাগ্যতম মহাবীর হচ্ছি আমি। এ কথা ঘোষণা করলে যদি আমার মৃত্যু হয় তো হোক,—আমার জীবনান্তই হোক। মান যখন গেলো তখন প্রাণ নিয়ে আর কী করব ?

নবাগত মহাবীর এবার সুর নরম করলো। অনুরোধ করে বললো, কিন্তু সিনর ডন কুইকজোট, আমি চাই যে আপনি বেঁচে থাকুন, বেঁচে থাকুক আপনার গৌরব, আর বেঁচে থাকুক সুন্দরী ডালসিনিয়ার সৌন্দর্যের খ্যাতি। সত্যি বলছি, আপনার প্রাণ আমি চাই না। তাছাড়া যুদ্ধের শর্ত অনুসারে এই মুহূর্তে আপনাকে মাঞ্চা গ্রামে ফিরে যেতে হবেই। উঠুন, আর তিলমাত্র বিলম্ব করবেন না।

অগত্যা ডন কুইকজোট সেই প্রস্তাবেই রাজী হলো। বললো, বেশ, তাই হোক। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। তারপর সত্য ভঙ্গ করে আর লজ্জা বাড়াব না। সাংকো পাঞ্জা—

সাংকো পাঞ্জা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো। এগিয়ে এসে বললো, আজ্ঞা করুন হুজুর—

ডন বললো, আমাকে তুলে ধর সাংকো। আমাকে নিয়ে চলো মাঞ্চায়।

সাংকো বললো, কিন্তু হুজুর, আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে এক্ষুনি মাঞ্চায় রওনা হওয়া তো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তার চেয়ে এই সহরেই আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম করবে চলুন। তারপর মাঞ্চা যাবার ব্যবস্থা করা যাবে।

ডন বললো, তবে তাই চলো।

সাংকো পাঞ্জা লোকজনের সাহায্যে ধরাধরি করে ডন কুইকজোটকে সহরের দিকে নিয়ে চললো। নবাগত মহাবীরও সমবেত সকলকে অভিবাদন জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো সহরের অপর দিকে।

সমবেত জনতার মধ্যে একজনের ভারি কৌতূহল হলো যে, এই মহাবীর চন্দ্রকেতন লোকটি কে। এর আগে তো কখনও এর নাম শোনা যায় নি! কে এই ছদ্মনামধারী অশ্বারোহী? সেও ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো মহাবীর চন্দ্রকেতনকে লক্ষ্য করে।

সহরের প্রান্তে একটি সরাইখানায় এসে নামলো নবাগত মহাবীর। লোকটিও তার কাছে গিয়ে সবিনয়ে জানতে চাইলো তার পরিচয়।

মৃদু হেসে নবাগত বললো, আপনাকে তাহলে খুলেই বলি সব কথা। আমি মশাই মহাবীর-টির নই। আমার নাম স্যামসন কারাস্কো। মাঞ্চা গাঁয়েই আমার বাড়ি। গাঁয়ের লোকেরা কুইকজাডাকে খুবই ভালবাসে, তাই ওর এইসব পাগলামি কাণ্ড-কারখানার কথা শুনে সবাই ভারি দুঃখ পায়। তাই সবাই মিলে আমাকে পাঠিয়েছে কোনরকম ফন্দি-ফিকির করে ওকে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা করতে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার সে চেষ্টা সফল হয়েছে।

লোকটি সন্দেহের সুরে বললো, তা কিন্তু সঠিক বলা যায় না। যে রকম পাগলাটে মানুষ, সুস্থ হলেই হয়তো আবার মতিগতি পাল্টে যাবে।

কারাস্কো বললো, না না, তা কখনও হবে না। কুইকজাডা কখনও কথার খেলাপ করবে না। ওকে আমরা ভাল করেই চিনি। কথা যখন দিয়েছে, মাঞ্চায় ও ফিরে যাবেই।

হলোও তাই।

সাত দিনের দিন ডন কুইকজোট সুস্থ বোধ করলো একটু। অমনি সে সাংকোর নিষেধ সত্ত্বেও চেপে বসলো রোজিনান্তের পিঠে। বেচারি সাংকো চললো তার পিছনে পায়ে হেঁটে—উপায় কী! তার ড্যাপলের পিঠে যে চাপানো হয়েছে ডন কুইকজোটের বর্ম-চর্ম ঢাল-তলোয়ারের বোঝা। ডন যে কথা দিয়েছে, সে সব আর ব্যবহার করবে না!

চলতে চলতে সাগর-তীরের সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালো ডন। করুণ স্বরে বললো, এইখানে একদিন ছিলো আমার 'ট্রয়'। আমার দুর্ভাগ্য আর দুর্বলতার জন্য এইখানেই যশোলক্ষ্মী আমাকে ছেড়ে গেছে। এইখানে অস্ত গেছে আমার গৌরব-সূর্য, আমার সুখ-শান্তি। সে সূর্য আর উঠবে না।

॥ বারো ॥ ফিরে চলো আপন ঘরে

পথ শেষ হলো। গাঁয়ের পাশের একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় দুজনে এসে দাঁড়ালো। ওই তো দেখা যায় মাঞ্চা গাঁ।

পুলকে নেচে উঠলো সাংকোর মন। নতজানু হয়ে সে বলে উঠলো : মাগো, অনেক পথ ঘুরে আবার তোমার কোলে ফিরে এসেছি। পথশ্রান্ত সন্তানদের তুমি কোলে তুলে নাও মা!

গ্রামের ভিতরে ঢুকতেই ছেলে-বুড়ো, শিষ্ট-দুষ্ট, নাপিত-পুরুত—সবাই ওদের ঘিরে ধরলো। কত দিন পরে ডন কুইকজোট আর সাংকো পাঞ্জা ফিরে এসেছে! সবাই আহ্লাদে আটখানা। হরেক রকম প্রশ্ন করে ওদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

ডন কিন্তু সোজা ছুটে গেলো বাড়িতে। গিয়েই শুয়ে পড়লো বিছানায়। পথের ধকলে বেচারার তখন জ্বর এসে গেছে।

দিনের পর দিন অসুখ বেড়েই চললো। ডাক্তার বদ্যি ডাকা হলো। তারা অনেকবার নাড়ি টিপলো। অনেক রকম বড়ি খাওয়ালো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নাড়ি ক্রমেই দুর্বল হয়ে চললো।

একটানা ছ-দিন ডন বেহুঁস হয়ে বিছানায় পড়ে রইলো। কেবল ঘুম আর ঘুম। মাঝে-মাঝে অর্থহীন ঘোলাটে চোখে চায়। বিড়বিড় করে কি যেন বলে আপন মনে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

অবশেষে একদিন একটানা ছ-ঘণ্টা ঘুমিয়ে চোখ মেললো ডন। মেলেই বললো, না জেনে যারা ভুল পথে চলে, ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুন।

পাশেই বসে ছিলো সাংকো পাঞ্জা। সে বললো, কী বললেন হুজুর?

ডন স্পষ্ট গলায় বললো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও সাংকো, এতদিনে আমি ফিরে পেয়েছি আমার সহজ বুদ্ধি-বিবেচনা। আজ বুঝতে পারছি, এতকাল কী অলীক স্বপ্নই আমি দেখেছি। যদি সময় পেতাম তাহলে তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারতাম যে সে পাগলামি আমি কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু সে আর হবার নয়! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। সাংকো, তুমি সবাইকে একবার ডাকো। সবাইকে আমি শুনিয়ে যাব আমার শেষের কথা। দিয়ে যাব আমার 'উইল'।

একে-একে ঘরে ঢুকলো পুরুতমশাই, নাপিত ভায়া, স্যামসন কারাস্কো ও আরো অনেকে।

দুর্বল হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে ডন ধীরে ধীরে বললো, এস, এস ভাই, আজ আর আমি মাণ্ডার বোকা বীর ডন কুইকজোট নই, আজ আমি অ্যালোঞ্জো কুইকজাডা, তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের ভাই।

সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। ডন আবার কথা বললো, কারাস্কো, তোমার সব কথা আমি শুনেছি। তুমিই আমার ভুল ভেঙেছ। আজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, আমার সে ভুল যেন তিনি ক্ষমা করেন।

কারাস্কো বললো, তাঁর দেওয়া ভুল তিনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন কুইকজাডা!

ডন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আঃ বাঁচলাম! আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে ভাই, আমি চললাম। আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমাকে ভুলো না বন্ধু—ভুলো না।—আমেন!

সকলে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললো, আমেন!

আমাদের কাহিনী এখানেই শেষ হলো।

সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি: মাণ্ডার বীর ডন কুইকজোট হও, আর অ্যালোঞ্জো কুইকজাডাই হও, মানুষ তোমাকে কোন দিন ভুলবে না। গুণপ্রিয় মানুষের স্মৃতিতে তুমি অমর হয়ে থাকবে। তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

আমেন!



পুরাতত্ত্ব-বিপণি

চার্লস ডিকেন্স

॥ এক ॥

সাধারণত রাতটাই আমার বেড়াবার সময়।

গরমের কালে অনেক দিন আমি খুব সকালে বাড়ি থেকে বের হই, আর সারাদিন গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াই ; আবার কখনও দিন কয়েকের জন্য, কখনও বা কয়েক সপ্তাহের জন্যই ডুব মারি।

একদিন রাতে……

শহরের পথে পথে সেদিন অনেক ঘুরেছি।

রোজকার মতই সেদিনও একথা-সেকথা ভাবতে ভাবতে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছি। এমন সময় একটা মিষ্টি গলার ডাক এসে কানে লাগলো।

ফিরে দেখি, একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে। শহরের আরেক প্রান্তে অবস্থিত অনেক দূরের একটা রাস্তায় পৌঁছবার পথ সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম, সে তো এখান থেকে অনেক দূরে মা।

মেয়েটি নরম গলায় বললো, সে আমি জানি। আজ রাতেই তো আমি সেখান থেকে এসেছি।

—তুমি একা এসেছ ? আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

—তাতে কি হয়েছে। পথটা হারিয়ে ফেলেছি বলেই যা একটু ভয় পেয়েছি।

—আচ্ছা, তুমি বেছে বেছে আমাকেই পথের হদিস জিজ্ঞেস করলে কেন বলো তো ? আমি যদি তোমাকে ভুল পথ বলে দেই।

—না না, সে আপনি বলতে পারেন না। আপনি কত ভাল মানুষ।

মেয়েটির কথাগুলো আমার কী যে ভাল লেগেছিলো তা লিখে বোঝাতে পারব না। বললাম, আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।

মেয়েটি একান্ত বিশ্বাসে আমার হাত ধরলো। যেন আজন্ম ও আমাকে চেনে।

দুজন এগিয়ে চললাম। আমার চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললো ছোট্ট মেয়েটি।

যেতে যেতে শুধালাম, কে তোমাকে একা একা এতদূরে পাঠিয়েছে বলো তো?

—আমাকে খুব ভালবাসেন এমন একজন।

—কিন্তু তুমি কি করছিলে এত রাতে?

—সে কথা আমি কিছুতেই বলব না, দৃঢ়কণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিলো।

আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। একথা-সেকথা বলতে বলতে এগিয়ে চললাম।

বাড়ির কাছে এসেই মেয়েটি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। তারপর এক দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে কড়া নাড়লো। আমিও ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দু'তিনবার কড়া নাড়বার পর মনে হলো ভিতরে কে যেন রয়েছে। একটু পরে দরজার কাঁচের ভিতর দিয়ে একটা আবছা আলো দেখা গেলো। সেই আলোয় দেখলাম আলোধারী লোকটিকে, আর দেখতে পেলাম ঘরখানির অবস্থা। একটি ছোটখাটো বুড়ো মানুষ। মাথায় বড় বড় সাদা চুল। দেখতে অনেকটা ছোট মেয়েটির মতই। তেমনি দুটি উজ্জ্বল নীল চোখ। তবে বয়সের চাপে তার সারা মুখ বলিরেখায় ভরা। তাই দুজনের মধ্যে কোন মিল আজ আর খুঁজে পাওয়া ভার।

আর ঘরটা? যে ঘরের ভিতর দিয়ে লোকটি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছিলো, সেটি যেন পুরনো জিনিসের এক বিচিত্র পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। ঘরের এখানে ওখানে মধ্যযুগীয় সব বর্ম-চর্ম-শিরস্ত্রাণ-ধারীরা দাঁড়িয়ে আছে। পুরনো গির্জার অদ্ভুত সব কারুকার্যকরা জিনিষ ঝোলানো রয়েছে ইতস্তত। মরচে-ধরা নানা রকমের সব অস্ত্রশস্ত্র। বিকৃত সব মূর্তি—কোনটা চীনে-মাটির, কোনটা কাঠের, আবার কোনটা বা লোহার, না হয় হাতির দাঁতের। নানা রকম কিম্ভূতকিমাকার সব পর্দা আর আসবাবপত্রে ঘরখানা বোঝাই।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে লোকটি বিস্মিত হয়ে আমাকে দেখতে লাগলো।

মেয়েটি ততক্ষণে বুড়োকে দাদু বলে ডেকে আমাকে তাদের পরিচয়ের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো।

সব কথা শুনে বুড়ো মেয়েটির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আদর করে বলতে লাগলো, তাই তো দিদি, কি করে তুমি পথ হারালে? উঃ, যদি তুমি হারিয়ে যেতে নেল তাহলে আমার কি হত?

মেয়েটি বললো, তুমি কিছু ভেবো না দাদু, তোমার কাছে ফিরে আসবার পথ আমি ঠিক খুঁজে নিতাম।

বুড়ো আদর করে মেয়েটিকে চুমো খেলো। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো, দয়া করে ভিতরে আসুন।

বুড়োর পিছনে পিছনে একটা ছোট বসবার ঘরে এলাম। তার পাশে আর একটি ছোট ঘর। চেয়ে দেখি, সুন্দর করে সাজানো একখানি ছোট শোবার ঘর। ঘরখানি এত ছোট আর এত সুন্দর করে সাজানো যে আমার মনে হলো. এখানে শুধু পরীরাই ঘুমুতে পারে।

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে মেয়েটি সেই শোবার ঘরে চলে গেলো।

আগুনের পাশে একখানি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বুড়ো বললো, আপনি নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রান্ত হয়েছেন। কী করে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।

আমি বললাম, আপনার নাতনিটির আর একটু বেশী যত্ন নিলেই আমি খুসি হব।

—আরও যত্ন! নেলের প্রতি আরও যত্ন! আমি নেলকে যত ভালবাসি, এমন আর কে কাকে বাসে!

বুড়ো আর কোন কথা বললো না। এই কয়টি কথার ভিতর দিয়েই যেন তার সীমাহীন স্নেহ অজস্রধারায় ঝরে পড়লো।

আমিও আর কোন কথা বললাম না। চুপ করে বসে রইলাম। বুড়ো হাতের উপর থুতনিটা রেখে মাথাটা দু'বার দুলিয়ে এক দৃষ্টিতে আগুনের দিকে চেয়ে রইলো।

একটু পরে মেয়েটি ঘরে ঢুকলো। তার ফিকে বাদামী রঙের চুলগুলো কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তৈরী হবার দরুন তার মুখে একটা লালচে আভা লেগেছে।

মেয়েটি এসেই রাত্রের খাবার তৈরীর কাজে লেগে গেলো।

সবে আমরা খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

নেল সশব্দে হেসে উঠে বললো, নিশ্চয় কিট ফিরে এসেছে।

বুড়ো দরজা খুলে দিলো। তার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলো কিট।

কিট ছেলেটি দেখতে বড় অদ্ভুত। মুখটা অস্বাভাবিক রকমের চওড়া।

গাল দুটো ভয়ানক লাল। নাকটা ওল্টানো। মুখের এমন কমিক চেহারা আমি কচিৎ দেখেছি।

আমাকে দেখতে পেয়েই কিট দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর কখনও বাঁ পায়ে কখনও ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে লাগলো।

বুড়ো শুধালো, বাড়িটা খুব সহজেই খুঁজে পেয়েছিলে তো?

কিট জবাব দিলো, সহজে? আপনি কি যে বলেন তার ঠিক নেই।

—যাকগে সে কথা। তোমার নিশ্চয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে?

—ক্ষিধে? আজ্ঞে, সে তো পেয়েছেই।

কথা বলবার সময় কিট মাথাটাকে কি রকম করে যেন সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। দেখে মনে হয়, ও রকম ভাবে গলা বাড়িয়ে না দিলে ও বুঝি কথা বলতেই পারে না।

কিট টেবিল থেকে এক টুকরো রুটি, মাংস আর এক মগ বীয়ার নিয়ে ঘরের এক কোণে বসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলো।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, রাত বারোটা বাজতে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকি।

আমি বাড়ি ফিরবার জন্য উঠে পড়লাম। বুড়ো বললো, একটু অপেক্ষা করুন। এই কিট, রাত যে বারোটা বাজে, তুমি এখনও এখানে রয়েছে? শিগ্‌গিরি বাড়ি যাও। কিন্তু মনে থাকে যেন, সকালে ঠিক সময়ে হাজির হওয়া চাই। অনেক কাজ আছে। গুড নাইট। নেল, ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

নেল বললো, গুড নাইট কিট। হাসি আর করুণায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর দুটো চোখ।

কিটও বললো, গুড নাইট মিস্ নেল।

কিট চলে গেলো। নেল খাবার টেবিল পরিষ্কার করতে লেগে গেলো।

বুড়ো আমার দিকে চেয়ে বললো, আজ রাতে আপনি আমাদের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছেন সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নেলও আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

আমি বিশেষ কিছু না বলে কোটটা গায়ে চড়াতেই দেখি নেল ক্লোক, টুপি আর ছড়ি হাতে করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, ওগুলো তো আমার নয় মা।

মেয়েটি শান্তভাবে বললো, না। এগুলো দাদুর।

—কিন্তু তিনি তো আর এত রাতে বাইরে যাবেন না।

মেয়েটি হেসে বললো, যাবেন।

—যাবেন? আর তুমি?

—আমি? আমি এখানেই থাকব। তাই তো থাকি।

সবিস্ময়ে আমি বুড়োর দিকে তাকালাম। সে তখন পোষাক ঠিক করতে ব্যস্ত। আবার তাকালাম ছোট মেয়েটির দিকে। একা! এই ভয়াবহ জায়গায় সারা রাত ও একা থাকবে!

দরজার কাছে এসে নেল হাতের মোমবাতিটা রাখলো। তারপর আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেলো বুড়োর কাছে। বুড়ো ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, ভালো ভাবে ঘুমিও নেল। পরীরা তোমাকে পাহারা দেবে। দেখো দিদি, প্রার্থনা করতে যেন ভুলো না।

—নিশ্চয়ই না। প্রার্থনা করতে আমার এত ভালো লাগে।

—খুব ভালো, খুব ভালো। খুব ভোরেই আমি ফিরে আসব।

—দুবার তোমাকে কড়া নাড়তে হবে না দাদু। তোমার কড়া নাড়ার শব্দে স্বপ্নের মধ্যেও আমার ঘুম ভেঙে যায়।

বিদায়ের পালা শেষ হলো। নেল দরজা বন্ধ করে দিলো। বাইরে থেকে দরজাটা আর একবার টেনে দেখে বুড়ো পথে নামলো।

রাস্তার মোড়ে এসে বুড়ো বললো, এইবার আমরা দুজন দুই পথে যাব।

আমি হয়তো কিছু বলতাম। কিন্তু তার আগেই দ্রুত পা ফেলে বুড়ো মোড় ঘুরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

॥ দুই ॥

সেদিনের সেই জায়গাটাতে আর একবার যাব কি যাব না এই ভাবতে ভাবতেই সাত দিন কেটে গেলো। শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করলাম। আরও ঠিক করলাম, যাব দিনের আলোয়। বেলাবেলিই একদিন বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়িটার সামনে দিয়ে বার কয়েক যাতায়াত করলাম। কিন্তু সংকোচ-বশতঃ ভিতরে ঢুকতে পারলাম না প্রথমটায়। তারপর একসময় ঢুকেই পড়লাম।

ঘরের পিছন দিকে ছিলো সেই বুড়ো এবং অপর একটি লোক। ওরা দুজন এতক্ষণ বেশ চড়া গলায় কথা কাটাকাটি করছিলো। আমি ঘরে ঢুকতে দুজনই চুপ করে গেলো।

বুড়ো এগিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করলো। বললো, আমি আসতে সে খুব খুসি হয়েছে। তারপর পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বললো;

বড়ই সঙীণ মুহূর্তে আপনি এসে পড়েছেন। কোন্ দিন না জানি এই লোকটি আমাকে খুন করে ফেলে। সাহসে কুলোলে অনেক আগেই ও আমাকে খুন করত।

অপর লোকটি এক পা চেয়ারের উপর রেখে দাঁড়িয়েছিলো। তার মুখটা ঘৃণায় বিকৃত। বয়স বছর একুশের কাছাকাছি। সুগঠিত দেহ। চেহারাও সুন্দর। তবে কেমন যেন একটা দুর্বিনীত ভাব।

যুবকটি বলে উঠলো, ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক, এখনো আমি আছি এবং আমার যতক্ষণ খুসি থাকব। আমি তোমাকে আবার বলছি, আমার বোনকে আমি দেখতে চাই।

বুড়ো লোকটি তিক্তকণ্ঠে বললো, তোমার বোন!

—হ্যাঁগো, আমার বোন। সম্পর্কটা তো আর তুমি মুছে ফেলতে পারবে না। পারলে অনেক আগেই তুমি তা করতে। আমার একটি বন্ধু বাইরে অপেক্ষা করছে। তোমার অনুমতি নিয়েই তাকে আমি ডেকে আনছি।

এই কথা বলেই সে দরজার কাছে গিয়ে ইসারায় একটি লোককে বারকয়েক ডাকলো। তারপর সেই লোকটি বারকয়েক চোখ ঘুরিয়ে ও মাথা নেড়ে যেন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে এসে ঢুকলো।

যুবকটি বললো, এই যে এর নাম ডিক সুইভেলার। বসো সুইভেলার।

মিঃ সুইভেলার ফিস্ ফিস্ করে শুধালো, কিন্তু বুড়ো রাজী তো?

—তুমি বসো তো আগে।

বন্ধুর কথায় মিঃ সুইভেলার বসলো।

বুড়ো লোকটি চেয়ারে বসে একান্ত অসহায়ভাবে একবার নাতির দিকে একবার তার সঙ্গীর দিকে তাকাতে লাগলো।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ মিঃ সুইভেলার বললো, ফ্রেড, বুড়ো পোষ মেনেছে তো?

—তাতে কি আসে যায়?

—তা নয়। তবু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আর ঠিক না থাকলেই বা কি।

মিঃ সুইভেলার নির্লিপ্তভাবে বলে উঠলো, আত্মীয়তায় যখন ভাঙন ধরে তখন এমনিই হয়। এই তো দেখুন না, এদিকে এমন আমুদে বুড়ো দাদু আর ওদিকে এই উচ্ছৃংখল যুবক নাতি। বুড়ো দাদু বলছেন, 'আমি তোমাকে খাইয়ে-পাড়িয়ে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, জীবনের পথে চলতে শিখিয়েছি। কিন্তু ছেলেমানুষের মতই সে-পথ থেকে তুমি ছিটকে পড়েছ। অতএব তোমাকে আর সুযোগ আমি দেব না।' কিন্তু আসল কথা হলো,

ব্যাপারটাকে এ ভাবে চলতে দেওয়া কি উচিত ? বুড়ো দাদু যদি আরও কিছু রেস্ত ঢেলে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেন তাহলেই ভালো হয় না কি ?

বুড়ো নাতির দিকে চেয়ে বললো, বার বার কেন তুমি এখানে চড়াও হয়ে আমাকে কষ্ট দাও ? কেন তোমার এই সব···বন্ধুকে এখানে আনো ? আর কত দিন তোমাকে বলব যে দুঃখে-কষ্টে আমি জর্জরিত। আমি দরিদ্র।

নাতি বললো, আর আমিই বা কতবার তোমাকে বলব যে সব কথাই আমার জানা আছে ?

বুড়ো বললো, তুমি তোমার পথ বেছে নিয়েছ, সেই পথেই চলো। নেলকে ও আমাকে খেটে খেতে দাও।

—শিগ্‌গিরই নেল বড় হবে। কিন্তু তোমার আওতায় থাকলে সে তার নিজের ভাইকেও ভুলে যাবে।

বুড়োর চোখ দুটি হঠাৎ জ্বলে উঠল। সে বললো, ভাইরে, খুব সাবধান, তোমার সবচেয়ে দরকারের দিনে সে যেন তোমাকে ভুলে না যায়। খুব সাবধান, যেদিন সে তার নিজের সাজানো গাড়িতে চড়ে যাবে আর তুমি যাবে খালি পায়ে হেঁটে, সে দিন যেন না আসে তোমার জীবনে।

—তার মানে যখন তোমার সব টাকা সে পাবে ? ওঃ, কী গরীব মানুষের মত কথা তোমার।

ঠিক সেই সময় ঘরের দরজাটা খুলে গেলো। ঘরে ঢুকলো নেল। তার পিছনে শক্ত চেহারার একটি বয়স্ক লোক। লোকটি এতো ছোট যে বামন বললেও চলে। কিন্তু তার মাথা ও মুখ যে কোন দৈত্যের দেহেও বেমানান হত না। কালো দুটি চোখ সব সময়ই ঘুরছে। মুখময় কড়া দাড়ি। মাথায় একটা উঁচু টুপি। গলায় বাঁধা একটা রুমালের ফাঁক দিয়ে মোটা গলাটার অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে।

চোখের উপর ডান হাত তুলে যুবকটিকে বেশ ভালো করে নিরীক্ষণ করে বামনটি বললো, ও-হো, এরই তবে তোমার নাতি হওয়া উচিত, কি বলো ?

বুড়ো জবাব দিলো, বরং বলো হওয়া উচিত নয়। তবে এই আমার নাতি।

—আর এটি ?

—ওরই এক বন্ধু।

আমাকে দেখিয়ে বামন প্রশ্ন করলো, আর ইনি ?

বুড়ো বললো, তোমার বাড়ি থেকে ফিরবার সময় পথ হারিয়ে ফেললে সেদিন ইনিই তো নেলকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। বড় ভালো লোক ইনি।

এদিকে যুবকটি তখন নেলকে বলছে, আচ্ছা নেলি, এরা কি তোকে শেখায় আমাকে ঘৃণা করতে?

—না, না। কী লজ্জার কথা!

—তবে কি শেখায় আমাকে ভালবাসতে?

—তাও না। এরা তোমার কথাই আমার কাছে বলে না। কিন্তু ফ্রেড, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—বটে!

—সত্যি বলছি।

—হয়েছে—হয়েছে। ওদের শেখানো বুলি তো আওড়ানো হয়েছে, এখন যাও এখান থেকে।

নেল নিজের ছোট্ট ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

যুবকটি তখন বামনের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, শোন মিঃ—

বামন বললো, আমাকে বলছ? আমার নাম কুইল্‌প্‌—ড্যানিয়েল কুইল্‌প্‌।

—দেখো মিঃ কুইল্‌প্‌, আমার ঠাকুর্দা তো তোমার কথা বেশ শোনে।

—তা শোনে।

—তাঁর অনেক গোপন কথাও তুমি জানো?

—তা জানি।

—তাহলে তোমার মারফতেই তাঁকে শেষ বারের মত বলে যাই, যত দিন নেল এখানে আছে, আমার যখন খুসি আসব, যখন খুসি যাব; আর দাদু যদি আমাকে তাড়াতে চায় তাহলে আগে নেলকে ছাড়তে হবে। এসো ডিক।

মিঃ সুইভেলার ও ফ্রেড চলে গেলো। সেদিকে খানিক চেয়ে থেকে কুইল্‌প্‌ তার বুকের কাছে জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বুড়োকে বললো, এই নাও। এগুলো আমি নিজেই নিয়ে এসেছি। সব মোহর কি না, নেলের পক্ষে বয়ে আনা একটু শক্ত হত। তাছাড়া বিপদ-আপদের ভয়ও তো আছে।

বুড়ো টাকাটা নিয়ে পাশের বসবার ঘরের লোহার সিন্দুকের মধ্যে রেখে দিলো।

ইতিমধ্যে আমি কয়েকবারই চলে যেতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই বুড়োর অনুরোধে বসতে হয়েছে। আর বসতে আমার কোন আপত্তিও ছিলো না। কারণ এ বাড়িতে প্রথম পদার্পণে আমার মনে যে কৌতূহল জেগেছিলো দ্বিতীয় পদার্পণে তা বেড়েছে বই কমে নি।

নেল এবার একটা সেলাই নিয়ে এসে বুড়োর পাশে বসলো। আহা! এই বুড়ো যে দিন আরো দুর্বল হবে—যেদিন মারা যাবে, সেদিন এর উপায় কি হবে?

হঠাৎ বুড়ো যেন আমার কথারই জবাবে বললো, তোর জন্য অনেক টাকা আমাকে জমাতে হবে দিদি। আমার নিজের জন্য নয়, শুধু তোর জন্য।

নেল একবার দাদুর মুখের দিকে তাকালো। কোন কথা বললো না।

বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনে বুড়ো বলে উঠলো, ওই বুঝি কিট এলো। যাও নেল, ওর কাছে যাও।

নেল চলে গেলো।

বুড়ো তখন চুপি চুপি আমাকে বললো, দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। সেদিন রাতে আপনি বলেছিলেন ওর আর একটু যত্ন নিতে। সেই থেকেই আমি মনে মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি। কিন্তু আমার দিক থেকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, চেষ্টার আমি ত্রুটি করিনি, এবং এখনও আশা করি যে, জয় আমার হবেই। কারও করুণার ছিটেফোঁটা নয়, ওর ভাগ্যে আছে বিপুল সম্পত্তি। চুপ। মেয়েটা আসছে।

নেল ঘরে এসে কিটকে পড়াতে বসলো। ক্রমে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নেমে এলো। বুড়ো লোকটি আবার চঞ্চল ও অধৈর্য হয়ে উঠলো। তারপর বারোটা বাজলে গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। সেই নির্জন পুরীতে রইলো ছোট্ট মেয়েটি একা।

কিন্তু আমার কথা এখানেই শেষ হলো। এবার কাহিনী বলবে এর নায়ক-নায়িকারাই।

॥ তিন ॥

সারে অঞ্চলের একটা ছোট জাহাজ-ঘাটা। নাম 'কুইলপ্‌স্‌ হোয়ার্ফ'।' সেখানে রয়েছে একটি ছোট কাঠের কাউন্টিং হাউস। হাউস মানে কাঠের একটা নোংরা বাক্স। তার মধ্যে আছে একটা পুরনো নড়বড়ে ডেস্ক, দুটো টুল, একটা টুপির পেগ, পুরনো পাঁজি, দোয়াত-দান আর ভাঙা কলম আর একটা ঘড়ি যা গত আঠারো বছর যাবৎ অচল হয়ে আছে।

নদী পার হয়ে ড্যানিয়েল কুইলপ্‌ এগিয়ে চললো কাউন্টিং হাউসের দিকে।

খানিক দূর গিয়েই তার নজরে পড়লো, একজোড়া নোংরা পা আকাশের দিকে তোলা রয়েছে।

মনিবের পায়ের শব্দ পেয়ে পা জোড়া চটপট নীচে নেমে এলো।

যেতে যেতে কুইলপ্‌ বললো, ঠিক আছে। তুমি হেটমুণ্ড হয়েই থাক। শুধু চারদিক একটু নজর রেখো।

কাউণ্টিং হাউসে ঢুকে কুইলপ্ পা ছড়িয়ে ঘুম দিলো একটা।

মিনিট পনেরো পরেই দরজা ফাঁক করে মাথা ঢোকালো বাচ্চা চাকরটা। বললো, কে যেন আপনাকে খুঁজছে।

—কে ?

—তাতো জানি না।

—হতচ্ছাড়া; একবার জিজ্ঞেস করতে পার নি ?

ঘরে ঢুকলো নেল। কুইলপ্ তাকে দেখে সবিস্ময়ে বললো, আরে, নেলি ?

—হ্যাঁ, আমি।

—এসো, ভিতরে এসো। দরজাটা বন্ধ করে দাও। এবার বলতো; কি খবর ?

নেল একখানা চিঠি দিলো তার হাতে।

চিঠিটা পড়ে কুইলপ্ বললো; নেলি।

—বলুন।

—চিঠিতে কি লেখা আছে তুমি জান ?

—আজ্ঞে না।

—ঠিক বলছ ?

—হ্যাঁ।

—হুঁম্। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এরই মধ্যে সব উধাও হয়ে গেলো ? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ? কী যে ও করে বুঝতেই পারি না। যাকগে। দেখো নেল, তোমাকে এখনি একবার আমার সঙ্গে টাওয়ার হিল-এ যেতে হবে মিসেস্ কুইলপের সঙ্গে দেখা করতে।

—কিন্তু চিঠির জবাব নিয়ে আমাকে যে সোজা বাড়ি যেতে হবে।

—চিঠির জবাব তো তুমি পাও নি নেলি। আর আমি বাড়ি না গেলে জবাব পাবেও না। কাজেই ওখান থেকে আমার টুপিটা দাও, তারপর চলো আমার সঙ্গে।

দুজনে বাইরে এসে দেখে, হেটমুণ্ডে দাঁড়ানো ছেলেটার সঙ্গে প্রায় তারই মত লম্বা আর একটা ছেলে মাটিতে পড়ে জড়াজড়ি করছে।

নেল চেঁচিয়ে উঠলো; আরে, এ যে কিট! দোহাই মিঃ কুইলপ্; এদের থামান দয়া করে।

—থামাচ্ছি ওদের, বলে মিঃ কুইলপ্ কাউণ্টিং হাউস থেকে একখানা মোটা লাঠি নিয়ে এলো। তারপর সেই লাঠি দিয়ে দুজনকে মারতে লাগলো দমাদ্দম। ছেলে দুটো তো পড়ি কি মরি করে দিলো দৌড়।

একটু দূরে গিয়ে ছেলেটা বললো; বেশ তো, বেশ তো, এর পরে আর কেউ যদি তোমাকে বেঁটে বক্কেশ্বর বলে ক্ষেপায় তখন আমি কিছু জানি না।

কুইল্‌প্‌ একটু নরম হয়ে বললো, কিন্তু কেন তোরা হুটোপুটি করছিলি ?

—কেন ও তোমাকে বেঁটে বক্কেশ্বর বললো ?

ফেটে পড়লো কিট, ওই বা কেন বললো যে, মিস্‌ নেলি দেখতে বিশ্রী ? মিস্‌ নেলি আর আমার মনিবের মাথা ওর মনিবের কাছে বাঁধা ? কেন বললো ?

কুইল্‌প্‌ বললো, ও একটা বোকা, তাই ও-কথা বলছে। আর তুমি চালাক ছেলে, তাই ঠিক কথাই বলেছ। এই নাও কিট, এই ছ'টা পেনি তোমাকে দিলাম। ওরে হতচ্ছাড়া, এই নে চাবি, ঘর বন্ধ করে আমাকে চাবিটা এনে দে।

মিঃ কুইল্‌প্‌ নেল ও কিটকে নিয়ে নৌকোয় উঠলো। মনের আক্রোশে ছেলেটা জলের একেবারে ধারে গিয়ে আবার দু'পা আকাশে তুলে দিয়ে মাথার উপরে নাচতে লাগলো।

বাড়িতে ঢুকে কুইল্‌প বললো ওগো গিন্নি, এই দেখো নেলি ট্রেন্ট এসেছে। অনেক পথ হেঁটে এসেছে বেচারি। ওকে এক প্লাস মদ আর একখানা বিস্কুট দাও। তোমরা দুজনে বসে গল্প কর, আমি ততক্ষণ একটা চিঠি লিখে আসছি।

যাবার সময় সে স্ত্রীর কানে কানে বললো, আমার কথাটা যেন মনে থাকে। ওরা কি করে, কেমন ভাবে থাকে, ওর দাদু ওকে কি বলে—এই সব খবর কৌশলে ওর কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করবে। বুঝেছ ? আমি কিন্তু ও ঘরে কান পেতে রইলাম। তুমি ভালভাবে কথা না চালাতে পারলেই আমি দরজায় খটখট শব্দ করব।

মিসেস্‌ কুইল্‌প্‌ নেলের পাশে এসে সস্নেহে বললো, তুমি যে একশো বার এখানে যাতায়াত কর, এতে তোমার দাদু কি বলে ?

—দাদু শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

দরজাটা একবার শব্দ করে উঠলো। নেল শুধালো, ও কিসের শব্দ ?

—ও কিছু না। দরজাটায় মাঝে মাঝে ও রকম শব্দ হয়। আচ্ছা, তোমার দাদুর তো চিরকাল এমন দুরবস্থা ছিলো না ?

—মোটেই না। আমরা তখন কী সুখেই যে ছিলাম। আর এখন কী যে হয়েছে। দাদু কিন্তু আমাকে আগের মতই ভালবাসে।

—আহা, তাতো বাসবেই।

—আমিও দাদুকে খুব ভালবাসি। কিন্তু দাদুর সব চেয়ে বড় পরিবর্তনের কথাই তো তোমাকে বলিনি। কাউকে বলো না যেন। দাদুর ঘুম নেই,

প্রতি রাতে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। যখন ফিরে আসেন, তখন রাত শেষ হয়ে যায়। আমিই তো দরজা খুলে দি। কাল তাঁর খুব দেরী হয়ে গিয়েছিলো, প্রায় সকাল।

বলতে বলতে নেল কেঁদে ফেললো।

ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলো কুইলপ্। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, এ বেলা না হয় আর নাই গেলে তুমি।

চোখ মুছতে মুছতে নেল বললো, না না, এমনিতেই আমার অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখনই আমি বাড়ি যাব

—বেশ, যদি যেতে চাও, তাহলে যাও। এই নাও চিঠি। কাল হোক, পরশু হোক আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আচ্ছা, এবার তাহলে এসো নেলি।

॥ চার ॥

কয়েকদিন পরের কথা।

রাত্রে বুড়ো নেলকে বললো, আজ আর বাইরে যাব নারে দিদি।

শুনে নেলের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু দাদুর রুগ্ন দুর্বল মুখের দিকে চেয়ে পরক্ষণেই সে আনন্দ উবে গেলো।

বুড়ো বললো, দুদিন—দুটো পুরো দিন চলে গেলো। অথচ তার কোন খবর নেই। সে তোকে কি বলে দিয়েছিলোরে নেল ?

—সে তো তোমাকে হুবহু বলেছি দাদু।

—তবু আবার বল্। আমি যেন আর ভাবতে পারছি না। কাল অথবা পরশু সে দেখা করবে, এ ছাড়া আর কিছুই বলে নি ?

—না দাদু, এ ছাড়া আর কিছুই বলে নি। আচ্ছা দাদু, কাল খুব ভোরে আমি আর একবার যাব কি ?

বুড়ো মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তাতে কিছুই লাভ হবে নারে। কিন্তু নেল, আমি শুধু ভাবছি, এই সংকটের সময় সে যদি আমাদের পরিত্যাগ করে, তাহলে যে আমার সর্বনাশ হবে। শুধু তাই নয়, সর্বনাশ হবে তোর। আমরা যে ভিখারী হয়ে যাব—

—হই হব। কি ক্ষতি তাতে ? আমরা ভিখারী হয়েও সুখে থাকতে পারব দাদু।

—ভিখারীর আবার সুখ। হায় দিদি!

—আমি সত্যি বলছি দাদু, এখানে যে ভাবে আছি, এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও ঢের ভালো। চলো, কালই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

গ্রামের পথে পথে বেড়াব, মাঠের মধ্যে গাছের তলায় ঘুমুব, কখনও টাকার চিন্তা করব না, আর দুজনে মিলে ভগবানের নাম করব।

নেলের এ সব কথা অন্যের শুনবার নয়, এ দৃশ্য অন্যের দেখবারও নয়। তবু অন্য কান এ কথা শুনেছে, অন চোখ এ দৃশ্য দেখেছে। আর সে-কান আর সে-চোখ মিঃ কুইল্‌পের।

দুজনের অজ্ঞাতে ঘরে ঢুকে মিঃ কুইল্‌প এতক্ষণ সবই শুনেছে—সবই দেখেছে। পাছে ওদের কথার ব্যাঘাত হয় তাই কোন কথা বলে নি।

নেল হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠলো। বুড়োও প্রথমটা তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তারপর শুধালো, তুমি কেমন করে এলে এখানে?

—কেন? দরজা দিয়ে। চাবির ফুটো দিয়ে তো আর ঢুকতে পারি না। আপনার সঙ্গে গোপনে আমি দুটো কথা বলতে চাই। আর কেউ এখানে থাকবে না। নেল, তুমি একটু বাইরে যাও।

নেল দাদুর দিকে তাকালো। দাদু ইসারা করায় সে দরজাটা টেনে দিয়ে চলে গেলো।

বুড়ো ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে কয়েকবার পায়চারী করলো। ঘাড় গুঁজে আসনে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, টাকা এনেছ কিছু?

না।

দুই হাত মুঠো করে হতাশ ভাবে বুড়ো বলে উঠলো. তাহলে—তাহলে এই শিশু আর আমি একেবারেই ডুবে যাব?

কুইল্‌প টেবিলে দু তিনবার শব্দ করে বললো, শুনুন, আপনার সঙ্গে আমি খোলাখুলি ভাবেই সব কথা বলতে চাই। আপনার সব গোপন খবর আমি জানতে পেরেছি।

বুড়ো সভয়ে একবার চোখ তুলে তাকালো। তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো।

—আপনি খুব বিস্মিত হয়েছেন, না? হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার কোন কথাই আজ আমার অজানা নেই। আমি নিশ্চিত জেনেছি, সব টাকা, ধার, কর্জ, আগাম, যা আমি দিয়েছি, সব—সব উড়ে গেছে ঐ এক—বলব সে-কথা?

—ইচ্ছা হয় বলো।

—সব উড়ে গেছে জুয়ার টেবিলে—আপনার প্রতি রাতের আড্ডাখানায়। এই আপনার অর্থসঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ! এই আপনার অলীক স্বপ্নের সোনার খনি!

চীৎকার করে উঠলো বুড়ো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই আমার সোনার খনি। এই আমার অর্থ সঞ্চয়ের পথ। আমরণই আমি এই পথে চলব।

ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠলো কুইল্‌পের ঠোঁট, এতদিন তাহলে একজন জুয়াড়ীর ধাপ্পায় আমি ঠকেছি।

তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো বুড়ো, না না, আমি জুয়াড়ী নই। ভগবান সাক্ষী, নিজের লাভের লোভে আমি কোন দিন জুয়া খেলিনি। যখনই বাজী ধরেছি মনে মনে এই অসহায় শিশুর নাম করেছি আর ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছি। কিন্তু হায়! সে আশীর্বাদ একদিনও নেমে আসে নি।

বুড়োর বেদনাতুর কণ্ঠস্বর কুইল্‌পের মনকে মুহূর্তের জন্য নরম করে দিলো। সে বললো, কবে আপনি প্রথম এ পথে নামলেন?

—কবে প্রথম এ পথে নামলাম? যেদিন প্রথম ভাবলাম, এত দিন ধরে কী সামান্য অর্থ আমি সঞ্চয় করেছি আর কত অল্প দিন আমি বাঁচব, তখন—তখনই এ পথের কথা প্রথম আমার মনে এলো।

—আপনার ওই গুণধর নাতিটিকে সাগর পারে পাঠাবার ব্যবস্থার জন্য যেদিন প্রথম আমার কাছে এসেছিলেন তার পরেই কি?

—হ্যাঁ, তার কিছুদিন পরেই। অনেক ভেবেছি এ-পথের কথা। দিনের পর দিন ভেবেছি। মাসের পর মাস স্বপ্ন দেখেছি। তারপর জুয়ায় হাত দিয়েছি। এতে কোন আনন্দ আমি পাই না, কোন আনন্দ আমি আশাও করি না।

—আচ্ছা, কখনও কোন বাজী কি আপনি জিততে পারেন নি?

—না, একটিও না। শুধু হেরেছি।

—আশ্চর্য! আমি শুনেছি, জুয়া যারা নিয়মিত খেলে শেষ পর্যন্ত তারা জেতে।

নৈরাশ্যের অবসাদ কাটিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেলো দাদু, নিশ্চয় জেতে। প্রথম থেকেই আমিও এই বিশ্বাস নিয়েই চলেছি। তাই তো তোমাকে অনুরোধ করছি, আর একটা সুযোগ আমাকে দাও। বেশী নয়, কয়েক পাউণ্ড, দুই কুড়ি পাউণ্ড—

বাধা দিলো কুইল্‌পু, গত কিস্তিতে আপনাকে দিয়েছিলাম সত্তর পাউণ্ড। এক রাত্রে তার সব গেছে।

—গেছে তা জানি। তবু কুইল্‌পু, তোমার হাত ধরে অনুরোধ করছি, ওই অসহায় বাপ-মা-মরা মেয়েটির কথা ভেবে আমাকে কিছু ধার দাও—

পরম নির্লিপ্তভাবে ঘড়ির দিকে চেয়ে কুইল্‌পু বললো, আমি দুঃখিত; সহরে আমার একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে, নইলে আরও কিছু সময় আপনার এখানে বসতে পারতাম।

কুইলপের জামা ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ো বললো, দোহাই তোমার কুইলপ, দয়া কর আমাকে, এই শেষবারের মত আমাকে কিছু টাকা ধার দাও।

—না, আর আপনাকে ধার আমি দেব না। একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার জীবনযাত্রার যে খবর আমি জেনে ফেলেছি তারপর আর আপনাকে টাকা ধার দেওয়া যায় না।

মরিয়া হয়ে বুড়ো গর্জে উঠলো, কে, কে তোমাকে বলেছে এ খবর? তার নাম আমাকে বলে যাও।

—কে হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

—নিশ্চয় ওই হতভাগা কিট। ওই আমার গতিবিধির উপর চোখ রাখত, আর তুমি সেই সুযোগ নিয়েছ।

—হ্যাঁ, কিটই বটে। বেচারি কিট।

বন্ধুর মত সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে কুইলপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

একটু দূরে গিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, বেচারি কিট। ওই তো আমাকে বলেছিলো বেঁটে বক্কেশ্বর। তাই নয়? হা-হা-হা। বেচারি কিট।

নিজের পথে পা বাড়ালো কুইলপ।

॥ পাঁচ ॥

ড্যানিয়েল কুইলপের প্রবেশ ও প্রস্থান—দুই-ই অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দেখলো আর একজন।

বাড়িখানার ঠিক বিপরীত দিকের একটা গলির মুখে সন্ধ্যা হতেই গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো আর একজন। হাব-ভাব দেখে মনে হয় এভাবে অপেক্ষা করতেই সে অভ্যস্ত।

গির্জার ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজলো। আরও পনেরো মিনিট কেটে গেলো।

আর অপেক্ষা করা বৃথা ভেবে হঠাৎ টানা দৌড় দিয়ে অনেক অলি-গলি পার হয়ে ছায়ামূর্তি একটা ছোট বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো।

হঠাৎ তাকে এভাবে ঢুকতে দেখে একটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে উঠলো, কে? কে?, ওঃ, কিট তুমি?

—হ্যাঁ মা, আমি।

—তোমাকে এত শ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন বাবা?

কিট বললো, জানো মা, বুড়ো মনিব আজ রাতে আর বাইরে যাবে না।

তাই তো নেল আজ একবারও জানালায় এসে দাঁড়ায় নি। বৃথাই আমি এত রাত তার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিষণ্ন মনে কিট আগুনের পাশে গিয়ে বসলো।

এত রাতেও ওর মা কাপড় ইস্তিরি করছিলো। দোলনায় ঘুমিয়ে আছে একটি শিশু। বছর দুই তিন বয়সের আর একটি ছেলেও জেগে শুয়ে আছে এক কোণে। দেখেই মনে হয়, খুব গরীবের সংসার। কিট, তার মা, দুটো ছোট ছেলে—সবাই মিলে এক অদ্ভুত পরিবার।

কথার মাঝখানে হঠাৎ কিট বললো, ও কিসের শব্দ মা ?

মিসেস নুবেল্‌স্‌ বললো, কে যেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

—উঁহু, রাস্তা পার হয়ে কে যেন এই দিকেই আসছে। বেশ তাড়াতাড়িই আসছে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো নেল।

মা ও ছেলে এক সঙ্গে বলে উঠলো, মিস্‌ নেলি ! কি ব্যাপার !

—দাদু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হঠাৎ মেঝের উপর কেমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।

কিট বললো, আমি এখুনি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। ডাক্তারকে নিয়ে সোজা তোমাদের ওখানে—

নেল বলে উঠলো, না না, সেখানে অন্য লোক আছে। তোমার কোন দরকার নেই। তাছাড়া তুমি আর কখনও আমাদের বাড়িতে যেও না।

—কেন ? গর্জে উঠলো কিট।

—কেন তা জানি না। দাদু তোমার উপর ভীষণ চটে গেছে। চীৎকার করে বলছে, তুমিই নাকি তার সব দুর্দশার মূল। সবাই বলছে, এখন তুমি তার কাছে গেলেই দাদু মরে যাবে। তুমি যেও না, কিছুতেই যেও না। এই কথা তোমাকে বলতেই আমি এসেছি। কিন্তু কিট, এমন কি কাজ তুমি করলে বলো তো ? তোমাকে যে আমি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতাম ! তুমিই যে ছিলে আমার একমাত্র বন্ধু !

বেচারি কিট ! ছোট্ট মনিবটির দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তার চোখ দুটো ক্রমেই বড় হতে লাগলো।

তারপর পকেট থেকে টাকা বের করে টেবিলে রেখে মাকে বললো, মনিবের কাছ থেকে এ সপ্তাহের মাইনে এনেছিলাম, এই নাও। হয়তো কিছু বেশীই আছে। আমাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। গুড্‌নাইট !

বুড়োর সংকট-অবস্থা কেটে গেলো। ক্রমে সে ভাল হয়ে উঠতে লাগলো। ধীরে ধীরে জ্ঞানও ফিরে এলো। কিন্তু তার স্বভাবের হলো আশ্চর্য পরিবর্তন।

সব সময়ই চুপচাপ শান্ত হয়ে থাকে। কোন অভিযোগ নেই কোন বিষয়ে। সামান্য জিনিসেই বেশ খুসি হয়ে ওঠে। দেয়ালে একটু রোদ এসে পড়লেই খুসিতে ঝলমল করে ওঠে তার মুখ।

একদিন বুড়ো তার আরাম কেদারায় বসে ছিলো। পাশেই একটা টুলে বসে ছিলো নেল।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো কুইলপ্। একটা চেয়ারে বসে সে বললো, আপনাকে সেরে উঠতে দেখে ভারি খুসি হয়েছি। গায়ে বেশ জোর পাচ্ছেন তো এখন?

—তা পাচ্ছি।

—দেখুন, আমি কোন রকম তাড়াহুড়া করতে চাই না। তবে বুঝতেই পারছেন, ধার-দেনার দায়ে বাড়ি যখন বিক্রি হয়ে গেছেই তখন যত তাড়াতাড়ি অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন ততই মংগল।

—সে তো ঠিকই। এ বাড়িতে আমরা থাকব না।

—সে আমি জানতাম। তৈজসপত্রগুলো আমি বিক্রি করে দিয়েছি। তাতে মোটামুটি মন্দ পাওয়া যায় নি। আজ তো মংগলবার। তাহলে কবে জিনিসগুলো নিয়ে যেতে পারি? অবশ্য তেমন তাড়া নেই কিছু, তবু— আজ বিকেলে কি সুবিধে হবে?

—না। শুক্রবার সকালে।

—বেশ বেশ, তাই হবে। এ কথার যেন নড়চড় না হয়।

—না, হবে না।

বুড়োর উদাসীন কথাবার্তায় কুইলপ্ তো অবাক। আর একবার শুক্রবার সকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনেক শুভ কামনা জানিয়ে সে বিদায় নিলো।

বৃহস্পতিবার এলো। বুড়োর তবু কোন পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন দেখা দিলো সেই দিন সন্ধ্যায়।

বুড়ো আর নেল চুপ করে বসেছিলো। হঠাৎ নেলকে জড়িয়ে ধরে বুড়ো বললো, তুই আমাকে ক্ষমা করু দিদি?

বলেই সে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো।

নেল বললো, ক্ষমা করবো? তোমাকে? তুমি কি বলছ দাদু? কিসের ক্ষমা?

—এত দিন যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু আমি করেছি, তার জন্য ক্ষমা।

—অমন কথা বলো না। দোহাই তোমার দাদু, অন্য কথা বলো।

—হ্যাঁ, অন্য কথাই বলব। অনেক দিন আগে যে কথা বলেছিলাম আমরা।

কিন্তু কতদিন আগে? অনেক মাস—সপ্তাহ—না দিন? বল্‌তো দিদি, কত দিন আগে?

—তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না দাদু।

—কেন দিদি, প্রথম যেদিন আমরা ভিখারী হই সেদিন তুই যে কথা বলেছিলি তা কি তোর মনে নেই? দেখ্‌ নেল, আর একদিনও আমরা এখানে থাকব না। এখান থেকে অনেক—অনেক দূরে আমরা চলে যাব।

—তাই ভালো দাদু, তাই চলো।

—হ্যাঁ, তাই চল্‌। আমরা হেঁটে যাব মাঠ পার হয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, নদীর ধার দিয়ে। আমরা নির্ভর করব শুধু ভগবানের উপর। দুজনে আমরা সুখে কাটাব।

—তাই চলো দাদু, এখানে আমরা থাকব না।

—না না, একটি দিনও নয়। কাল সকালেই আমরা চলে যাব। খুব ভোরে—চোরের মত। কেউ শুনবে না—কেউ দেখবে না।

নেলের মন আশায় ও আনন্দে ভরে উঠলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-বর্ষার কথা ওর মনে হলো না। ওর চোখে ভাসতে লাগলো সূর্যের আলো; নদীর স্রোত, সবুজ মাঠ আর উজ্জ্বল বসন্ত দিনের ছবি।

বুড়ো ঘুমিয়ে পড়লো। নেল গুছিয়ে নিলো টুকিটাকি জিনিসপত্র।

ক্রমে রাত ফর্সা হলো। আকাশে তারারা হলো বিবর্ণ, মলিন।

দাদুর হাত ধরে নেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

দরজা খুলে রাস্তায় এসে নেল শুধালো, কোন্‌ পথে যাব?

বুড়ো অসহায়ভাবে তাকালো—প্রথমে নেলের দিকে, তারপর ডাইনে আর বাঁয়ে, তারপর আবার নেলের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়লো।

নেল বুঝলো, এবার থেকে তাকেই পথ দেখাতে হবে।

নির্ভয়ে দাদুর হাত ধরে সে পা বাড়ালো।

ঘুমিয়ে রইলো মহানগরী। দুটি অসহায় যাত্রী চললো এগিয়ে। কোথায়? কত দূরে? কে জানে!

পরদিন সকালে ড্যানিয়েল কুইল্‌প্‌ তো অবাক।

কোথায় গেলো ওই অসহায় শিশু আর ততোধিক অসহায় বৃদ্ধ?

অনেক গোপন টাকাপয়সা কি ছিলো ওদের? তাই নিয়ে কি ওরা পালিয়েছে?

দেখতে দেখতে কুইল্‌পের ভাড়া-করা 'ভ্যান'গুলো সব এসে পড়লো। লোকজন সব চটপট খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, আলমারী-আয়না, বাক্স-ডেস্ক সব তুলতে লাগলো 'ভ্যানে।' কুইল্‌পু দৌড়াদৌড়ি করে সব দেখাশোনা করতে লাগলো।

ওদিকে তার সেই ছোকরা চাকরটা খাবার ঘরে ঢুকে মনের আনন্দে রুটি-মাখন সাটতে লাগলো।

দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ালো কিট।

তাকে দেখেই ডাক দিলো কুইল্‌প্‌, এসো কিট, এসো। আচ্ছা বলতো—তোমার মনিবরা হঠাৎ গেলো কোথায়?

কিট সবিস্ময়ে বললো, চলে গেছে? কিন্তু কোথায় গেছে তাতো আমি জানি না।

—তার মানে তুমি বলতে চাও; তারা যে রাতের আঁধারে এখান থেকে পালিয়েছে তার তুমি কিছুই জান না?

—আজ্ঞে না।

চীৎকার করে উঠলো কুইল্‌প্‌, বাজে কথা বলো না। তারা তোমাকে কিছুই বলে যায় নি এ কি হতে পারে?

কিট কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় পাশের ঘর থেকে ছোকরা-চাকরটা বলে উঠলো, আরে, এখানে যে একটা পাখি রয়েছে। এটার কি করব মশায়?

রাগের মাথায় কুইল্‌প্‌ বললো, ওটার গলাটা ছিঁড়ে ফেলো।

কিট সেই ঘরের দিকে যেতে যেতে বললো, না না, ওটাকে মেরো না। ওটা আমাকে দাও।

ছোকরা চাকরটা বললো, তা হচ্ছে না, উনি যখন বলেছেন, তখন ওর গলা আমি ছিঁড়বই। তুমি বরং খাঁচাটা ধর।

কুইল্‌প্‌ সেখানে এসে বললো, খাঁচাটা আমাকে দিয়ে তোরা দুজনে লড়াই কর্‌। যে জিতবে এটা তার।

তখুনি দুজনের লেগে গেলো মল্লযুদ্ধ। আচড়ে-কামড়ে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার। শেষটায় ছোকরার পেটে এক জবরদস্ত ঘুসি বসিয়ে তাকে কাৎ করে কিট পাখিশুদ্ধু খাঁচাটা নিয়ে সেখান থেকে দিলো এক ছুট।

খাঁচাটাকে বাড়িতে রেখে কিট তখুনি আবার বেরিয়ে গেলো পথে। ঘুরতে লাগলো পাগলের মত। খুঁজতে লাগলো বুড়ো আর নেলকে। কোথায় গেলো তারা!

এক মনে পথ চলেছে কিট।

রাস্তা দিয়ে একটা চার-চাকার ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিলো। গাড়ির চালক একজন সৌম্যদর্শন স্থূলকায় লোক। তার পাশে একটি বৃদ্ধা।

বিখ্যাত নোটারি মিঃ উইদার্ডেনের বাড়ির সামনে ওরা গাড়ি থেকে নামলো।

এদিক-ওদিক চেয়ে মোটা ভদ্রলোক কিটকে ইসারায় কাছে ডেকে বললো; আমরা এই আপিসে একটু কাজে যাচ্ছি। আমার ছেলে এখানে শিক্ষানবীশ। তুমি যদি ততক্ষণ আমাদের গাড়ি ও ঘোড়াটা একটু দেখাশুনা কর তাহলে তোমাকে বকশিস দেব।

কিট রাজি হয়ে গেলো। যাহোক কিছু উপার্জন তো হবে।

আপিস থেকে ফিরে এসে ভদ্রলোক কিটকে একটা ছ'পেনি দেবার জন্য পকেটে হাত দিলো।

কিন্তু পকেটে তো খুচরো নেই। বৃদ্ধার কাছেও নেই।

অগত্যা কিটকে একটা পুরো শিলিং দিয়ে ভদ্রলোক বললো, আসছে সোমবার আমি আবার এখানে আসব। তুমি যদি তখন এখানে থাক, তা হলে আমার ঘোড়া আর গাড়িটাকে দেখাবার কাজটা তোমাকেই দেব। তার জন্য আবার তুমি বকশিস পাবে।

কিট ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলো।

শুধু পরের সোমবারই নয়; কিটের ব্যবহারে খুসি হয়ে ভদ্রলোক ওকে স্থায়ী কাজ দিয়ে নিজের বাড়িতেই নিয়ে গেলো। কিটও নতুন মনিব পেয়ে খুসি হলো।

নতুন মনিবের নাম মিঃ গারল্যাণ্ড। তাঁর ছেলের নাম মিঃ অ্যাবেল।

॥ ছয় ॥

সহরটা হেসে উঠেছে সকালের আলোয়। রাতের অন্ধকারে যা ছিলো কুৎসিত, ভয়াবহ, দিনের আলোয় তাকেই দেখাচ্ছে সুন্দর, হাসিময়।

হাত ধরাধরি করে দুটি যাত্রী পথ চলেছে।

সহরের ইট-কাঠ ছাড়িয়ে; পার হয়ে পথের দুধারের ছোট ছোট বাড়ি-ঘর, ওরা ক্রমে নামলো মাঠের পথে। তারপর একটা ছোট পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাথায় ওরা থামলো।

পিছনে চেয়ে দেখলো, সেণ্ট পলস্ গির্জার ধোঁয়াটে চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। ওরা বুঝলো, লণ্ডনকে ওরা ছাড়িয়ে এসেছে। এইবার তাহলে বিশ্রাম করা যায়।

নেল বুদ্ধি করে তার ছোট ঝুড়িতে ভরে কিছু খাবার এনেছিলো। তাই দিয়ে দুজনে প্রাতরাশ শেষ করলো।

নেল শুধালো, অনেকটা পথ হেঁটে তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?

—না, না, একবার যখন চলে আসতে পেরেছি তখন আর আমি অসুস্থ

হব না। কিন্তু নেল, এখনও তো বিশ্রাম করবার সময় আমাদের আসে নি। অনেক—অনেক দূর আমাদের যেতে হবে। ওঠ।

চললো দুজন।

সুন্দর পথ। দুপাশে সবুজ ক্ষেত আর মাঠ। মাথার উপরে নীল আকাশ। পাখি ডাকছে। মৃদু মৃদু বাতাস বইছে। মৌমাছিরা গান করছে গুণগুণ সুরে।

রাতটা একটা চটিতে কাটিয়ে সকালে আবার ওরা পথে নামলো। সকালের আহার জুটলো এক সদাশয় গৃহস্থের বাড়িতে। তারপর অনেক পথ পার হয়ে ওর পেঁছুলো একটা সহরে।

গির্জার ভিতর দিয়ে শান বাঁধানো পথ। পায়ে লাগবে বলে সে পথ ছেড়ে ওরা কবরের ভিতর দিয়ে নরম মাটির পথ ধরলো।

একটু এগিয়েই দেখে দুটি লোক বসে কি যেন করছে। ভাল করে তাকাতেই ওরা বুঝতে পারলো, এরা দুজন একটা পুতুল নাচের দলের লোক। এক পাশে একটা কবরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা অদ্ভুতদর্শন পুতুল। পায়ের কাছে খোলা রয়েছে একটা মস্ত বড় বাক্স। তার মধ্যে নিশ্চয় আছে পুতুল-নাচের অন্য সব সাজ-সরঞ্জাম। ওরা দুজন এই নির্জন জায়গায় বসে কিছু মেরামতির কাজ সেরে নিচ্ছে। একজন সুতো দিয়ে একটা ফাঁস-কল তৈরী করছে। আরেক জন ছোট হাতুড়ি দিয়ে একটা পুতুলের মাথায় লাগাচ্ছে পরচুল।

বুড়ো জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এখানে বসে কি করছ গো কর্তারা?

একজন জবাব দিলো, এই দেখুন না, রাত্রে খেলা দেখাতে হবে তো; তাই একটু সাজন-গাজন সেরে নিচ্ছি এনাদের। সকলের চোখের সামনে তো আর এ কাজটা করতে পারি না, তাই এই নিরিবিলিতে এসেছি।

—কেন? সকলের সামনে এ কাজ করলে কি হত?

—বারে, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন? আগের থেকে এই সব পুতুলদের দেখে ফেললে কি আর নাচের খেলা দেখতে কারও মন মজবে?

—তা বটে; তা বটে। তাহলে আজ রাতেই তোমার খেলা দেখাচ্ছ?

—আজ্ঞে, তাই তো ইচ্ছে।

অপর লোকটি—তার নাম টমি কডলিন—বলে উঠলো, অথচ কি গেরো দেখুন, এই রাণীর কাপড়টা ছিঁড়ে একেবারে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। একটু যে মেরামত করব, তা সূচ-সুতোটিও সঙ্গে নেই। কি যে হবে—

নেল বলে উঠলো, আমার ঝুড়িতে কিন্তু সূচ-সুতো আছে। বল তো আমি রাণীর শাড়িটা মেরামত করে দি। ও কাজটা আমি তোমাদের চেয়ে ভালই পারব, কি বলো?

ওরা তো এক কথায় রাজি।

নেল ততক্ষণ ঝুড়ি খুলে সুঁচ-সুতো বের করে শাড়ি মেরামত করতে বসে গেলো।

হয়েও গেলো দেখতে দেখতে। ওরা দুজন তো ভারি খুসি। নেলকে অনেক ধন্যবাদ দিলো। শুধালো, আপনারা বুঝি অনেক দূরে যাবেন?

দাদুর দিকে চেয়ে নেল বললো, না-না, আজ রাতে আর এগোব না।

—তাহলে আপনারা এক কাজ করতে পারেন। আমরা যে হোটেলটায় আছি সেখানেই উঠুন। ঐ যে লম্বা নীচু সাদা বাড়ি—ওইটে। খুব সস্তা।

সেই হোটেলেই ওরা উঠলো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর হোটেলের আস্তাবল ঘরটা পরিষ্কার করে পুতুল নাচের আসর বসানো হলো।

নাচ দেখে বার বার হাসিতে ফেটে পড়তে লাগলো বুড়ো। নেলের গলা কিন্তু একবারও শোনা গেলো না। সারা দিনের পরিশ্রমের পর বেচারি তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে বসে বসেই।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা।

পুতুলনাচের দলের ছোট লোকটি—তার আসল নাম হ্যারিস, কিন্তু লোকের মুখে মুখে সে নাম চাপা পড়ে তার নাম দাঁড়িয়েছে ছোট চরকি (পা দুটো তার ছোট বলে)—নেলকে জিজ্ঞেস করলো, এবার তোমরা কোথায় যাবে?

নেল আমতা আমতা করে বললো, ঠিক তো বলতে পারছি না। এখনও কিছু ঠিক নেই।

—দেখ; আমরা এবার যাব ঘোড় দৌড়ের মেলায়। তোমরা যদি সেই দিকেই যাও, তবে আমরা সবাই একসঙ্গে যেতে পারি।

বুড়ো বলে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তোমাদের সঙ্গেই যাব।

নেল এক মুহূর্ত ভাবলো। ভিক্ষেই তো তাকে করতে হবে। তাহলে তো ঘোড় দৌড়ের মেলায় যাওয়াই উচিত। সেখানে অনেক ধনী লোক জমবে। আমোদ-ফূর্তি করবে।

নেল রাজি হলো। হোটেলের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে এক সঙ্গেই ওরা রওনা হলো। সকলের আগে ছোট চরকি। ঘাড়ে একটা বোঁচকা। কাঁধে ঝোলানো একটা তামার শিঙে। তার পিছনে দাদু আর নাতনি পাশাপাশি। সকলের শেষে টমাস কডলিন।

॥ সাত ॥

'জলি স্যাণ্ডবয়েজ' হোটেলে সবাই আস্তানা গাড়লো।

পথেই সবাই একচোট ভিজেছে বৃষ্টিতে। তাই হোটেলে এসে জামা-কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুতেই বুড়ো আর নেল ঘুমিয়ে পড়লো।

হোটেলওলা ভুরু কুঁচকে শুধালো, এরা কারা?

ছোট চরকি বললো, সে জানে না।

—তুমি জান মিঃ কডলিন?

—না। যত সব বাজে লোক এনে জুটিয়েছে—

ছোট চরকি বাধা দিলো, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো না। জান, নিশ্চয় ওই বুড়ো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। দেখছ না, বুড়োটা কেবলি বলছে, আরও এগিয়ে চলো—আরও এগিয়ে। কাজেই ওদের উপর ভাল করে নজর রাখতে হবে। যেন পালিয়ে না যায়। যেমন করেই হোক, ওদের দুজনকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেই হবে। কে জানে, হয়তো সারা লণ্ডন সহরময় ওদের খোঁজে বিজ্ঞাপন লাগানো হয়েছে এত দিনে।

এ-কথা শুনে কডলিনের চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠলো। সে বললো, সত্যি ছোট চরকি, এটা বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ। চাই কি, হয়তো তারা একটা মোটা পুরস্করাও ঘোষণা করেছে এ জন্যে।

ওদের কথাবার্তা আর এগোতে পারলো না। এই সময় নেল আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে উঠে পড়লো।

রাতে বুড়োকে শুইয়ে দিয়ে নেল যেমন নিজের ছোট ঘরটিতে ঢুকে দরজা দিয়েছে, অমনি বাইরে থেকে কে যেন দরজায় টোকা দিতে লাগলো।

দরজা খুলেই দেখে, মিঃ টমাস কডলিন দাঁড়িয়ে।

—কি ব্যাপার মিঃ কডলিন?

—কিছু না, কিছু না দিদি। আমাকে তোমার বন্ধু বলেই জেনো। তুমি হয়তো জান না, কিন্তু তোমার সত্যিকারের বন্ধু আমি—সে নয়।

—কে নয়?

—আমার সংগী ছোট চরকি অর্থাৎ হ্যারিস। আমার একটা কথা মনে রেখো। আমাদের সংগে যত দিন আছ সব সময় আমার কাছে কাছে থাকবে। কখনও কোন অবস্থাতেই আমাকে ছেড়ে যেতে চেষ্টা করো না। মনে রেখো, আমিই তোমার সত্যিকারের বন্ধু—ছোট চরকি নয়।

কথাগুলোকে বারবার বলতে বলতে কডলিন চলে গেলো। নেল খুবই বিস্মিত হলো ওর কথা শুনে। ব্যাপার কি?

পরদিন ভোরেই ঘোড় দৌড়ের মেলায় যাত্রা শুরু হলো। সারাটা পথ সুযোগ পেলেই কডলিন এসে কখনও মুখের কথায় কখনও ভাবে-ভঙ্গীতে নেলকে বোঝাতে লাগলো যে, সেই তার একমাত্র বন্ধু, তার উপরেই যেন সে সর্ব অবস্থায় নির্ভর করে।

নেল তো অবাক। প্রথমটা সে বুঝতেই পারলো না কডলিনের এই ঘনিষ্ঠতার কারণ কি? এমন কি, ছোট চরকিই বা এখন তাদের সঙ্গে এত সদয় ব্যবহার করছে কেন?

বুদ্ধিমতী মেয়ে নেল। ক্রমে সব ব্যাপারটাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এক সময়ে সে দাদুকে একান্তে পেয়ে বললো, জান দাদু, এরা সন্দেহ করেছে যে আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি! তাই ওরা চেষ্টা করছে, আমাদের কোন স্থানীয় ভদ্রলোকের জিম্মা করে দিয়ে বাড়ি পাঠাবে। যেমন করেই হোক এখান থেকে আমাদের পালাতে হবে। তুমি সব সময় আমার কাছে কাছে থাকবে। সুযোগ পেলেই আমরা পালাব। তখন যেন কোন রকম বাধা দিও না, একটা কথাও বলো না। চুপ, ওরা আসছে।

সকাল হতে না হতেই মেলা জমে উঠলো। গাড়ির পর গাড়ি আসতে লাগলো। নানা সাজে সজ্জিত বিচিত্র সব নরনারীর ভিড়। ম্যাজিকওলা, নাচিয়ে কুকুরের দল, নাচের দল, পুতুল খেলা—আরও কত কি। ক্রমে শুরু হলো ঘোড় দৌড়। সে কী ভিড়! সে কী উত্তেজনা!

সকাল থেকেই নেল পালাবার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু কডলিনের চোখকে কিছুতেই এড়াতে পারছে না।

বিকেলের দিকে একটা ভাল দেখে জায়গা খুঁজে কডলিন পুতুল নাচ দেখাবার আয়োজন করলো। দেখতে দেখতে নাচ জমে উঠলো। কডলিন আর হ্যারিসও খেলা নিয়ে মেতে উঠলো।

নেল বুঝলো, পালাবার এই সুবর্ণ সুযোগ। সে সুযোগ তারা হারালো না। গেলো পালিয়ে।

॥ আট ॥

ছুটতে ছুটতে একটা বনের প্রান্তে এসে দুজনে থামলো।

ঘোড় দৌড়ের মেলা আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার দূরাগত শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। কানে আসছে ড্রামের শব্দ।

একটা উঁচু ঢিপির উপর উঠলো মেয়েটি। মেলার নিশানটা বাতাসে উড়ছে। টিকিট-ঘরের সাদা সাদা চূড়াগুলোও চোখে পড়ে।

কিন্তু না, ওদের খোঁজে কেউ আসছে না। স্থানটাও নির্জন—নিস্তব্ধ।

সেখানেই দুজনে খানিক বিশ্রাম করলো। তারপর আবার চললো এগিয়ে। শেওলা-ঢাকা পথে ছোট ছোট পায়ের ছাপ এঁকে আগে আগে লাফিয়ে লাফিয়ে চললো নেল। একটু যায় আর হাতছানি দিয়ে ডাকে দাদুকে।

কখনও বলে, দেখ, দেখ দাদু, গাছের ডালে বসে একলা পাখিটা কেমন গান করছে।

আবার কখনও বলে, দেখ দেখ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে কেমন রোদ আসছে কেঁপে কেঁপে।

এমনি করে ছোট্ট মেয়েটি ভুলিয়ে নিয়ে চললো বুড়োকে।

বন পার হয়ে আবার তারা বড় রাস্তায় পড়লো। মাইল তিনেক হেঁটে পেলো একটা ছোট গ্রাম। মাঠে ক্রিকেট খেলছে ছেলেরা। পথের দুপাশের বাড়ির লোকজন ওদের দেখছে অবাক হয়ে। ওরা এগিয়ে চলে আর ভাবে, কোথায় মিলবে আশ্রয়।

একটা ছোট বাড়ির সামনে বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলো একটি বুড়ো মানুষ। ঘরের জানালার উপর সাদা বোর্ডে কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে 'স্কুল'। নেল বুঝলো, ইনিই পণ্ডিতমশাই।

বুড়ো কানে কানে বললো, ওকেই জিজ্ঞেস করু দিদি।

নেল ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বললো, আমরা বিদেশী। আজ রাতের মত একটু আশ্রয় চাই। অবশ্য আমাদের সাধ্য মত যৎসামান্য কিছু মূল্যও দেব সেজন্য।

পণ্ডিতমশাই এক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, মনে হচ্ছে, তোমরা অনেক পথ হেঁটে এসেছ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক পথ।

নেলের মাথায় হাত রেখে বুড়োর দিকে চেয়ে পণ্ডিতমশাই শুধালেন, এটি বুঝি আপনার নাতনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

—আপনারা ভিতরে আসুন। আজ রাতের মত এই গরীবের কুটিরেই আপনারা বিশ্রাম করুন।

ধন্যবাদ দেবার অবসর না দিয়েই পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর একটা চাদর বিছিয়ে ওদের খাবার আয়োজন করে দিলো।

খেতে খেতে নেল ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো। সর্বাঙ্গে কালি-মাখা কতকগুলো টুল ও বেঞ্চ রয়েছে চারদিকে। একপাশে পণ্ডিতমশায়ের ডেস্ক। দেয়ালে সুন্দর হস্তাক্ষরে অনেকগুলো নীতিবাক্য লেখা রয়েছে।

নেলের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে পণ্ডিতমশাই বললো, হাতের লেখাটা খুব ভাল নয় কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ভাল। আপনার বুঝি ?

চোখের চশমাটা একবার খুলে আবার পরতে পরতে পণ্ডিতমশাই বললো, আমি ? না না, আমি আর এত সুন্দর করে এখন লিখতে পারি না। ওগুলো তোমার মতই ছোট একটি ছেলের লেখা। বয়সে হয়তো তোমার চেয়ে ছোটই হবে। কি লেখাপড়ায় আর কি খেলাধুলায়, ছেলেটি একেবারে চমৎকার। তাছাড়া, আমাকেও সে ভালবাসে, ভক্তি করে। আমি তাকে ভালবাসি. এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কিন্তু আমাকে যে ও ভালবাসে—

পণ্ডিতমশাই আর বলতে পারলো না। চোখের চশমাটা খুলে মুছতে লাগলো। একটু পরে আবার বললো, আমি আশা করেছিলাম, আজ সে একবার আসবে। কিন্তু দেখছি, আজও সে আসতে পারলো না। অবশ্য না আসাই ভালো। বড্ডো শিশির পড়ছে সন্ধ্যার দিকে।

নেল শুধালো, তার বুঝি অসুখ করেছে ?

—না, এমন কিছু নয়। তবে মাথাটা নাকি খুব ধরেছে ? আচ্ছা, চলো এবার, তোমাদের শোবার ব্যবস্থা করে দি।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে নেল দেখলো, পণ্ডিতমশাই আগেই উঠেছে। নমস্কার করে নেল শুধালো, ছেলেটি আজ কেমন আছে পণ্ডিতমশাই ?

পণ্ডিতমশাই দুঃখিত কণ্ঠে বললো, না, ভাল নয়। একটু যেন খারাপের দিকে যাচ্ছে রোগটা।

সকাল বেলাকার খাবার আয়োজনটা নেল নিজের হাতেই করলো। খেতে খেতে পণ্ডিতমশাই বললো, দেখুন, আপনাকে বড়ই পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। এ অবস্থায় আমার এখানে আর একটি রাত কাটিয়ে গেলে আমি খুবই খুসি হতাম।

বুড়ো নেলের দিকে চেয়ে বললো, কি করবিরে দিদি ? থেকে যাবি আর একটা রাত ?

থাকাই স্থির হলো।

দুপুরবেলা স্কুল বসলো। চঞ্চল মন নিয়েই পণ্ডিতমশাই ছেলেদের পড়ালো। সারাদিন নেলকে বসিয়ে রাখলো পাশে। বেলা পড়তেই সেদিন স্কুল ছুটি হয়ে গেলো। ছেলেরা একে একে নমস্কার করে বাড়ি চলে গেলো।

সন্ধ্যার দিকে একটি বুড়ি ছুটতে ছুটতে এসে বললো, আপনি শিগ্গির একবার ডেম ওয়েস্টের বাড়ি যান। এখুনি।

পণ্ডিতমশাই নেলের হাত ধরে একটু বেড়াবার জন্যই তৈরী হয়েছিল। সেই অবস্থায়ই নেলকে নিয়ে সে ছুটলো ওয়েস্টের বাড়ির দিকে।

একটা ছোট ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতেই একটি বুড়ো স্ত্রীলোক ডুকরে কেঁদে উঠলো।

পণ্ডিতমশাই বললো, অবস্থা কি সত্যি খুব খারাপ ?

—পণ্ডিতমশাই গো, আমার নাতি যে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। হায় হায়! আমার কি হবে! আপনার জন্যেই আমার কপাল ভাঙলো গো! পড়ে পড়েই বাছা আমার মারা গেলো!

পণ্ডিতমশাই শান্তস্বরে বললো, বৃথাই তুমি আমাকে দোষারোপ করছ মা। পড়াশুনা করলে কি কেউ মারা যায় ? ও তোমার বুঝবার ভুল।

—না না, ভুল নয়। দিন রাত বইয়ের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থেকেই বাছা আমার এমন হয়ে গেলো।

আর কথা না বাড়িয়ে পণ্ডিতমশাই নেলকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলো। তার রুগ্ন শিশু-বন্ধুটি বিছানায় নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে। একেবারে কচি ছেলেটি। একরাশ কোঁকড়ান চুল মুখময় ছড়িয়ে আছে। দুটি চোখ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সে উজ্জ্বলতা বুঝি মর্তের নয়, স্বর্গের।

পাশে বসে পণ্ডিতমশায় মৃদু স্বরে ওর নাম ধরে ডাকলো। তন্দ্রা থেকে জেগে উঠেই ছেলেটি দুই হাতে পণ্ডিতমশায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, আপনি এসেছেন পণ্ডিতমশাই ?

—আসব বই কি বাবা, নিশ্চয় আসব।

—এ মেয়েটি কে ? আমি তো উঠতে পারছি না, আপনি ওকে বলুন না আমার হাতটা ধরতে।

নেল এগিয়ে গিয়ে সাদরে ওর শীর্ণ হাতখানি দুই হাতে চেপে ধরলো।

পণ্ডিতমশাই বললো, হ্যারি, আমার সেই বাগানের কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে আমরা কত আনন্দে কাটাতাম। তাড়াতাড়ি তুমি ভাল হয়ে ওঠ, তবে তো আবার সেখানে যেতে পারবে—

ছেলেটি হাসলো। বড় করুণ সে হাসি। তারপর বৃদ্ধ বন্ধুর জীর্ণ হাতের উপর রাখলো তার শীর্ণ হাতখানি।

খোলা জানালা দিয়ে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। চোখ খুলে ছেলেটি শুধালো, ও কি ?

—ছেলেরা মাঠে খেলা করছে।

বালিসের পাশ থেকে রুমালখানা নিয়ে ও নাড়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দুর্বল হাতটা কিছুতেই তুলতে পারলো না।

পণ্ডিতমশাই বললো, দাও, আমি নাড়ছি।

—দয়া করে এটাকে জানালায় বেঁধে দিন। হয়তো জানালায় রুমাল উড়তে দেখলে ওদের আমার কথা মনে পড়বে।

ছেলেটির চোখের দৃষ্টি ক্রমেই কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলো। এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো লক্ষ্যহীন ভাবে।

পণ্ডিতমশাই গভীর আবেগে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। অনেকক্ষণ আলিঙ্গণে আবদ্ধ হয়ে রইলো দুই পুরনো বন্ধু—এক বৃদ্ধ আর এক শিশু। তারপর ছেলেটি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

শেষ ঘুম। পণ্ডিতমশাই বুঝলো সব। তবু অন্তরের সকল দরদ ঢেলে ওর শীর্ণ হাতে হাত বুলাতে লাগলো।

পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে নেল বাড়ি ফিরে এলো। গভীর দুঃখে অভিভূত হয়েছে ও নিজেও। মৃত শিশুটিও যে এক বৃদ্ধার একমাত্র পৌত্র!

পরদিন সকালে ওরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো।

দরজার কাছে এসে পণ্ডিতমশাই বললো, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। বড় নির্জন আমার জীবন। এবার থেকে হলো নির্জনতর। যদি কখনও আবার এ-পথে আস, এই ছোট স্কুলটিকে যেন ভুলো না।

নেল বললো, কখনও ভুলব না। ভুলব না আপনার দয়া, আপনার স্নেহের কথা।

বিদায়ের পালা শেষ করে আবার সুরু হলো যাত্রা।

দিন পার হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো প্রায়। রাস্তার বাঁক ঘুরতেই ওরা দেখতে পেলো, এক পাশে আস্তানা গেড়েছে একদল যাত্রী। পায়ে-হাঁটা যাত্রী তারা নয়, একখানি সুসজ্জিত গাড়ির উপর বসে চায়ের আসর জমিয়েছে তারা। খোলা দরজার একেবারে পাশেই বসে আছে একটি সুসজ্জিতা খৃষ্টান মহিলা।

চা-টা শেষ করে মুখ তুলতেই মহিলাটির নজর পড়লো নেল ও তার দাদুর উপরে। হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলো, এই—এই মেয়েটি, বলো তো হেল্টার-স্কেল্টার প্লেটটা কে জিতলো শেষ পর্যন্ত?

নেল জবাবে বললো, কি জিতলো?

—ঘোড়দৌড়ের মেলায় হেল্টার-স্কেল্টার প্লেট?

—আমি জানি না মাদাম।

—জান না? সে কি? তুমি তো সেখানে ছিলে। আমি নিজের চোখে তোমাকে দেখেছি।

এ-কথা শুনে নেল ঘাবড়ে গেলো। এই সেরেছে! ইনি আবার হ্যারিস ও কডলিনের পরিচিত নন তো!

মহিলাটি মুখ বেঁকিয়ে বললো, ওই সব বাজে সঙের দলের সংগে তোমার মত একটি মেয়েকে দেখে সত্যি আমি দুঃখিত হয়েছিলাম।

ভয়ে ভয়ে নেল বললো, ইচ্ছে করে ওদের সংগে আমরা যাই নি। আমরা পথ চিনি না। ওরা দুজন দয়া করে খানিকটা পথ আমাদের সংগে করে এনেছিল। আচ্ছা, আপনি কি ওদের চেনেন মাদাম ?

আতংকে যেন চেঁচিয়ে উঠলো মহিলাটি, ওদের চিনব আমি ? তুমি বলো কিগো মেয়ে ? ওরা হলো যত সব হা-ঘরে হতচ্ছাড়া লোক। আর ওদের চিনব আমি ?

—আমাকে মাফ করুন। আমি সে ভাবে কথাটা বলিনি।

মহিলাটি এবার একটু নরম হলো। ওকে ইসারায় কাছে ডেকে শুধালো, তোমার কি ক্ষিধে পেয়েছে ?

—না না, খুব বেশী নয়। তবে আমরা খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। মানে —অনেকটা পথ—

—বুঝেছি। ক্ষিধে পাক আর না পাক, একটু চা খাও। আশা করি, আপনারও এতে কোন আপত্তি নেই ?

বুড়ো মাথার টুপি খুলে ধন্যবাদ জানালো।

মহিলাটি নেমে এসে ঘাসের উপরেই ওদের চায়ের আয়োজন করে দিলো। বললো, এইবার তোমরা খেয়ে নাও। কিছু ফেলো না যেন।

খাওয়া শেষ হলে মহিলাটি বললো, হেঁটে যেতে তোমাদের দুজনের খুব কষ্ট হবে। কিছুটা পথ বরং তোমরা আমাদের গাড়িতেই চলো।

প্রস্তাব শুনে নেল ভারি খুসি হলো। মহিলাটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে দাদুর হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলো।

॥ নয় ॥

গাড়িতে যেতে যেতে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়লো।

মহিলাটি তখন নেলকে শুধালো, কিগো মেয়ে, এ রকম বেড়াতে তোমার কেমন লাগে ?

নেল ঘাড় নেড়ে বললো, খুব ভাল।

মহিলাটি অনেকক্ষণ নেলের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর উঠে গিয়ে গাড়ির এক কোণ থেকে গজখানেক চওড়া একটা জড়ানো ক্যানভাস এনে নেলের সামনে খুলে ধরলো। বললো, এইটে পড় তো।

নেল বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা কথাগুলো পড়লো; 'জার্লি'র মোমের পুতুল'।

—আবার পড়।

—জার্লি'র মোমের পুতুল।

—এ সব আমার। আমার নাম মিসেস্ জার্লি'।

পর পর আরও অনেকগুলো ক্যানভাস খুলে মিসেস্ জার্লি' নেলকে দেখালো। তাতে নানা রকম কথা লেখা, অনেকটা প্রাচীর-পত্রের মত। কোনটায় লেখা 'একশত পূর্ণাবয়ব মূর্তি'। কোনটায় বা লেখা, 'অদ্য প্রদর্শনী খোলা'। অথবা 'জার্লি'র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগ্রহ'। ইত্যাদি।

সবগুলো প্রাচীর-পত্র দেখিয়ে মিসেস্ জার্লি' আবার সেগুলোকে গুটিয়ে রাখলো।

নেল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সব মোমের পুতুল কি এই গাড়িতেই আছে?

—এই গাড়িতে? তুমি বলো কি গো মেয়ে? এত সব মোমের পুতুল কি এই গাড়িতে ধরে? সে-সব আগেই চলে গেছে আর একটি গাড়িতে। পরশু দিন প্রদর্শনী খোলা হবে সহরে। আশা করি, তুমিও দেখতে যাবে।

—কিন্তু আমরা তো সহরে থাকব না।

—তাহলে কোথায় থাকবে?

—আমি—আমি ঠিক জানি না।

—বলো কি? তোমরা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, অথচ কোথায় যাবে তা জান না। বড় তাজ্জব কথা। আচ্ছা, তোমরা কি? ভবঘুরে নও নিশ্চয়?

—আমরা যে কি তাও জানি না। ভিখারীও বলতে পারেন।

—বালাই, বালাই। এমন কথা জন্মে শুনি নি। তুমি পড়তে পার সে তো দেখলামই। হয়তো লিখতেও জান।

—তা জানি।

—ওই লেখাপড়াটাই আমি কিছু জানি না।

—সত্যি!

আর কথা না বাড়িয়ে নেল ওপাশে সরে দাদুর পাশে গিয়ে বসলো। দাদুর ঘুম এখন ভেঙেছে।

মিসেস্ জার্লি' তখন কোচয়ানকে নীচে ডেকে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করলো। তারপর নেল ও বুড়োকে কাছে ডেকে বললো, দেখুন, আপনার নাতনির জন্যে একটা কাজ যদি চান তো আমি দিতে পারি।

বুড়ো জবাব দিলো, সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু ওকে ছেড়ে তো আমি থাকতে পারব না। ও কাছে না থাকলে আমি বাঁচব কেমন করে?

মিসেস জার্লি বিরক্ত হয়ে বললো, আমি ভেবেছিলাম নিজের ভার আপনি নিজেই নিতে পারবেন।

নেল জোর গলায় বললো, সে উনি আর কোন দিনই পারবেন না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য আমাদের দুজনকে ভাগ করে দিলেও আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে পারব না।

মিসেস্ জার্লি বুড়োর দিকে চেয়ে বললো, বেশ তো, না হয় আপনাকেও একটা কাজ দেব। মূর্তিগুলো ঝাড়া পোছা করা, টিকিট বেচা—এই সব কাজ। আর আপনার নাতনি? তার কাজ হবে দর্শকদের মূর্তিগুলি দেখিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বলা। ও কাজটা এতদিন আমি নিজেই করেছি। কিন্তু বয়স হয়েছে, এখন আর পেরে উঠি না। তাই ওকে নিতে চাই। দুদিনেই সব কাজ ওকে আমি শিখিয়ে দিতে পারব।

নেল দাদুর সঙ্গে পরামর্শ করে বললো, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজী আছি।

—বেশ, বেশ। এজন্য কখনও তোমাদের পস্তাতে হবে না। ভুলে যেও না এটা বিখ্যাত জার্লির মোমের পুতুল। আর হ্যাঁ, মাইনের কথাটা একটু বলে নেওয়া দরকার। ওর কাজ না দেখে ঠিক কি মাইনে দিতে পারব সেটা বলতে পারছি না। তবে আপনাদের দুজনের থাকা-খাওয়া এবং সেটা বেশ ভালো ভাবেই যাতে হয় সে ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। তাহলে ওই কথাই পাকা হয়ে গেলো। আসুন এবার একটু খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

রাত প্রায় বারোটা নাগাদ ওরা সহরে পেঁছুল।

এত রাতে আর প্রদর্শনী-গৃহে না গিয়ে ওরা বাইরের খোলা মাঠেই আর একটা গাড়ির পাশে আস্তানা নিলো। আগের গাড়িটায় করে মালপত্র সব প্রদর্শনী গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজেই সে খালি গাড়িটাতেই বুড়োর শোবার ব্যবস্থা হলো। নেল শোবে মিসেস্ জার্লির ঘরে।

যতদূর সম্ভব পরিপাটি করে দাদুর বিছানা করে দিয়ে নেল নিজের গাড়িতে যাচ্ছিলো। বাইরে চমৎকার রাত। মৃদু মৃদু হাওয়া। আকাশে ভরা চাঁদ। যেতে যেতে নেল ভাঙা প্রাচীরের এক কোণে একটা অন্ধকার ছায়ায় একটু দাঁড়ালো।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রাচীরের অপর প্রান্তে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো আর একটি ছায়ামূর্তি। তাকে দেখেই নেল চিনতে পারলো—সে মূর্তি কুৎসিতদর্শন কুইল্‌পের।

তাড়াতাড়ি নেল আরও একটু গাঢ় অন্ধকারে সরে গেল। তার একটু দূর দিয়েই চলে গেলো কুইল্‌প্। হাতে একটা লাঠি।

খানিকটা গিয়ে সে ফিরে তাকালো। তারপর হাতের ইসারায় ডাকলো।

নেলকে? কী সর্বনাশ!

না, তাকে নয়। ও পাশ থেকে বেরিয়ে এলো আর একটি ছায়ামূর্তি একটি ছেলে। তার পিঠে একটা ট্রাংক।

কুইল্প্ ফিস্ ফিস্ করে বললো, আরও পা চালিয়ে আয়।

ছেলেটি জবাব দিলো, আমি বলে চলতে পারছি। যা ভারী বোঝা!

—হয়েছে। এখন শিগ্গির আয়। আমার আবার দেরী হয়ে যাবে।

কুইল্প্ আগে আগে চললো। ছেলেটা যত দ্রুত সম্ভব তার পাশে পাশে চলতে লাগলো।

যতক্ষণ ওদের দেখা গেলো, নেল এক পা নড়তে সাহস পেলো না। ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই এক দৌড়ে ও গেলো দাদুর গাড়িতে। ওই বামনটাকে দেখে অন্ধকারে দাদু যদি ভয় পেয়ে থাকে!

না, দাদু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নিঃশব্দে নেল সেখান থেকে চলে এলো।

পরদিন সারা সকাল নেল মিসেস্ জার্লির কাছ থেকে কাজ বুঝে নিলো। একটা উইলো গাছের লাঠি দিয়ে এক একটা পুতুলের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে আর গড় গড় করে বলতে হবে তার পরিচয়। কত রকমের যে মূর্তি। রাণী এলিজাবেথের সহচারী, বিবাহ-বিশারদ জ্যাসপার প্যাকল্মার্টন থেকে সুরু করে রাজা তৃতীয় জর্জ, মেরি কুইন অব স্কট্স্, মিঃ পিট, কবি কুপার, লর্ড বায়রন পর্যন্ত।

মিসেস্ জার্লি খুব খুসি হলো নেলের স্মরণশক্তি দেখে। এক বেলার চেষ্টায়ই সব কিছু সে আয়ত্ত করে নিলো।

নেলও খুসি। ওদের প্রতি মিসেস্ জার্লি খুব সদয় ব্যবহার করছে। দাদু এখানে আছেও হাসি-খুসিতে।

কেবল কুইল্পের ছায়ামূর্তির কথা মনে হলেই ও আতংকিত হয়ে ওঠে। আবার যদি সে ফিরে আসে!

কুইল্প্ নেলের কাছে এক দুঃসহ দুঃস্বপ্ন।

॥ দশ ॥

এই কাহিনীর ধারাকে অনুসরণ করতে হলে এবার আমাদের মিঃ স্যাম্পসন ব্র্যাসের পারিবারিক অর্থনীতির সংগে একটু পরিচিত হওয়া দরকার। অতএব লেখক এবার সহৃদয় পাঠকের হাত ধরে একেবারে মিঃ ব্র্যাসের বাড়িতে এসেই হাজির হলো।

একটি ছোট অন্ধকার বাড়ি। ভাঙাচোরা আসবাবপত্র। ধুলোবালি আর মাকড়শার ঝুল।

দরজায় একটা প্লেট লাগানো : 'ব্র্যাস, সলিসিটর'। আর একটা কাগজ ঝোলানো রয়েছে। তাতে লেখা : 'দোতলাটা কোন একক ভদ্রলোককে ভাড়া দেওয়া যাইবে।'

সলিসিটরের আপিসে দুটি মাত্র প্রাণী—মিঃ ব্র্যাস স্বয়ং আর তার একাধারে কেরাণী, সহকারী, গৃহকর্ত্রী ও সচিব মিস্ স্যালি ব্র্যাস, তার বোন।

এহেন সলিসিটরের বিল-বইয়ের পাতা যদি ওল্টানো যায় তাহলে দেখা যাবে তাতে পাতার পর পাতা শুধু একটি মক্কেলেরই নাম লেখা রয়েছে : ড্যানিয়েল কুইল্প্, এস্কোয়ার—ড্যানিয়েল কুইল্প্, এস্কোয়ার ইত্যাদি।

একদিন সকাল বেলা সেখানে এসে হাজির হলো কুইল্প্। সঙ্গে মিঃ রিচার্ড স্থইভেলার ওরফে ডিক।

দুচার কথায়ই ঠিক হয়ে গেলো যে ডিক সেদিন থেকেই মিঃ ব্র্যাসের আপিসে চাকরি করবে। তারপরই কুইল্প্ সলিসিটরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। বলে গেলো, ব্যবসা সংক্রান্ত একটা জরুরী কাজ আছে।

তখনই কাজে বসে গেলো ডিক।

একটু পরে মিস্ স্যালিও বাইরে চলে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো, আপিসের কাজে যদি কেউ আসে তাহলে তার দরকারটা লিখে রেখে পরে আসতে বলে দেবেন। কেমন?

ডিক বললো, তাই হবে ম্যাডাম।

ঘরময় পায়চারি করতে করতে ডিক আপন মনেই বলতে লাগলো, তাহলে ব্র্যাসের কেরাণীই হলাম। আবার মিস্ ব্র্যাসের মতো ভয়ংকর মহিলাটির কেরাণীও বটে। কুইল্প্ তো বললো, এ চাকরি আমার পাকাপোক্ত। ভালই হলো। মাসি তো দেশ থেকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে। লিখেছে, নতুন উইলে আমাকে কিছুই দেয় নি। হাতেও টাকা নেই। বাড়িওয়ালাও নোটিশ দিয়েছে। ভেবেছিলাম ভেসেই বুঝি যাব, যাহোক তবু একটা আস্তানা তো জুটলো। ভাগ্যের খেলাই এমনি। ডুবতেও সময় লাগে না, ভাসতেও সময় লাগে না।

বাইরে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। নড়ে উঠলো দরজার কড়া। কিন্তু না, আপিসের নয়, দোতলার দরজায় কড়া নড়ছে। অতএব তার কিছু করবার নেই।

এবার আপিসের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

ডিক বললো, ভিতরে আসুন।

একটি কচি গলায় জবাব এলো, দয়া করে একবার আসুন না, উপরের ঘরটা একটু দেখাবেন।

ডিক মুখ তুলে দেখলো, একটি কচি মেয়ে ময়লা জামা পরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

—তুমি আবার কে?

জবাব এলো, দয়া করে উপরের ঘরটা একটু দেখাবেন। কে যেন ভাড়া করতে এসেছেন। সপ্তাহে আঠারো শিলিং ভাড়া। শীতের সময় আগুনের জন্যে দৈনিক আট পেনি বেশী।

—কিন্তু তুমি কে? এ বাড়ির রাঁধুনি?

—হ্যাঁ, আমি রাঁধি। অন্য সব কাজও করি।

ডিক তখন নিজের পদমর্যাদা বোঝাবার জন্য দুই কানে দুটো কলম গুঁজে আর একটি মুখে নিয়ে দোতলায় গিয়ে হাজির হলো।

একক ভদ্রলোক ভাড়ার সব শর্তে রাজি হয়ে দশ পাউন্ড আগাম দিয়ে তখনই দোতলাটা ভাড়া নিলো। তারপর জুতো জামা খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। একবার শুধু মুখ তুলে বললো, আমি ঘণ্টা না বাজানো পর্যন্ত কেউ আমাকে বিরক্ত করো না। তারপর নাক ডাকাতে সুরু করলো।

আশ্চর্য মানুষ এই একক ভদ্রলোক। না চাইতেই পাওনা মিটিয়ে দেয়। কোন রকম গোলমাল করে না। সকাল সকাল বাড়ি ফেরে। আর যেখানে যত সঙের দল আর পুতুল নাচের দল পায় তাদেরই ডেকে এনে খেলা দেখে।

সঙের দলের বাজনা যেই কানে গেলো, জেগেই হোক আর ঘুমিয়েই হোক, লোকটি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। সমস্ত দলটাকে ডেকে এনে খেলা দেখবে একান্ত মনোযোগ দিয়ে। খেলা ভেঙে গেলে দলপতিকে ডেকে নিয়ে যাবে উপরে। তাদের খাওয়াবে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে গোপনে কি যে আলোচনা করে তা কেউ জানে না।

এমনি করেই দিন কাটে।

একদিন পুতুল-নাচের দল নিয়ে সেখানে হাজির হলো কডলিন ও হ্যারিসের দল।

খেলা শেষে একক ভদ্রলোক ওদের দুজনকে ডেকে নিয়ে গেলো দোতলায়। নানা কথার পর জিজ্ঞেস করলো, পশ্চিম ইংলণ্ডের অনেক জায়গায় তো তোমরা ঘুরে বেড়াও, একটি বুড়ো আর একটি ছোট মেয়েকে কোথাও দেখেছ?

ওরা জবাব দিতে ইতস্তত করছে দেখে লোকটি আবার বললো, ভয়ের কিছু নেই। এরকম দুটি লোকের খবর জান তো বলো। তাদের খোঁজ দিতে পারলে অনেক টাকা পুরস্কার পাবে।

ওরা তখন সব কথাই খুলে বললো। লোকটি ঘরের এধার-ওধার পায়চারি করতে করতে বললো, হায় ভগবান; এত কাল পরে যদি বা একটু আলোর দেখা পেলাম, তাতেও কোন ফল হলো না।

কয়েকদিন পরে।

কিট যথারীতি মিঃ অ্যাবেলকে নিয়ে নোটারির আপিসে পৌঁছে দিয়ে বাইরে বিশ্রাম করছিলো। বেয়ারা এসে বললো, হুজুর ডাকছেন, ভিতরে যাও।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই মিঃ উইদার্ডেন বললো, এই যে এসো ক্রিস্টোফার।

একপাশে বসেছিলো আমাদের পরিচিত সেই একক ভদ্রলোক। সে শুধালো, এই বুঝি সেই ছেলেটি ?

—হ্যাঁ, আমার মক্কেল মিঃ গারল্যাণ্ডের চাকর। বড় ভাল ছেলেটি। ওর কথায় আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন।

একক ভদ্রলোক এবার মিঃ অ্যাবেলের দিকে চেয়ে বললো, আপনি যদি অনুমতি করেন তো ওকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।

অ্যাবেল বললো, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

একক ভদ্রলোক বললো, দেখুন, এর আগে এই ছেলেটি যাঁর কাছে কাজ করত তাঁকেই আমি খুঁজছি। সে অঞ্চলে অনেক খোঁজাখুঁজি করে তবেই এই আপিসের সন্ধান পাই। তাই এখানে এসেছি।

ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাবে কিট একে একে সব কথাই বললো। আরও জানালো, সে বাড়িটা মিঃ কুইল্‌প্‌ কিনে নিলেও সেটা এখন ভাড়া দেওয়া হবে আর সে সম্পর্কে কথা বলতে হবে বেভিস্‌ মার্কসের মিঃ স্যাম্পসন ব্র্যাস সলিসিটরের সংগে। কাজেই সেখানে গেলেই—

হেসে বাধা দিলো ভদ্রলোক, যাবার দরকার নেই, আমি সেই বাড়িতেই থাকি।

মিঃ উইদার্ডেন সবিস্ময়ে বলে উঠলো, সে কি ? আপনি ব্র্যাসের বাড়িতে থাকেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই পুরনো বাড়িতে টাঙানো নোটিশটা দেখে ইচ্ছা করেই আমি ব্র্যাসের বাড়ি ভাড়া করেছি।

মিঃ উইদার্ডেন বললো, কিছু মনে করবেন না, ওই লোকটির একটু কুখ্যাতি আছে বলে শোনা যায়।

—শোনা যায় কেন, সত্যি তাই। লোক ওরা ভাল নয়। সে যাহোক, কিট, এই নাও তোমার বকশিস। তুমি যদি একটু কষ্ট করে মাঝে মাঝে আমার ওখানে যাও, তাহলে খুসি হব।

কিট টুপি খুলে নমস্কার করলো। একক ভদ্রলোক মিঃ উইদার্ডেন ও মিঃ অ্যাবেলকে নমস্কার জানিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে গেলো।

॥ এগার ॥

কিছুদিন পরের কথা।

নিস্তব্ধ রাত্রি। একটা গাছের নীচে চুপ করে বসে আছে নেল। বসে বসে ভাবছে। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। দাদুর আর তার মধ্যে ক্রমেই যেন ব্যবধান গড়ে উঠছে। এই ফাঁক ওর কাছে অসহনীয়। প্রতি সন্ধ্যায় এমন কি কখনও দিনের বেলাতেও দাদু একাকি কোথায় যে চলে যায়!

দূরের গির্জার ঘড়িতে নটা বাজলো। নেল উঠে সহরের দিকে পা বাড়ালো।

একটা ছোট কাঠের পুল পার হতেই মাঠের মধ্যে একটা আলো ওর চোখে পড়লো। ভালো করে চেয়ে দেখলো, একটা বেদেদের তাঁবু থেকে আলোটা আসছে। কারা যেন শুয়ে বসে রয়েছে আলোর চারপাশে।

কৌতূহলী হয়ে নেল সেই দিকে এগিয়ে গেলো। খানিকটা গিয়েই ওর আর আগুনটার মাঝখানে একটা মানুষের মূর্তি দেখেই চমকে উঠলো নেল। মূর্তিটা যেন চেনা-চেনা লাগছে।

আরও একটু এগুলো নেল। এবার কানে আসছে ওদের কথাবার্তা। তার কিছুই ও বুঝতে পারছে না। কিন্তু গলার স্বরটা যেন পরিচিত।

মূর্তিটা এবার উঠে দাঁড়ালো। একটা লাঠির উপর দুহাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা দেখেই নেল স্পষ্ট চিনতে পারলো লোকটিকে। ওর দাদু।

প্রথমেই নেলের মনে হলো, দাদুকে ডাকে। কিন্তু আর সব এরা কারা? কেনই বা সবাই এখানে এসেছে?

আসল ব্যাপারটা জানবার জন্যে নেল ঝোপের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আগুনটার আরও কাছে এগিয়ে গেলো।

একটা ষণ্ডাগোছের ঢ্যাঙা বেদে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একবার আগুনের দিকে একবার অপর তিনটি মানুষের দিকে তাকাচ্ছে। তিনজনের একজন ওর দাদু।

ষণ্ডা লোকটি ওর দাদুর দিকে চেয়ে বললো, এতক্ষণ তো বাড়ি যাবার জন্যে খুব তাড়া দিচ্ছিলে, এখন যাও না বাড়ি।

দাদু সখেদে বলে উঠলো, আমার সর্বস্ব লুটে নিয়ে এখন আমার সঙ্গে তামাসা করছ? তোমরা কি আমাকে পাগল করে ছাড়বে?

আইজাক লিট নামক লোকটি বললো, ওর প্রতি অত কঠোর হয়ো না জোল, ওকে বরং কিছু ধার দাও।

জোল বললো, সে তো আমি দিতে রাজীই আছি। টাকা নাও, যখন পার ফেরৎ দিও। আবার বাজি ধরো। নিশ্চয় জিতবে।

আইজাক লিট বললো, নিশ্চয়। তাছাড়া শোধ দেবার ভাবনা কি। পুতুল খেলার বৃদ্ধ মহিলা যখন শোবার আগে একটা টিনের বাক্সে সব টাকা পয়সা রাখে, আর আগুনের ভয়ে দরজায় খিল দেয় না, তখন তো ব্যাপারটা ভারি সোজা। একেবারে যাকে বলে পুরো ভাগ্য! কি বলো?

বুড়ো বললো, হ্যাঁ, তাই করব।

জোল জোর দিয়ে বললো, তাহলে আজ রাতেই—

—না; আজ দেরি হয়ে গেছে। তাড়াহুড়া করলে হবে না। ধীরে সুস্থে কাজ হাসিল করতে হবে। বরং কাল রাতে।

—বেশ, কাল রাতেই হোক। আজ একটু গলা ভিজিয়ে নাও। কপাল খুলে যাক। নাও, ঢালো।

চারটে টিনের কাপে মদ ঢেলে চার জন নিলো। খাবার আগে বুড়ো কাপটাকে একপাশে সরিয়ে রাখলো। অস্ফুট স্বরে নেলের নাম নিয়ে কি যেন প্রার্থনা করলো। তারপর সকলের সঙ্গে করমর্দন করে সেখান থেকে চলে গেলো।

যতক্ষণ ওঁকে দেখা গেলো তিনজন সেই দিকে চেয়ে রইলো। তারপর হো হো করে হেসে উঠলো।

আতঙ্কে শিউরে উঠলো নেল। ওদের অলক্ষ্যে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো বাসার দিকে।

বিদ্যুৎ চমকের মতো ওর মনে হলো, পালাতে হবে—এই মুহূর্তে পালাতে হবে। বুড়োকে টানতে টানতে নিয়ে পালাতে হবে। না খেতে পেয়ে পথের পাশে মরে পড়ে থাকবে, তবু এই লোভের সামনে বুড়োকে কিছুতেই থাকতে দেবে না।

রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাসায় ফিরে নেল সকলের আগে মিসেস্ জার্লির ঘরে ঢুকলো।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! দাদু সে ঘরে নেই। অকাতরে ঘুমুচ্ছে মিসেস্ জার্লি।

নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করলো নেল। ঘুম এলো না। আলুথালু বেশে ছুটে গেলো বুড়োর ঘরে। হাত ধরে তাঁকে টেনে তুললো ঘুম থেকে।

চমকে উঠে নেলের ভূতে-পাওয়া মুখের দিকে চেয়ে বুড়ো চেঁচিয়ে উঠলো, কি করছিস্ ?

নেল বললো, একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি দাদু। আগেও একদিন দেখেছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম, ঠিক তোমার মত মাথাভর্তি পাকাচুল একটি লোক রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকের টাকা নিয়ে পালাচ্ছে। ওঠ দাদু, শিগ্‌গির ওঠ।

বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে প্রার্থনার ভঙ্গীতে দুই হাত এক করলো।

—আমার কাছে নয়, প্রার্থনা করো ভগবানের কাছে। উঃ, বড় ভীষণ সে স্বপ্ন। আমি ঘুমুতে পারছি না। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে পারছি না। ওঠ, আমাদের পালাতে হবে।

বুড়ো থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

—চুপ করে থেক না দাদু। ওঠ। চলে এস আমার সঙ্গে।

—এই রাতে ?

—হ্যাঁ, এই রাতে। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আমি পারব না। তাহলে হয় তো স্বপ্ন সত্য হয়ে দাঁড়াবে। ওঠ।

বুড়ো বিছানা ছেড়ে উঠলো। দারুণ ভয়ে তাঁর কপাল ঘেমে উঠেছে। নেল তাঁর হাত ধরে নিয়ে চললো।

মিসেস্ জার্লির ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় নেল বুড়োর মুখের দিকে একবার তাকালো। বিবর্ণ সাদা সে মুখ।

নিজের ঘরে গিয়ে নেল তার টুকিটাকি জিনিসগুলি ঝুড়িতে ভরে নিলো। বুড়ো কাঁধে নিলো তাঁর ঝোলা। হাতে নিলো লাঠি। তারপর নেলের হাত ধরে পথে নামলো।

রাত গেলো। দিনও যায় যায়। অবিরাম হেঁটে হেঁটে একটা ছোট সহরে ওরা পেঁছুলো।

সহরের এখানে ওখানে বৃথাই আশ্রয় খুঁজলো। ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে আবার চললো এগিয়ে।

বেচারি নেলের পা আর চলতে চায় না। সহর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশ্রয়ের আর কোন আশাই নেই। কি হবে তাহলে ?

ঠিক সেই সময়ে নেলের চোখে পড়লে, তাদের ঠিক আগে আগেই আরও একটি যাত্রী এগিয়ে চলেছে। পিঠের উপর একটা তোরঙ্গ বেঁধে মোটা লাঠিটার উপর ভর দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে। আরেক হাতে ধরা রয়েছে একখানি বই। লোকটি হাঁটছে আর পড়ছে।

একটা ক্ষীণ আশা জাগলো নেলের মনে। এক দৌড়ে সে লোকটির কাছে

এগিয়ে গেলো। ক্ষীণ কণ্ঠে চাইলো তার সাহায্য—রাতের মত একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা।

লোকটি ঘাড় ফিরিয়ে চাইলো ওর দিকে। তাকে দেখেই আনন্দে নেল হাততালি দিয়ে উঠলো। আনন্দে একটা অব্যক্ত শব্দ করেই ও মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

লোকটি সেই পণ্ডিতমশাই। প্রথমটা ব্যাপার দেখে সেও হতভম্ব হয়ে গেলো। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। তখুনি হাতের লাঠি ও বই ফেলে দিয়ে পণ্ডিতমশাই নেলকে কোলে তুলে নিলো। দাদু এগিয়ে এসে ওর ঝুড়িটা ও পণ্ডিতমশাইয়ের লাঠি ও বই হাতে নিলো।

কাছেই একটা সরাইখানা ছিলো। সেখানেই ওরা উঠলো।

রাতে নেলের বেশ ঘুম হলো। পরদিন সকালে সে বেশ সুস্থও বোধ করতে লাগলো। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল থাকায় পণ্ডিতমশাই তাদের সেদিনকার মত সেখানেই বিশ্রাম নিতে বললো।

বিকেলে নেল বললো, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। পথের মাঝখানে আপনাকে না পেলে আমি মরেই যেতাম। একা একা আমার দাদুর যে কি হাল হোত—

পণ্ডিতমশাই বললো, ওসব কথা থাক। একটা সুসংবাদ আছে নেল। তোমরা চলে যাবার পরে আমি একটা ভাল চাকরি পেয়েছি।

—সত্যি!

—হ্যাঁগো। এখান থেকে আরও অনেক দূরে একটা গাঁয়ের স্কুলে। বছরে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড মাইনে। ভেবে দেখ, বছরে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড!

নেল সানন্দে বলে উঠলো, খুব খুসি হলাম শুনে, সত্যি খুব খুসি হলাম।

—সেই গাঁয়েই আমি এখন চলেছি। তারা আমাকে সবটা পথ গাড়ি ভাড়া করেই যেতে লিখেছিলো। সে-খরচও তারাই দিত। কিন্তু হাতে অনেক সময় আছে বলে আমি হেঁটেই চলেছি। উঃ, ভাগ্যি আমি হেঁটেই যাচ্ছিলাম। তাই তো তোমাদের দেখাটা ভাগ্যে ঘটলো।

—সেটা আমাদের পক্ষেও পরম ভাগ্যের কথা।

—সে তো বটেই। কিন্তু কোথায় তোমরা যাচ্ছ বল তো? কোথা হতেই বা আসছ। তোমরা করই বা কি? না, না, কোন সংকোচ করো না। সব কথা আমাকে খুলে বলো। বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। তার কারণও তো তুমি জান। যে আমাকে ছেড়ে চলে গেলো তার প্রতি আমার ভালবাসা যেন সেই দিন থেকেই তোমার উপর এসে পড়েছে নেল!

বৃদ্ধের অশ্রুসিক্ত কথাগুলি শুনে অভিভূত হলো নেলের শিশু-হৃদয়।

একে একে সব কথাই ও খুলে বললো, আমাদের আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই—বিশ্বাসঘাতকতার অভিশাপ থেকে দাদুকে বাঁচাবার জন্যেই ওকে নিয়ে আমি পালাচ্ছি—জানি না কোথায় যাব।

পণ্ডিতমশাই অবাক বিস্ময়ে সব কথা শুনলো। ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর দুই পক্ষে কিছু কথা কাটাকাটির পর স্থির হলো, নেল ও তার দাদুও পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে যাবে। সেখানে তাদেরও কোন না কোন একটা কাজের ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

সাগ্রহে পণ্ডিতমশাই বললো, দেখ নেল, কাজ একটা জুটে যাবেই। আমাদের উদ্দেশ্য যখন সাধু তখন কিছুতেই আমরা নিরাশ হব না, তুমি দেখে নিও।

পরদিনই সুবিধা মত একটা গাড়িও পাওয়া গেলো। তাইতে নেলকে তুলে দিয়ে পণ্ডিতমশাই ও বুড়ো গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চললো। পথে একটা বড় সহরে রাত কাটিয়ে ওরা গন্তব্যস্থানে পেঁছে গেলো।

পণ্ডিতমশাই বলে উঠলো, ওই দেখ গির্জা। তার পাশে ওই যে পুরনো বাড়ি—নিশ্চয় ওটাই স্কুল। বাঃ, কী সুন্দর জায়গাটা। গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে খড়ের ঘরগুলো। একটু দূরে ওই ছোট্ট নদীটি। দিগন্তে ওই নীল পাহাড়ের শ্রেণী। আঃ, এমন জায়গা আর বছরে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড!

আরও খানিকটা এগিয়ে পণ্ডিতমশাই বললো, এইবার কয়েক মিনিটের জন্য আমি একটু যাব। সঙ্গে একটা চিঠি আছে সেখানা দিতে হবে, আর সব খোঁজ-খবরও নিতে হবে। আমি যাব আর আসব। কিন্তু ততক্ষণ তোমাদের কোথায় বসিয়ে রাখি বল তো?

নেল বললো, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। গির্জার দরজা খোলাই আছে। ওখানেই আমরা বসছি।

—হ্যাঁ, সেই ভাল। তোমরা বস, আমি এখুনি আসছি। ভগবান করুন, যেন ভালো খবর নিয়েই আসতে পারি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে এক তাড়া মরচেধরা পুরনো চাবি বাজাতে বাজাতে হাজির হলো পণ্ডিতমশাই। নেলের কাছে এসে বললো, ওই যে দুটো পুরনো বাড়ি দেখতে পাচ্ছ ওরই একটা আমার।

আর কোন কথা না বলে ওরা তিনজন সেই পুরনো বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

পর পর কয়েকটা চাবি ঘোরাবার পর পুরনো তালাটা সশব্দে খুলে গেলো।

ভিতরে ঢুকে চারদিক দেখে নেল বলে উঠলো, বাঃ, কী সুন্দর বাড়িটা!

পণ্ডিতমশাই বললো, হ্যাঁ, থাকবার মত—বাঁচবার মত বাড়ি বটে। এই বাড়িটাই তোমাদের।

—আমাদের! সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো নেল।

—হ্যাঁ, তোমাদের। আশা করি, সুস্থ শরীরে তোমরা অনেক দিন এই বাড়িতে থাকতে পারবে। আমি তোমাদের প্রতিবেশী—পাশের বাড়িতেই থাকব।

তারপর নেলকে পাশে বসিয়ে পণ্ডিতমশাই সব কথা খুলে বললো। যে বৃদ্ধা এই গির্জাটা দেখাশুনো করত, এর দরজা খুলত ও বন্ধ করত, বিদেশীদের সব ঘুরিয়ে দেখাত, কিছুদিন হয় সে মারা গেছে। পণ্ডিতমশায়ের প্রস্তাবে সেই শূন্য পদেই নেল ও তার দাদুকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

পণ্ডিতমশাই আরও বললো, এই বাড়িটা ছাড়া যৎসামান্য হাত-খরচও ওরা দেবে। সব মিলিয়ে আমাদের তিনজনের বেশ ভালভাবেই চলে যাবে।

নেল বললো, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

—তাই হোক—তাই হোক, মঙ্গল হোক আমাদের সকলের। কিন্তু এবার আমার বাড়িটাও তো দেখতে হবে। চল যাই।

—হ্যাঁ, তাই চলুন।

সেদিন রাতে দুটি পরিত্যক্ত পুরনো বাড়ির শার্সিতে অনেক দিন পরে আবার আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়লো।

।। বারো ।।

কিট মাঝে মাঝেই একক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

ইদানীং প্রায়ই কিট যখন দোতলা থেকে নেমে আসে তখন মিঃ ব্র্যাস ওকে ডেকে নিয়ে বসায়। নানা রকম মিষ্টি কথা বলে। যাবার সময় কিছু বকশিসও দেয়।

অধিকাংশ সময়ই মিঃ ব্র্যাস ও তার বোন স্যালি আপিসের বাইরে কাটায়। একা একা অন্ধকার আপিস-ঘরে মিঃ সুইভেলারের দিন যেন আর কাটতে চায় না।

সময় কাটাবার জন্যে সম্প্রতি সে একজোড়া তাস যোগাড় করেছে। একজনকে 'ডামি' ধরে নিজে নিজেই তাস খেলে। কখনও বাজি ধরে—বিশ, ত্রিশ, এমন কি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত।

একটা চিন্তা শুধু তার মনকে দোলা দেয়। কে এই ছোট্ট রাঁধুনি মেয়েটি?

এই বাড়ির কোন্ এক অন্ধকার গর্তে ও যেন থাকে। একক ভদ্রলোক ঘণ্টা বাজালে চকিতে কোথা থেকে যেন আবির্ভূত হয়, কাজ মিটে গেলেই আবার সেই অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ও কখনও বাইরে যায় না। এমন কি আপিস-ঘরে পর্যন্ত আসে না। কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে না। কেউ ওর কথা বলে না, ওর খোঁজ পর্যন্ত নেয় না। ও যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়!

সেদিন রাতে। আপিস-ঘরে একা বসে আবোল-তাবোল ভাবছিলো মিঃ সুইভেলার।

হঠাৎ দরজার কাছে একটা নিঃশ্বাসের শব্দে তার চমক ভাঙলো। ভাল করে তাকিয়ে দেখলো, দরজার ছিদ্রপথে একটি চোখ যেন জ্বলজ্বল করছে।

এক লাফে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো সে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো ছোট মেয়েটি, দোহাই আপনার, আমি কিছু খারাপ মনে করে এখানে আসি নি। একা একা এত খারাপ লাগছিলো—

—তার মানে, তুমি কি বলতে চাও সঙ্গী খুঁজতে তুমি এখানে এসেছিলে?

—সত্যিই তাই।

—তুমি কতক্ষণ এখানে এসেছ?

—আপনি প্রথম যখন তাস খেলতে শুরু করলেন তারও আগে থেকে।

—বেশ, তাহলে ভিতরে এস। হ্যাঁ, এইখানে বস। আমি তোমাকে খেলা শিখিয়ে দিচ্ছি।

—না না, আমি এখানে এসেছি জানতে পারলে মিস্ স্যালি আমাকে খুন করে ফেলবে।

—বেশ, তাহলে আমিই নীচে যাচ্ছি। আর নীচে গেলে তো মিস্ স্যালি আমাকে খুন করতে পারবে না।

তাসজোড়া পকেটে পুরে ডিক শুধালো, আচ্ছা, তুমি এত রোগা কেন বলো তো?

—আজ্ঞে—

—বুঝেছি। আচ্ছা, এরা তোমাকে খেতে-টেতে দেয় তো?

—তা—তা দেয়।

—আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি এখুনি আসছি।

ডিক চলে গেলো। আবার একটু পরেই একটি হোটেলের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। তার দুহাতে অনেক খাবার।

রান্নাঘরের টেবিলে খাবারগুলো সাজিয়ে দিয়ে ডিক বললো, নাও, এবার চটপট এগুলো সাবাড় করে দাও।

যেন কতদিন খায় নি এমনি ভাবে মেয়েটি গোগ্রাসে সব খাবার শেষ করে ফেললো।

ডিক বললো, বেশ। এবার তাহলে খেলা। এই দুটো ছ'পেনি রইলো। যে জিতবে সেই পাবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, এবার থেকে তোমার নাম দিলাম মহারাণী, কি বলো?

—বেশ।

—আচ্ছা মহারাণী, খেলা শুরু কর।

অনেকক্ষণ খেলবার পর ডিক যাবার সময় শুধালো, আচ্ছা মহারাণী, আমার মনে হয় তুমি প্রায়ই আপিস-ঘরের দরজায় চোখ দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। কেন বলো তো?

কাঁপা গলায় মহারাণী বললো, খাবার আলমারীর চাবিটা কোথায় থাকে সেইটে জানবার জন্যই আমি এ কাজ করেছি। চাবিটা পেলে পেট ভরে একটু খেতে পারতাম—

—সে চাবি তুমি তো পাও নি। পেলে অন্ততঃ আর একটু মোটা হতে পারতে। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। গুড নাইট।

পরদিন সকালে ডিক বেশ খুসি মনেই আপিসে এলো। মিস্ স্যালি আগে থেকেই তার টেবিলে বসে কাজ করছিলো। ডিকও কাজ শুরু করলো।

হঠাৎ স্যালি বলে উঠলো, দেখুন, আজ সকালে একটা রুপোর পেন্সিল-কেস্ কি আপনি দেখেছেন?

হেসে ডিক জবাব দিলো, না, পথে তো তেমন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। তবে হ্যাঁ, একটি বেশ মোটা সোটা পেন্সিল-কেস্ দেখেছি বটে রাস্তায়। তবে তার সঙ্গে ছিলো একটি বুড়ি কলম-কাটা ছুরি আর একটা দাঁত-খুটুনি, তাই তার সঙ্গে কোন কথা তো বলতে পারি নি।

স্যালি গম্ভীর গলায় বললো, ঠাট্টা রাখুন। আমি 'সিরিয়াসলি' বলছি।

—তার মানে? আপনি তো দেখলেন, আমি এইমাত্র আপিসে ঢুকলাম।

—সে তো জানি। কিন্তু সত্যি বলছি, এই ডেস্কের উপর থেকে পেন্সিল-কেসটা হারিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই টাকা-পয়সাও খোয়া যাচ্ছে ইদানীং।

সেই সময়ে ঘরে ঢুকলো মিঃ স্যাম্পসন ব্র্যাস। ওদের দিকে চেয়ে বললো, ব্যাপার কি?

ডিক বললো সব কথা।

শুনে কালো হয়ে গেলো ব্র্যাসের মুখ। ঘরময় বার কয়েক পায়চারি

করে সে বলে উঠলো; মিঃ রিচার্ড, এ তো খুব খারাপ কথা—ভাববার কথা। কি জানেন, আমার নিজেরও কিছু টাকা সম্প্রতি ডেস্ক থেকে চুরি গেছে। পাছে একটা হৈ-চৈ হয়; তাই আমি কিছু বলি নি। কিন্তু এ তো বড়ই ভাববার কথা হয়ে দাঁড়ালো।

বলতে বলতে অন্যমনস্ক ভাবে স্যাম্পসন পকেট থেকে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে একখানি ব্যাংক-নোটও ডেস্কের উপর রেখে আবার পকেটে হাত ঢোকালো।

ডিক সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় স্যাম্পসন বললো, না না, ও ব্যাঙ্ক-নোট আমি পকেটে তুলব না, ওইখানেই রাখব। ওটাকে ওখানে রাখতে ভয় পাওয়া মানে স্যালিকে অবিশ্বাস করা বা আপনাকে অবিশ্বাস করা। কিন্তু মিঃ রিচার্ড, আপনার উপরে যে আমার অসীম বিশ্বাস।

হঠাৎ চাপা গলায় বলে উঠলো মিস্ স্যালি, ধরে ফেলেছি—এবার আমি ধরে ফেলেছি।

ব্র্যাস্ সাগ্রহে শুধালো, কে? কে সে?

—কেন? যে গত তিন চার সপ্তাহ ধরে প্রায়ই এই আপিসে যাতায়াত করে? তোমার দৌলতে যে মাঝে মাঝে এখানে একাও থাকে?

—কে সে?

—কেন? কিট?

—মিঃ গারল্যাণ্ডের বাড়ির সেই ছেলেটি?

—নিশ্চয়।

—না না, সে কখনও হতে পারে না। এ কথা আমি শুনব না। এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না। কখনও না।

—কিন্তু আমি তবু বলছি, সেই চোর।

—আমি বলছি, সে চোর নয়। তুমি জান, তার চেয়ে সৎ ও বিশ্বাসী লোক আজ পর্যন্ত জন্মে নি। আরে এস, এস।

ঘরে ঢুকলো কিট। তাকে দেখেই মিঃ ব্র্যাস শেষের কথা দুটি বলেছিল।

কিট জিজ্ঞেস করলো, ভদ্রলোক কি উপরে আছেন?

—হ্যাঁ কিট, তিনি উপরেই আছেন। যাও দেখা করে এস। যাবার পথে কিন্তু দেখা করে যেয়ো আমার সঙ্গে।

কিট চলে গেলে মিঃ ব্র্যাস বললো, কি বলো তুমি স্যালি? এই ছেলেটি ডাকাত! অসম্ভব। আমি তো রাজার ঐশ্বর্য দিয়ে ওকে বিশ্বাস করতে পারি।

আরও কিছু কথাবার্তার পর ডিক ও স্যালি বাইরে চলে গেলো।

মিনিট পনেরো পরে উপরের কাজ সেরে কিট যখন নীচের আপিস-ঘরে ঢুকলো মিঃ ব্র্যাস তখন একাকি আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো।

তার দিকে চেয়ে কিট শুধালো, ব্যাপার কি মিঃ ব্র্যাস? আপনাকে এত বিচলিত দেখছি কেন বলুন তো?

ব্র্যাস বললো, না না, ও কিছু নয়। আমি বেশ ভালই আছি। তারপর? আমাদের দোতলার বন্ধুটি কেমন আছেন?

—আজ্ঞে, অনেকটা ভাল।

—বেশ, বেশ। আর মিঃ গারল্যান্ড? আশা করি তাঁরাও সকলেই ভাল আছেন?

কিট আস্তে আস্তে মিঃ গারল্যান্ডের বাড়ির সকলের খবরই বলতে লাগলো। শুনতে শুনতে ব্র্যাস অন্যমনস্কভাবে তার টুলটার উপরই উঠে দাঁড়ালো। তারপর কিটকে কাছে ডেকে তার কাঁধে ভর দিয়ে নীচে নেমেই বলে উঠলো, দেখলে তো মিঃ রিচার্ডের আক্কেল। সেই কখন বেরিয়ে গেছে ফিরবার নামটিও নেই। তুমি ভাই এক মিনিট আপিসটা একটু দেখো, আমি এখুনি একবার উপর থেকে আসছি। ঠিক এক সেকেন্ড।

ব্র্যাস দ্রুতপায়ে আপিস থেকে বেরিয়ে গেলো। আবার একটু পরেই ফিরে এলো। ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ সুইভেলারও ফিরে এলো। কিটের এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিলো। সেও আর অপেক্ষা না করে চলে গেলো। দরজায় তার সংগে দেখা হলো মিস্ স্যালির।

ঘরে ঢুকে স্যালি বললো, তোমার আদুরে গোপাল যে চলে গেলো!

ব্র্যাস বললো, আদুরে গোপালই তো! জানেন মিঃ রিচার্ড, বড় ভাল ছেলে এই কিট। ওর প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস কখনও ভাঙবে না। ওকে আমি—এ কি? কোথায় গেলো?

ডিক শুধালো, কি হারালো আবার?

ব্র্যাস তখন এ-পকেট ও-পকেট, ডেস্কের উপরে-নীচে কাগজপত্রের মধ্যে এলোপাথাড়ি খুঁজতে খুঁজতে বললো, তাই তো গেলো কোথায়? দেখুন তো মিঃ রিচার্ড, পাঁচ পাউন্ডের নোটটা যে এখানেই ছিলো। এই একটু আগেও ছিলো। কোথায় গেলো? হা ভগবান!

স্যালি চেঁচিয়ে উঠলো, কি? গেছে? বেশ হয়েছে। কিন্তু খবরদার, তার পিছনে যেন ছুটো না। তাকে পালাবার সময়টা অন্তত দাও। আহা বেচারি!

সুইভেলার ও ব্র্যাস এ-ওর মুখের দিকে বার কয়েক তাকালো। তারপর হঠাৎ টুপি মাথায় ফেলে রাস্তায় নেমে দিলো ছুট।

কিটও রাস্তা দিয়ে বেশ তাড়াতাড়িই যাচ্ছিলো।

পিছন থেকে তার এক কাঁধে হাত রেখে ব্র্যাস চেঁচিয়ে বললো, থামো।

আরেক কাঁধে হাত রেখে ডিক বললো, এত তাড়াতাড়ি কেন হে? জরুরী কাজ আছে বুঝি?

সবিস্ময়ে কিট বললো, হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়িই আছে।

ব্র্যাস বললো, দেখ কিট, আপিস থেকে একটা দামী জিনিস হারিয়ে গেছে। তুমি কি কিছু জান?

—আমি জানব? আপনি কি আমাকে সন্দেহ—

—না না, আমি তোমাকে মোটেই সন্দেহ করি না। তবু তুমি যদি আমার আপিসে ফিরে চলো, তাহলে—

—বেশ, তাই চলুন। আমাকে সার্চ করতে চান করুন। কিন্তু আমি জানি, আমাকে সন্দেহ করার জন্যে শেষটায় আপনি নিজেই দুঃখিত হবেন।

সবাই আপিসে ফিরে এলো।

ব্র্যাস একে একে কিটের কোটের পকেট, ওয়েস্টকোটের পকেট সব খুঁজে বললো, না মিঃ রিচার্ড, কোথাও কিছু নেই। আমি জানতাম কিছু পাওয়া যাবে না।

ডিক কিটের টুপিটা হাতে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। ব্র্যাস তাকে বললো, আপনি টুপিটা একবার দেখুন তো।

ডিক টুপির ভিতর থেকে একটা রুমাল বের করলো। তারপরই বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলো।

স্যালি, কিট ও ব্র্যাস এক সঙ্গে তাকিয়ে দেখলো, ডিকের হাতে পাঁচ পাউণ্ডের একটা নোট।

ব্র্যাস বললো, বলেন কি? টুপির ভিতরে?

—হ্যাঁ, রুমালের নীচে টুপির লাইনিং-এর তলায়।

কিট বিস্ময়ে, লজ্জায়, আতংকে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রইলো।

ব্র্যাস দুই হাত এক করে সখেদে বলতে লাগলো, এই—এই তো মানুষের চরিত্র। স্যালি, আমাকে ক্ষমা কর। ওকে শক্ত করে ধর। মিঃ রিচার্ড, দয়া করে একজন কনেস্টবল ডেকে দিন। আর আমার কোন দুর্বলতা নেই। দয়া করে একজন কনেস্টবল ডেকে দিন!

॥ তের ॥

আট দিন পরে বিচার সুরু হলো। কিট কাঁপা গলায় বললো, হুজুর,

আমি নির্দোষ। কিন্তু প্রমাণ তার বিরুদ্ধে। জুরী তাকে দোষী সাব্যস্ত করলো। পুলিশ তাকে নিয়ে গেলো কাঠগড়া থেকে।

যাবার সময় মাকে জড়িয়ে ধরে ও বললো, মাগো, আমি নিশ্চিত জানি, কোন না কোন বন্ধু আমাকে বাঁচাবেই। আমি নির্দোষ এ কথা প্রমাণ হবেই। আমি আবার ফিরে আসব তোমার কাছে। হায়! এমন কি কেউ নেই যে আমার মাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়!

এগিয়ে এলো সুইভেলার। কিটের মাকে সযত্নে ধরে নিয়ে গাড়িতে তুললো। তার বাড়িতে পেঁছে দিলো। সেখান থেকে বেভিস্ মার্কসে ফিরবার পথে কেন যেন তার সন্দেহ হতে লাগলো, কিটের ব্যাপারটার অন্তরালে নিশ্চয় তার মনিবের কোন শয়তানী আছে। কিন্তু কি সে শয়তানী?

সেখানে পেঁছুতেই ব্র্যাস সোজা বলে দিলো, মিঃ রিচার্ড স্যার, কাল থেকে আপনার এখানে আসবার দরকার নেই। আপনার মত প্রতিভাবান লোকের জন্য এ কাজ নয়। আপনি বরং রঙ্গমঞ্চে বা সেনাবাহিনীতে যোগ দিন, উন্নতি করতে পারবেন। আচ্ছা আসুন। নমস্কার।

মিঃ সুইভেলার একটা কথারও জবাব দিলো না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

সেই রাতেই ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সাংঘাতিক জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়লো।

আবার যখন চেতনা ফিরে এলো তখন রিচার্ড সবিস্ময়ে দেখলো সে তার বিছানায়ই শুয়ে আছে। তবে বিছানাটা সুন্দর করে পাতা। মাথার কাছে ওষুধপত্র। আর—ওখানে ও কে? আপন মনে তাস খেলছে? আরে! এ যে মহারাণী।

রিচার্ড প্রথমে ভাবলো সে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু স্বপ্ন তো নয়। এ যে রক্ত মাংসের মানুষ!

তখন হাতের ইসারায় মেয়েটিকে কাছে ডেকে সে বললো; মহারাণী, কাছে এস। আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, না?

—হ্যাঁ। আমি তো ভাবতেই পারি নি যে আপনি আবার ভাল হয়ে উঠবেন। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ!

—আচ্ছা; কতক্ষণ আমি জ্বরে অচৈতন্য হয়ে ছিলাম?

—কতক্ষণ কি? কদিন বলুন। কাল পুরো তিন সপ্তাহ হবে।

—তিন কি বললে?।

—তিনটি সপ্তাহ।

রিচার্ড পাশ ফিরে আবার চোখ বুঁজে চুপ করে শুয়ে রইলো।

মহারাণী এই ফাঁকে তার জন্যে গরম টোস্ট আর চা করে নিয়ে এলো। আরাম করে সে সব খেয়ে রিচার্ড শুধোলো, মহারাণী, স্যালি কেমন আছে?

—জানি না তো।

—কেন? তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় না?

—দেখা? আমি তো সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি!

—বলো কি! তাহলে এখন তুমি কোথায় থাকো?

—থাকি? কেন এখানে।

—ওঃ। আচ্ছা, আমার এই বাসা তুমি চিনলে কি করে?

—আপনি চলে আসবার পরে দোতলার সেই একক ভদ্রলোকও যেন কোথায় চলে গেলেন। একা একা আমার ভারী খারাপ লাগত। একদিন আপিস ঘরের দরজার ছিদ্র দিয়ে তাকাতেই কানে এলো কে যেন বলছে যে আপনি এই ঠিকানায় থাকেন, আপনার খুব অসুখ, আপনাকে দেখাশুনা করবার কেউ নেই। শুনেই আমার মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো। সকলের অজ্ঞাতে সেদিন রাতেই পালিয়ে এখানে চলে এলাম। এ-বাড়ির লোকদের বললাম, আপনি আমার দাদা। সেই হতে এখানেই আছি।

—ওঃ, তোমার দেখছি অনেক কষ্ট হয়েছে। আহা, কিটের কি হয়েছে বলতে পার?

—অনেক বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয়েছে তার।

—আহা বেচারি!

—অথচ ওর কোন দোষ নেই।

চমকে উঠলো ডিক, কোন দোষ নেই? বলছ কি তুমি?

—আমি ঠিকই বলছি। কিন্তু আপনি এখনও অসুস্থ। একটু ভাল হয়ে উঠুন, তারপর সব বলব একদিন।

উত্তেজিত হয়ে উঠলো ডিক, না না, আজই বলো। সব কথা না শুনলে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না।

অগত্যা মহারাণী রাজী হলো। বললো, বেশ, তাহলে আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন, আমি বলছি সব কথা। একদিন রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে মিঃ ব্র্যাসের ঘরের দরজায় কান পাতলাম। শুনলাম ভাই-বোন ভিতরে ফিস্‌ফিস্‌ করে আলাপ করছে। মিঃ ব্র্যাস বলছে, 'যাই বলো, কাজটা বড় গোলমেলে। এ নিয়ে আমাদের অনেক রকম ঝঞ্ঝাট হতে পারে। মিস্‌ স্যালি বললো, কিন্তু তুমি ভুলে যেয়ো না যে কুইল্‌পই আমাদের একমাত্র সহায়। তার যখন ইচ্ছা কিটের সর্বনাশ করা তখন এ ছাড়া আর উপায় কি? আরও কিছুক্ষণ দুজন চুপি চুপি কি যেন বলাবলি করে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো। মিঃ ব্র্যাস পকেট থেকে নোট-বই বের করে বললো, এই কুইল্‌পের নিজের পাঁচ পাউণ্ডের

নোট। এতেই কাজ হাসিল হবে। আমি জানি, কিট কাল সকালে আসবে। সে যখন দোতলায় যাবে তখন তোমাকে ও রির্চাডকে আপিস থেকে সরিয়ে দেব। দোতলা থেকে ফিরবার সময় কিটকে ঘরে ডেকে এনে তার সঙ্গে আলাপ জমাব আর সেই ফাঁকে মালটি চালিয়ে দেব তার টুপির ভিতরে। তারপর এমন ব্যবস্থা করব যে মিঃ রির্চাডই এটি খুঁজে পাবে এবং প্রধান সাক্ষী হবে। কি রকম পাকা ব্যবস্থা বলো তো? ব্র্যাস্ ও স্যালি আবার হো হো করে হেসে উঠলো। আমিও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এলাম।

মহারাণী চুপ করলো। ডিক উত্তেজিত স্বরে বললো, আমি জানতাম, আমি জানতাম যে এ সব ওই শয়তানের কারসাজি। কিন্তু, এখন উপায়? মহারাণী, দেখ তো বাইরের অবস্থা কেমন? আজ রাতেই আমি একবার বাইরে যাব।

—অসম্ভব। অসম্ভব। আজ আপনি কিছুতেই বেরোতে পারবেন না।

—আমাকে বেরোতে হবেই। আমার জামাকাপড় দাও।

—যাক, বাঁচা গেলো। জামাকাপড় কিছু নেই।

—কি হলো?

—আপনার অসুখের মধ্যে টাকার দরকার হওয়ায় সব আমি বেঁচে দিয়েছি।

—তাহলে—তাহলে উপায়?

—আপনি যে জন্য বাইরে যেতে চান সে কাজ কি আমাকে দিয়ে হয় না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমাকে দিয়েই হবে। তুমি খুব পারবে।

ডিক তখন মিঃ গারল্যাণ্ডের বাড়ির ঠিকানা ও তাদের চেহারা মহারাণীকে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলো। বলে দিলো, তাঁদের যে কোন একজনকে অবশ্য যেন আজ রাতেই ডিকের ঘরে সে নিয়ে আসে।

।। চৌদ্দ ।।

কাদের যেন চাপা আলোচনা কানে আসতেই ডিকের তন্দ্রা ভেঙে গেলো। চেয়ে দেখে, মিঃ গ্যারল্যাণ্ড, মিঃ অ্যাবেল, মিঃ উইদার্ডেন, একক ভদ্রলোক ও অন্য সবাই তার ঘরে এসে হাজির হয়েছে। একটু বিরতভাবে ডিক বললো, দেখুন, আমার ঘরে যথেষ্ট চেয়ারও নেই, আসবাবও কিছু নেই, আপনাদের অনেক কষ্ট হবে।

মিঃ গারল্যাণ্ড বললো, সে জন্য আপনি ভাববেন না। এই ছোট্ট মেয়েটি আমাদের সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছে। ওর কাছে সবই আমরা শুনেছি। এখনও সময় আছে, কিটের একটা ব্যবস্থা হয়তো আমরা করতে পারব।

ডিক বললো, দেখুন যদি কিছু করতে পারেন। আহা বেচারি! আদালত থেকে যাবার সময় মাকে জড়িয়ে ধরে ও বলেছিলো ও নির্দোষ, কোন না কোন বন্ধু নিশ্চয় ওকে বাঁচাতে আসবে!

আরও খানিক আলাপ আলোচনার পর সবাই চলে গেলো।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার সবাই এসে হাজির হলো। অ্যাবেল বললো, কিটের মুক্তির আশা খুবই বেশী।

শুনে ডিক ও মহারাণী ভারী খুসি। রাত বাড়তে একে একে সবাই চলে গেলো। শুধু মিঃ উইদার্ডেন বসে রইলো। কি যেন ভেবে নিয়ে সে বললো, আজ আপনি অনেক ভাল আছেন বলেই একটা সংবাদ আপনাকে জানাতে চাই। আইন-ব্যবসায়ী হিসাবেই সংবাদটা আমার কাছে পেঁচেছে।

আইনগত সংবাদের কথা শুনেই কোন অভাবিত বিপদের আশংকায় ডিকের মুখ কালো হয়ে গেলো। উইদার্ডেন বললো, ভয়ের কিছু নেই, সংবাদ শুভ। কিছু দিন হলো আপনার সম্পর্কে আমি কিছু খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। এখন নিশ্চিত জানতে পেরেছি আপনি ডর্সেটশায়ারের অন্তর্গত চেসেলবোর্ণের অধিবাসী কুমারী রেবেকা সুইভেলারের বোন-পো। তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন।

—মারা গেছেন! আর্তনাদ করে উঠলো ডিক।

—হ্যাঁ, মারা গেছেন। তাঁরই উইল অনুসারে বছরে আপনি পাবেন দেড়শো পাউণ্ড। আশা করি এ জন্য আপনাকে আমি অভিনন্দিত করতে পারি।

এক চোখে অশ্রু অন্য চোখে হাসি নিয়ে ডিক বললো, নিশ্চয়, নিশ্চয় পারেন। ভগবান ভরসা, এবার তাহলে মহারাণীকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে পারব—সত্যিকারের মহারাণী করতে পারব।

জেলখানা থেকে মুক্তি পেলো কিট।

বাইরে তার জন্য গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো মিঃ গারল্যাণ্ড। কিটকে নিয়ে সে সোজা এসে বাড়িতে উঠলো। অ্যাবেল কুটিরে হৈ চৈ পড়ে গেলো।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মিঃ গারল্যান্ড কিটকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললো, কাল সকালে অনেক দূরের পথে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে কি কিট?

—অনেক দূরের পথ?

—হ্যাঁ। সঙ্গে যাবেন পাশের ঘরের আমার বন্ধুটি। আচ্ছা কিট, তুমি কিছু ধারণা করতে পার, কোথায় আমরা যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি?

কি ভেবে কিটের মুখ ম্লান হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে সে ঘাড় নাড়ল।

গারল্যান্ড বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। বলো—বলো—

কিট মাথা নাড়তে নাড়তে কি যে বললো ভাল বোঝা গেলো না। দুটো কথা শুধু বার বার শোনা গেলো—মিস্ নেল। গারল্যান্ড বললো, তুমি ঠিক ধরেছ। তাদের বাসস্থানের সন্ধান আমরা পেয়েছি। সেখানেই হবে আমাদের যাত্রার সমাপ্তি।

॥ পনেরো ॥

সারাদিন অনুকূল বাতাসে ওদের গাড়ি চললো দ্রুতগতিতে।

সন্ধ্যার পরে বাতাস পড়ে গেলো। তারায় ঘেরা পরিষ্কার আকাশ দেখা দিলো মাথার উপরে। ঠাণ্ডা ক্রমেই তীব্রতর হতে লাগলো। গাড়ির বাইরে কিটের তো একেবারে জমে যাবার অবস্থা। ভিতরের দুজন যাত্রী সুখ-দুঃখের নানা আলোচনায় সময় কাটাতে লাগলো।

মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেলো। কারও চোখে ঘুম নেই।

এক সময়ে একক ভদ্রলোক সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে শুধালো, আপনি কি ভাল শ্রোতা?

গারল্যান্ড হেসে বললো, আশা তো করি। অন্তত অন্য শ্রোতার চেয়ে খারাপ নই। কিন্তু কেন বলুন তো?

—একটা কাহিনী আপনাকে শোনাতে চাই। খুব সংক্ষিপ্ত কাহিনী। শুনবেন কি?

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সঙ্গীর হাতে হাত রেখে সে কাহিনী সুরু করল:

এক সময়ে দুটি ভাই বাস করত। গভীর ছিলো তাদের ভালবাসা যদিও দুজনের মধ্যে দেখা দিলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একই মেয়েকে ভালবাসলো তারা দুজন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাটা প্রথম জানলো ছোট ভাই। ফলে কী যে দুঃখ সে পেলো, আত্মার কী গভীর যাতনা, মনের সঙ্গে কী দুঃসহ সংগ্রাম সে কথা আজ আর আপনাকে বলব না। দাদাকে সুখী করবার জন্য একদিন সে দেশত্যাগ করলো। দাদা মেয়েটিকে বিয়ে করলো। কিন্তু হায়, কিছু দিনের মধ্যেই মেয়েটি মারা গেলো। রেখে গেলো একটি শিশুকন্যা।

দিন যায়। কন্যাটি বড় হলো। দেখতে হলো তার মায়েরই মত। বিয়ে হলো তার। কিন্তু বিয়ে করে সে সুখী হলো না। স্বামী মারা গেলো। ঠিক তিন সপ্তাহ পরে সেও হলো স্বামীর অনুগামী। রেখে গেলো দশ-বারো বছরের একটি ছেলে আর একটি ছোট্ট মেয়ে। ছেলে-মেয়ে দুটির দাদু সেই দাদা ততদিনে স্বাস্থ্য ও বিত্ত সব দিক থেকেই ভগ্নপ্রায়। যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিলো তাই দিয়ে সুরু করলো ব্যবসা—প্রথম ছবির, তারপর পুরাতাত্ত্বিক সব বিচিত্র জিনিসের। ছেলেটি উচ্ছৃংখল হয়ে শীঘ্রই দাদুর আশ্রয় ছেড়ে মনোমত সঙ্গী বেছে নিলো। বৃদ্ধ নাতনিকে নিয়ে রইলো একা।

ছোট ভাই তত দিন ঘুরেছে দেশ হতে দেশান্তরে। জীবনের তীর্থপথে সে একক পথিক। দাদার সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো। কখনও বা একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেলো। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে দাদার মোটামুটি খবর সে রাখত। দাদার অসহায় অবস্থার কথা জানতে পেরে যত শীঘ্র সম্ভব সব কিছু সে গুছিয়ে ফেললো। বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু ছিলো বিক্রি করে নগদ টাকা করলো হাতে। তারপর দুজনের ভদ্রভাবে বাঁচবার মতো প্রচুর অর্থ নিয়ে এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলো দাদার ঘরের দরজায়।

এই পর্যন্ত বলেই কাহিনীকার থামলো। তার গলা ধরে এসেছে। গারল্যাণ্ড তার হাতে চাপ দিয়ে বললো, এ কাহিনীর বাকী অংশটা আমি জানি।

একটু থেমে লোকটি আবার বললো, জানি না এ কাহিনীর শেষে কি আছে। আপনি তো সবই জানেন। আমার সব খোঁজা ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বর করুন, এই শেষ চেষ্টা যেন ব্যর্থ না হয়।

গারল্যাণ্ড বললো; তা হবে না। এবার আমরা সফল হবই।

ক্রমে দিনের আলো ফুটলো। পথের তবু শেষ নেই। খবর নিয়ে জানা গেলো, গন্তব্য স্থানে পেঁছুতে আবার রাত হবে।

সন্ধ্যা হতেই বাতাস পড়ে গেলো। সুরু হলো বরফপড়া।

কিটের ভুরুতে বরফ জমতে লাগলো। বারে বারে বরফ মুছে ফেলে সে সামনে চোখ রেখে চলতে লাগলো এগিয়ে।

গির্জার ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজলো।

গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে বললো, আমরা এসে গেছি।

পথের পাশেই একটা ছোট সরাইখানা। গাড়োয়ান নেমে গিয়ে সরাইখানার কড়া নাড়তে লাগলো। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। রেগে গাড়োয়ান বললো, না, রাত বারোটা বেজেছে কি এরা সব মরে ভূত হয়ে গেছে।

আবার সে কড়া নাড়তে লাগলো। ছোট ভাই আস্তে আস্তে বললো, ও কড়া নেড়ে ওদের জাগাক। চলুন, আমরা এগিয়ে যাই। দেরি করলে যদি ঠিক সময়ে পৌঁছুতে না পারি।

তিন জন অন্ধকারে এগিয়ে চললো। কিটের হাতে একটা ছোট খাঁচা। সারাপথ সেটাকে ও গাড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে এনেছে। ও জানে, পাখিটাকে দেখলে নেল খুব খুসি হবে।

সাদা বরফে চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরনো গির্জা। সেটা ছাড়িয়ে একটু দূরেই ভাঙা ভাঙা কয়েকটা বাড়ি। আর একটা অনুজ্জ্বল আলো। ছোট ভাই বললো, ওটা কিসের আলো ?

গারল্যান্ড বললো, নিশ্চয় ওই ভাঙা বাড়িতেই তারা থাকে। আশেপাশে আর কোন বাড়ি তো দেখতে পাচ্ছি না।

—কিন্তু এত রাতে তারাই বা জেগে থাকবে কেন ?

কিট প্রস্তাব করলো, আপনারা বরং এখানে দাঁড়ান, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।

হাতের খাঁচাটা নিয়েই কিট আলোটা লক্ষ্য করে দৌড় দিলো। নিঃশব্দ পায়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে কান পাতল কিট। কোন সাড়া শব্দ নেই। জানালার কাছে গাল লাগিয়ে কান পাতলো। না। আশ্চর্য ! এত রাতে এই ভাঙা বাড়িতে আলো জ্বলছে, অথচ মানুষ নেই।

কয়েক পা ঘুরে কিট একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। কড়া নাড়লো, কোন সাড়া পেলো না। কিন্তু ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসছে। কে যেন যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কাঁদছে।

কিটের বুকের ভিতর রক্ত বুঝি জমাট বেঁধে যাবে ! আবার ও কড়া নাড়লো। কোন সাড়া নেই। শুধু গোঙানির শব্দ।

হাত দিয়ে কড়াটা ধরে হাঁটু দিয়ে দরজাটাকে চাপ দিলো কিট। ভিতর থেকে খিল দেওয়া ছিলো না। দরজাটা খুলে গেলো। দেয়ালের একপাশে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। কিট ভিতরে ঢুকলো।

ঘরে লণ্ঠন বা মোমবাতি কিছুই নেই। আগুনের লাল আভায় কিট দেখতে পেলো, আগুনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে একটি লোক। দরজার শব্দেও লোকটি ফিরে চাইলো না, একবার জিজ্ঞাসাও করলো না কে এলো।

লোকটি বৃদ্ধ। মাথার সব চুল ছাইয়ের মত সাদা।

আর একটু এগিয়েই কিট বৃদ্ধকে চিনতে পারলো। পরিবর্তন যতই হোক, ও মুখ সে ভোলে নি, ভুলতে পারে না। চেঁচিয়ে ডাকলো, কর্তামশাই, ও কর্তামশাই, কথা বলুন !

বৃদ্ধ ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো। ফাঁকা গলায় বললো, এই আরেকটি। আজ রাতে এরা কতই যে আসবে।

—আমি ভূত নই কর্তামশাই। আপনার পুরনো চাকর। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? মিস্ নেল—সে কোথায়?

—সে ঘুমিয়েছে—ওই—ও পাশে।

—দোহাই ঈশ্বর!

—ঈশ্বরের দোহাই। কেন? চুপ করো। ও বুঝি ডাকছে?

কিট কি বলতে যাচ্ছিলো। তাকে চুপ করতে বলে বৃদ্ধ পাশের ঘরে গেলো। একটু পরে ফিরে এলো একটা বাতি নিয়ে। ফিস্ ফিস্ করে বললো, এখনও ঘুমুচ্ছে। কি করে জাগাব বলো? পাখিরাই যে এখনও জাগেনি। তারাই তো ওকে জাগাবে।

কি মনে পড়তেই হঠাৎ উঠে একটা পুরনো বাক্স খুলে কয়েকটা জামা বের করলো। সেগুলোকে সযত্নে মুছতে মুছতে বললো, ওর ছেলেবেলাকার পোশাক। ও বড় ভালবাসে। এই ওর জুতোজোড়া। দেখছ না কেমন ক্ষয়ে গেছে? আমাদের শেষ যাত্রার স্মৃতি হিসাবে এগুলো ও রেখে দিয়েছে। পাছে আমি দেখতে পাই যে ও খুঁড়িয়ে হাঁটছে, তাই ও হেঁটেছিলো আমার পিছনে পিছনে।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো মিঃ গারল্যান্ড, তার বন্ধু আর পণ্ডিতমশাই। বৃদ্ধের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। আসনে বসে আবার সে গোঙাতে লাগলো। পণ্ডিতমশাই বললো, আজও আপনি না ঘুমিয়ে জেগে বসে আছেন?

বৃদ্ধ বললো, ঘুম যে আমাকে ছেড়ে গেছে। সব ঘুম যে গিয়েছে ওর চোখে।

—কিন্তু আপনি এই ভাবে জেগে আছেন জানলে ও যে দুঃখ পাবে। আপনি কি ওকে দুঃখ দিতে চান?

—না না, নিশ্চয়ই চাই না। কিন্তু ও যে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে।

—ঘুমিয়েছে, ঘুমিয়েই থাক। ওর কথা রাখুন। আচ্ছা, আপনার নিজের পুরনো দিনের কথা কিছু মনে করতে পারেন? অনেক—অনেক কাল আগেকার কথা। আপনি যখন বালক ছিলেন। তখন আর একটি বালককে আপনি খুব ভালবাসতেন। সে আপনার ছোট ভাই। অনেক—অনেক দিন সে দূরে ছিলো, ভুলে ছিলো। কিন্তু আজ সে ফিরে এসেছে আপনাকে সান্ত্বনা দিতে—

ছোট ভাই বৃদ্ধের দুই পা জড়িয়ে ধরে বললো, ফিরে এসেছি তোমার ভাই হতে।

কেমন যেন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে ভিতরের

ছোট ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলো, ওর কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিতে চাও তোমরা। তা পারবে না—আমার জীবন থাকতে তা পারবে না। আমার আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, একমাত্র ও ছাড়া আমার কেউ নেই—কখনও ছিলো না—কখনও থাকবে না। ওই আমার সব—আমার যথাসর্বস্ব।

হাত নেড়ে সবাইকে সরে থাকতে বলে বৃদ্ধ নাতনিকে ডাকতে ডাকতে ঘরের ভিতরে ঢুকলো। তার পাছে পাছে নিঃশব্দ পায়ে সকলেই ঢুকলো সে-ঘরে।

ছোট বিছানায় শুয়ে আছে নেল। শান্ত। স্তব্ধ। মৃত।

শান্ত স্মিত সুন্দর নেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে নানা রঙের ফুল।

ছোট পাখিটা খাঁচার ভিতরে তখনও নড়ছে।

শুধু এই শিশুর বীর হৃদয় চিরতরে মূক স্তব্ধ হয়ে গেছে।

॥ শেষ ॥

এখানে এসেই কাহিনীকার থামলো এবার। সে পৌঁচেছে তার লক্ষ্যে। যাত্রা শেষ। শুধু চলার পথে আর যারা আমাদের সঙ্গ দিয়েছে তাদের সম্পর্কে দু'একটি কথা।

প্রথমেই স্যাম্পসন ব্র্যাস। মিঃ গারল্যান্ড ও মিঃ উইদার্ডেনের চেষ্টায় তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। দ্বীপান্তরে না পাঠিয়ে তাকে সরকারী খরচে রাখা হয়েছে একটা মস্ত লাল বাড়িতে। পরতে দেওয়া হয়েছে হলদে ডোরা টানা খাটো জামা। খেতে দেওয়া হয়েছে লাপসি। আর পায়ে পরানো হয়েছে লোহার বালা।

তারপর স্যালি ব্র্যাস। কেউ বলে, সে পুরুষ সেজে জাহাজে গেছে নাবিক হয়ে। কেউ বলে সে পদাতিক সেনাদলে যোগ দিয়েছে। এমনি কত কি।

আগেই খবর পেয়ে কুইলপ পালাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু ঘন কুয়াসার মধ্যে নদী পার হতে গিয়ে টেমসের জলেই পেতেছে তার শেষ শয্যা।

মিঃ ও মিসেস গারল্যান্ড, মিঃ অ্যাবেল আর মিঃ উইদার্ডেন পূর্বের মতই বন্ধুভাবে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলো।

মিঃ সুইভেলার ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলো। মহারাণীকে পাঠালো স্কুলে।

সেও ধাপে ধাপে পাশ করতে লাগলো। দেখতে দেখতে কেটে গেলো অনেক দিন। উনিশ বছরের সুন্দরী মহারাণীর সঙ্গে এক শুভলগ্নে মিঃ সুইভেলার ওরফে ডিকের বিয়ে হয়ে গেলো।

আর কিট? সেও বিয়ে করলো বারবারা নামে একটি মেয়েকে। কালক্রমে তাদের দুটি ছেলে-মেয়ে হলো।

প্রায়ই সন্ধ্যার পরে তারা মিস্ নেলের গল্প শুনতে চাইলে কিট গল্প বলত। শুনতে শুনতে ওদের চোখে জল আসত, তবু ওরা আরও শুনতে চাইত।

এক একদিন কিট সবাইকে নিয়ে যেত সহরের সেই অঞ্চলে যেখানে নেলরা থাকত। সে জায়গার চেহারা অবশ্য একেবারেই বদলে গেছে। পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলে একটা চওড়া রাস্তা করা হয়েছে সেখানে।

কিট লাঠি দিয়ে রাস্তার উপরে একটা ঘর কেটে দেখাত কোথায় বাড়িটা ছিলো। কখনও বা তার নিজেরই ভুল হয়ে যেত। ভাবত, তাইতো; কোথায় ছিলো বাড়িটা।

এমনি হয়।

গল্প যেমন একদিন শেষ হয়ে যায়, তেমনি শেষ হয়ে যায় যা কিছু সব।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

কিশোর বিশ্ব-সাহিত্য

পরবর্তী খণ্ডের সম্ভাবিত সূচী

ভিক্টর হুগো—লাফিং ম্যান ॥ ডিকেন্স—গ্রেট এক্সপেক্টেশন্‌স্‌/ডেভিড কপারফিল্ড ॥ স্টিভেন্সন—ট্রেজার-আইল্যাণ্ড/ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড ॥ আলেকজান্দ্রা ডুমা—ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক ॥ হল কেন—ডিমস্টার ॥ কল্লোদি—পিনোশিয়ো ॥ স্টো—আংকল টমস কেবিন ॥